ব্যাচেলর অব এডুকেশন

অ্যাডভান্সড আইসিটি শিক্ষণ

Teaching Advanced ICT

EDBN 1418

রচনা

মোহা. আখতার হোছাইন কুতুবী
মোহাম্মদ কবীর হোসেন
মোহাম্মদ হাবীবুল ইসলাম সুমন
মোঃ রোকনুজ্জামান শিকদার
মির্জা মোহাম্মদ দিদারুল আনাম
জয়দীপ দে
মোঃ জামিল হোসেন

মূল্যায়ন

আব্দুল্লাহ আল-মামুন
মোঃ আহসানুল আরেফিন চৌধুরী
মোঃ আতাউর রহমান

সম্পাদনা

মোহা. আখতার হোছাইন কুতুবী

স্কুল অব এডুকেশন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

অ্যাডভান্সড আইসিটি শিক্ষণ
EDBN 1418
বিএড প্রোগ্রাম

প্রধান সমন্বয়ক
মোঃ জহির উদ্দিন বাবর
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট-২ (টিকিউআই-২) ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট

সমন্বয়ক
রায়হানা তসলিম, উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
ড. রেহেনা খাতুন, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
কাজী সাখাওয়াৎ হোসেন, প্রকল্প কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
রিজওয়ানুল হক, প্রকল্প কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প

সহযোগিতায়
প্রফেসর মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
ড. সুধাংশু রঞ্জন রায়, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
আবু সাঈদ মজুমদার, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
রওশন আরা বেগম, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
মাকসুদা বেগম, প্রকল্প কর্মকর্তা (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
গাজী মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, টিকিউআই-২ প্রকল্প

প্রথম মুদ্রন: ডিসেম্বর ২০১৮
পুন:মুদ্রন: মার্চ ২০২০

প্রচ্ছদ
কাজী সাইফদ্দীন আব্বাস

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর– ১৭০৫।

(স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৮২.১৪.০০৫.১৮.১০০ তারিখ: ৩১ জুলাই ২০১৯ ইংরেজি, ১৬ শ্রাবণ ১৪২৬ বাংলা অনুযায়ী অনুমোদনক্রমে TQI-II প্রকল্পের আওতায় প্রণীত জাতীয় বিএড প্রোগ্রামের পাঠ্যপুস্তক বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পুন:মুদ্রন করা হলো।)

ISBN: 978-984-34-0110-6

মুদ্রণে:

সূচিপত্র

ইউনিট ১ মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT)

আলোচিত বিষয়বস্তুসমূহ:

১.১ **ICT** কী
ICT শিক্ষা কী
নবম-দশম শ্রেণিতে **ICT** শিক্ষার উদ্দেশ্য

১.২ **ICT** শিক্ষণের উপকারিতা

ইউনিট ১
মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT)

বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (Information and Communication Technology-ICT) মানুষের জীবন ধারণের পদ্ধতিকে বদলে দিয়েছে - জীবনকে করেছে সহজ ও আনন্দময়। শিক্ষাক্ষেত্রেও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি যোগ করেছে নতুন মাত্রা। যোগাযোগ ও বিনোদনের সকল মাধ্যম জয় করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আজ স্থান করে নিয়েছে গ্রামের বিদ্যালয়ের সেই ছোট্ট শ্রেণিকক্ষেও - যেখানে শিক্ষার্থীরা বই-খাতার পাশাপাশি কম্পিউটারেও শিখতে শুরু করেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে শিক্ষার সার্বিক গুণগত মানোন্নয়নে শিক্ষার সকল পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার তাই এখন সময়ের দাবী। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে করে তুলেছে সহজ, আনন্দময় ও অধিক কার্যকর। শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার যেমন কঠিন বিষয় শিখতে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করছে, তেমনি কঠিন বিষয়কে সহজ করে উপস্থাপন করতে শিক্ষককেও সহযোগিতা করে চলেছে। তাই শ্রেণিকক্ষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষকের বিকল্প নয়, বরং পরিপূরক। শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের প্রধান মাধ্যম হচ্ছেন শিক্ষক। এ কারণে শিক্ষককে জানতে হবে কীভাবে শ্রেণিকক্ষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে সহজ ও কার্যকর করে তোলা যায় তথা শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করা যায়। সে দিকটি লক্ষ্য রেখেই মাধ্যমিক শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টি রাখা হয়েছে। এখানে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) কী, শিক্ষায় ICT, ICT শিক্ষার উদ্দেশ্য ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে।

১.১ ICT ও ICT শিক্ষা

১.১.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

ICT হচ্ছে Information and Communication Technology-এর সংক্ষিপ্ত রূপ (Acronym) বাংলায় যা 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' নামে পরিচিত। এককভাবে ICT-এর সর্বজনস্বীকৃত কোনো সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। কেননা বিভিন্নক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে ICT-এর প্রয়োগ ঘটছে।

ICT তিনটি ইংরেজি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। সেগুলো হচ্ছে-

- তথ্য (Information)
- যোগাযোগ (Communication)
- প্রযুক্তি (Technology)

সংগৃহীত ডেটা বা উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের পর প্রয়োজন মত সাজানো বা অর্থপূর্ণ অবস্থাকে তথ্য বা ইনফরমেশন বলা হয়। সাধারণভাবে, কোনো নির্দিষ্ট কর্মসূচি বা পরিকল্পনা প্রণয়ন, বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপাদান হিসেবে যা ব্যবহৃত হয় তাকেই তথ্য বলা হয়ে থাকে। তবে তথ্য হতে হলে এটিকে অবশ্যই ঐ নির্দিষ্ট কাজের জন্য অর্থবোধক, নির্ভুল, প্রাসঙ্গিক এবং পূর্নাঙ্গ হতে হবে। আর তথ্য (Information) তৈরি, প্রবাহ, সংরক্ষণ, বিনিময়, যোগাযোগ, পুনরুদ্ধার ইত্যাদির জন্য যে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়ে আসছে তা-ই ICT।

'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' (ICT) তথ্যের আদান-প্রদান, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এমন এক অসাধারণ সুযোগ সৃষ্টি করেছে যার অনুপস্থিতিতে স্বাচ্ছন্দময় আধুনিক জীবন চিন্তাই করা যায় না। ব্যক্তিজীবনের উৎকর্ষ সাধন, জাতীয় জীবনের উন্নতি ও প্রগতি এবং বিশ্বের জাতিসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার বন্ধনে আবদ্ধ এক অভিন্ন পরিবারের সোনালী স্বপ্ন দেখিয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশ্বের জ্ঞান ও তথ্যভান্ডারে প্রবেশের অসীম সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। দৈনন্দিন জীবন, যোগাযোগ, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, মেধাচর্চা ও সৃজনশীলতার বিকাশ, বিনোদন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে এটি মানুষের মানসম্পন্ন কর্মসম্পাদনের এক শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। উন্নত বিশ্বে শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর উপকরণ ব্যবহারের ফলে শিখন-শেখানো কার্যক্রম হয়ে উঠেছে অত্যধিক কার্যকর, আকর্ষণীয় ও বৈশ্বিক। এতে একদিকে যেমন শিখন কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি তাদের চাহিদায় সাড়া দিতে গিয়ে শিক্ষকের ভূমিকায়ও অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটেছে। তাছাড়া কর্মপদ্ধতি, শ্রমবাজার ও যোগাযোগ জগতে এক

নাটকীয় পরিবর্তন এনেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। ফলশ্রুতিতে আধুনিক বিশ্ব নুতন নুতন দক্ষতার কিংবা দক্ষতার নবায়নের প্রয়োজন বোধ করছে। কিন্তু আমাদের বর্তমান প্রজন্মের এ দক্ষতা অর্জনের সুযোগ প্রচলিত শিক্ষাক্রমে একেবারেই অপ্রতুল। যার প্রভাবে প্রযুক্তি ব্যবহারজনিত বৈষম্য (Digital divide), সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য, বেকারত্ব, দারিদ্র্য ইত্যাদি সমস্যাগুলো অদূর ভবিষ্যতে আরো প্রকট হয়ে দেখা দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে আমাদের শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত করা হচ্ছে। তাই আমাদের সামনে এসে দাড়াচ্ছে দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-

(১) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষা এবং

(২) শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

এই বিষয় দুটোকে অনেকেই একসাথে গুলিয়ে ফেলেন। কিন্তু বিষয় দুটো সম্পূর্ণ পৃথক।

১.১.২ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিশিক্ষা (ICT Education)

ICT শিক্ষা হলো মূলত: একটি পাঠ্য বিষয়। যেমন ষষ্ঠ শ্রেণির 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' একটি বিষয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' বিষয়টি আবশ্যিক হিসাবে প্রচলিত। বিশেষ করে ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে আবশ্যিক হিসাবে ১০০ নম্বরের 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' বিষয়টি প্রবর্তিত হয়েছে। সহজ কথায় বলতে গেলে, যখন আইসিটি নিয়ে আলোচনা করা হবে অর্থাৎ তথ্য কী, যোগাযোগ কীভাবে করতে হয়, কোন কোন যন্ত্রাংশ ব্যবহার করে যোগাযোগ করা হয়, প্রযুক্তি পণ্যের ব্যবহার ইত্যাদি তবে তা হবে আইসিটি শিক্ষা।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ:

- উপর্যুক্ত কর্মযজ্ঞের জন্য তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষায় আন্তর্জাতিক মান ও গুণ সম্পন্ন শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির প্রচেষ্টা চালানো।
- তথ্যপ্রযুক্তিকে শুধুমাত্র কম্পিউটার বিজ্ঞানের মাঝে সীমিত না রেখে মোবাইল ফোন, রেডিও, টেলিভিশন, নেটওয়ার্কিং কিংবা সকল তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণের ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ।

১.১.৩ শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT in Education)

শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলতে মূলত শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ করে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার মানোন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করাকে বোঝানো হয়। যেমন: পরিপাকতন্ত্রের কাজ বোঝানোর সময় কম্পিউটারের মাধ্যমে একটি এ্যানিমেশন বা ভিডিও ক্লিপ দেখিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া।

শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিখন-শেখানো কার্যক্রমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণমূলক শিখনের মাধ্যমে সহজেই করা সম্ভব। ICT প্রয়োগের সময় শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা শিখন-শেখানো সকল কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে এবং সম্পৃক্ত থাকবে। শিক্ষক পাঠ পরিচালনায় সকল শিক্ষার্থীকে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করবেন এবং লক্ষ্য রাখবেন যেন সকল শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট পাঠে পুরোপুরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিখতে পারবে। এজন্য শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের শুরুতে এমন কিছু উপকরণ প্রদর্শন করবেন যা শিক্ষার্থীদের জীবন ঘনিষ্ঠ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে সম্পর্কিত বাস্তব বা মূর্তমান হয়। শিক্ষার্থীরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে এবং পাঠ শিরোনাম তারাই বের করে আনবে। যে বিষয়বস্তু শ্রেণিতে উপস্থাপন করা হবে সেটির সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, সুবিধা-অসুবিধা, পার্থক্য ইত্যাদি শিক্ষার্থীরা বের করবে এবং তা করার জন্য শিক্ষক সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করবেন। শিক্ষায় ICT ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পাঠদানের জন্য শিক্ষার্থীদের দিয়ে গল্প বলা, পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান, প্রদর্শন, উপস্থাপন, অভিনয়, বিতর্ক ইত্যাদি পদ্ধতি এবং শিক্ষার্থীদের দ্বারা একক কাজ, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, নোট নেওয়া, লিখতে দেওয়া, সাক্ষাৎকার, আঁকতে দেওয়া ইত্যাদি কৌশলও প্রয়োগ করবেন। এক্ষেত্রে আইসিটি একটি শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে। বিশেষ করে শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রমে কোনো একটি প্রেজেন্টেশন প্রদর্শন করে সহজেই শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়। শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় উপযুক্ত পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা না গেলে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব নয়। পর্যবেক্ষণে দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) ব্যবহারের মাধ্যমে সহজেই শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব।

১.২ আইসিটি শিক্ষণের উপকারিতা

আমরা কী জানি? কী করে শ্রেণি শিখন-শিক্ষণে পেডাগজিক্যাল কৌশল প্রয়োগে আইসিটিকে সমন্বিত করা যায়? সকল শিক্ষকের এখন এটি জানতে হবে। যখন শিখন-শিক্ষণে পেডাগজিক্যাল কৌশল প্রয়োগে আইসিটিকে সমন্বিত করতে হবে তখন এই বিষয়ে চলমান প্রশিক্ষণ খুবই জরুরী। তাই শুধু আইসিটি বিষয়ের শিক্ষকই নয়, বরং অন্য সকল বিষয়ের শিক্ষকের জন্য আইসিটি শিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ। ২০১০ এর শিক্ষানীতি অনুযায়ী মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শ্রেণিতে আইসিটি বিষয় বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শুধু তাই নয় সকল প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়ার সাহায্যে ডিজিটাল উপকরণ ব্যবহারের উপর জোর দেয়া হয়েছে। তাই আইসিটি শিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে এর গুরুত্ব ও উপকারিতা নিয়ে আরো আলোচনা করা হলো:

বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে আইসিটি

বর্তমান কারিকুলামে মাধ্যমিক পর্যায় অর্থাৎ ৬ষ্ঠ হতে দ্বাদশ পর্যন্ত আইসিটি বিষয় বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ফলে এই বিষয়ের পাঠ্যসূচিতে সাম্প্রতিক চাহিদাভিত্তিক নতুন নতুন ধারণা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ফলে এই বিষয়ে পাঠদানে শিক্ষককে পারদর্শী হতে আইসিটি শিক্ষণ জরুরি।

আইসিটি বিষয় পাঠদান কৌশল আয়ত্ব করা

এই বিষয়ে পাঠদানের কলা-কৌশল সম্পর্কেও শিক্ষকের ধারণা থাকা জরুরী। অনেক সময় পর্যাপ্ত কম্পিউটার ছাড়াও কীভাবে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর পাঠদান করা যায় এ বিষয়টিও শিক্ষককে আয়ত্ব করতে হবে।

শিক্ষার্থীদেরকে ICT বিষয়ের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতকরণ

শ্রেণি অভীক্ষা ও অগ্রগতি অভীক্ষা প্রণয়ন ও নম্বর প্রদান, নম্বর প্রদানের মানদন্ড, বিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, নম্বর প্রদান সূচি, নম্বর প্রদান যাচাই ও সংশোধন, শিক্ষার্থীদের ফলাফল সংরক্ষণ এবং তাদের অর্জন পরিবীক্ষণ, পাবলিক পরীক্ষায় ICT বিষয়ের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, অতীত ও বর্তমান নমুনা পরীক্ষা এবং স্বতন্ত্র প্রশ্ন পর্যালোচনা ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা লাভ করা

আইসিটি বিষয়ে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন

যেহেতু আইসিটি বিষয়ে তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক উভয় প্রকার মূল্যায়ন বিদ্যমান, তাই এর মূল্যায়ন কৌশল ও মানবণ্টনও অন্য বিষয় হতে ভিন্ন। এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কৌশলের ব্যাখ্যা রয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-তে। তাছাড়া আইসিটি বিষয়ের প্রশ্নপত্র ও ব্যবহারিক অংশ প্রণয়ন এর ধারণা নেয়ার জন্য আইসিটি শিক্ষণ জরুরী।

আইসিটি শিক্ষণে উপকরণের ব্যবহার

আইসিটি শিক্ষার উপযোগী শিখন-শেখানো উপকরণ, সরঞ্জামাদিসহ দুস্প্রাপ্য সামগ্রী ও স্বল্প প্রাপ্য উপকরণ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ, অন্যান্য পাঠ্যপুস্তক ও শিখন-শেখানো সামগ্রী ভিডিও, টিভি, ইন্টারনেট ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা নেয়ার জন্য আইসিটি শিক্ষণ জরুরী।

আইসিটি ক্লাসে সকল শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণের উপায়

শ্রেণির কাজে শিক্ষার্থীর নিজস্ব কম্পিউটার সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োগে সক্ষম করে তোলা, শিক্ষার্থীদের বিদ্যমান ধারণা সনাক্তকরণ ও সুস্পষ্টকরণে গঠনকালীন শিখন যাচাইয়ের ব্যবহার, শিখন সক্ষমতা বৈচিত্র্যের অবতারণা যেমন, দলগত কাজ, সতীর্থ শিখন, বর্ধিত কার্যক্রম, অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও অর্জন নির্ণয়, ছেলে ও মেয়ে উভয় শিক্ষার্থীর আগ্রহের সৃষ্টি ও শিখনে সহযোগিতার পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা লাভের জন্য আইসিটি শিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে শেখা (Learning with ICT)

শিক্ষণ-শিখন (Teaching-Learning) কার্যক্রমকে আকর্ষণীয় ও কার্যকর করার এক অভূতপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করেছে আইসিটি। আইসিটি ব্যবহার করে আকর্ষণীয় ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত করা যায় যা গতানুগতিক শিক্ষা উপকরণের চেয়ে যথেষ্ট কার্যকর। শিক্ষকগণ ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে সফলভাবে শ্রেণিতে পাঠদান করতে পারেন। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (www) এবং ইন্টারনেটের ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা তাদের শ্রেণিকক্ষ ও পাঠ্য পুস্তকের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী জ্ঞানের সন্ধান করতে পারে। আবার আইসিটির সাহায্যে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের (যেমনঃ প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক) জন্য বিভিন্ন Computer Assisted Learning (CAL) ও Computer Assisted Instruction (CAI) সফটওয়্যার প্রস্তুত করা যায়। ফলে বিশ্বব্যাপী সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে আইসিটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

শিক্ষা ব্যবস্থাপনা

শিক্ষা ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরে ও পর্যায়ে আইসিটি ব্যবহার হচ্ছে বিভিন্নভাবে। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, এনটিআরসিএসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে অনলাইন আবেদন, শিক্ষকদের এমপিও প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদিতে আইসিটি পূর্ণমাত্রায় ব্যবহৃত হচ্ছে। ভবিষ্যতে এর ব্যবহার আরো বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

শিক্ষকের জন্য অনলাইন শিক্ষা

শিক্ষকগণ বিভিন্ন অনলাইন আইসিটি মাধ্যম ব্যবহার করে নিজেদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ পাচ্ছ। এর মধ্যে মুক্তপাঠ, মাইক্রোসফ্ট এমআইই এক্সপার্ট, সলোলার্ন (https://www.sololearn.com/), ক্যানভাস (canvas.iu.edu) ইত্যাদি MOOC সমূহ উল্লেখযোগ্য।

অন-লাইন ও কানেক্টিং ক্লাসের ধারণা

Zoom, Anydesk, Team Viewer, Skype, Blackboard Collaboration বা অনুরূপ আইসিটি টুল্স ব্যবহার করে নিজে যেমন অন-লাইনে ক্লাস পরিচালনার সুযোগ আছে তেমনি অন্যের ক্লাস শেয়ার করা যায়।

ই-বুক

সম্প্রতি এনসিটিবি, টিকিউআই-২ প্রকল্প ও সেসিপ প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্য বিষয়ে ই-বুক (Interactive Digital Textbook - IDT) তৈরি করে অন-লাইনে এবং অফ-লাইনে ই-বুক ব্যবহার করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

আমাদের দেশে 'লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম'-এর ধারণাটি খুব বেশি প্রচলিত নাই। সম্পূর্ণ বিনে খরচে অর্থাৎ বিনা মূল্যে Google Classroom (https://classroom.google.com/),এডমুডো (https://www.edmodo.com/), মোডল্স (https://moodle.org/), MyEducationlLab ইত্যাদি বিভিন্ন 'লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা LMS' টুল্স ব্যবহার করে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াকে সহজে ব্যবস্থাপনার মধ্যে নিয়ে আসা যায়।

জাতীয় নীতিমালাসমূহ ও আইসিটি শিক্ষণ

বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অন্তর্ভূক্তির বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে ২০১৫ সালে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ও ২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণ করা হয় যেখানে শিক্ষার সকল স্তরে ICT-কে অন্তর্ভূক্ত করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে মাধ্যমিক স্তরে (ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি) অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৫-এর 'ঘ.৪' অংশে 'শিক্ষা ও গবেষণা' সংক্রান্ত উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার পরিধি এবং মান দেশব্যাপী সম্প্রসারণ করা; শিক্ষার সর্বস্তরে এবং সরকারি পর্যায়ে কম্পিউটার সাক্ষরতা নিশ্চিত করা; যথোপযুক্ত গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে সৃষ্টিশীলতা উৎসাহিত করা; মেধাসম্পদ সৃষ্টি করা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে আইসিটি আত্মীকরণ (সূত্র: পৃ. ৬২৬৭, বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, আগস্ট ৫, ২০১৫)"। উক্ত নীতিমালায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে আইসিটি কোর্স অন্তর্ভূক্ত করে দেশব্যাপী আইসিটি সাক্ষরতা সম্প্রসারণ করার উপর জোর দেয়া হয়েছে। এছাড়াও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র এবং শিক্ষকদের ব্যয়-সাশ্রয়ী উপায়ে আইসিটিতে স্বাক্ষরতা নিশ্চিত করা এবং এ উদ্দেশ্যে পর্যায়ক্রমে সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উপযুক্ত কারিগরি সহায়তা সহকারে ল্যান এবং ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। সেইসাথে গণ সাক্ষরতা এবং আজীবন শিক্ষাসহ প্রতিবন্ধী এবং বিশেষ সহায়তা প্রয়োজন এমন ব্যক্তিদের শিক্ষা নিশ্চিত করতে আইসিটি নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা ও গবেষণাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে তার অন্যতম একটি নীতি হলো, "আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা" এবং সেখানে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যের একটি হলো "শ্রেণি কার্যক্রমে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা"।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। গৃহীত নীতিমালা এবং পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষক, শিক্ষা কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং শিক্ষার্থী সকলকেই তাই গুরুত্ব সহকারে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। তাই আইসিটি শিক্ষণ জরুরী।

প্রশ্নাবলি

১. ICT-এর পূর্ণরূপ কি?

২. ICT শিক্ষা ও শিক্ষায় ICT-এর অর্থ কী?

৩. আইসিটি শিক্ষণের উপকারিতা ব্যাখ্যা করুন ।

৪. জাতীয় নীতিমালাসমূহে আইসিটি শিক্ষণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন ।

তথ্যসূত্র

জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৫, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ।

জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০১২, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ ।

মোঃ আহসানুল আরেফিন চৌধুরী. (২০১৩). শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিঃ ধারণা, গুরুত্ব ও উপোযোগীতা. *মাধ্যমিক পর্যায়ের কলেজ শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্সের রিসোর্স বুক*. ঢাকা: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ।

মুশফিকুর রহমান. (2011, October 4).*তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষা এবং শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি*.Retrieved November 3, 2017, from বাংলাদেশের শিক্ষা: http://www.bn.bdeduarticle.com/তথ্য-ও-যোগাযোগ-প্রযুক্তি/.

CARNOY, Martin (2004). “ICT in Education: Possibilities and Challenges”. In: *Inaugural Lecture of the UOC 2004-2005Academic Year* (2004: Barcelona) [online]. UOC. Retrieved November 11, 2017, from http://www.uoc.edu/inaugural04/dt/eng/carnoy1004.pdf.

Arefin Chowdhury, M. A. (2012). *Teacher educators' perspectives of the introduction of ICT in education in Bangladesh, Critical Literacy: Theories and Practices*, 6(2), 66-85. (www.criticalliteracy.org.uk).

Arefin Chowdhury, M. A. (2013). *Integrating ICT in Teacher Education: Benchmarks for teachers' professional development in Bangladesh*. In J. Greenwood, J. Everatt, A. H. Kabir & S. Alam (Eds), Research and Educational Change inBangladesh (pp. 173.188), Dhaka: University of Dhaka Press.

Roblyer, M. D., & Doering, A. H. (2013). *Integrating educational technology into teaching* (6th ed.). New York: Allyn & Bacon.

ইউনিট ২ : মাধ্যমিক স্তরের ICT শিক্ষাক্রম

আলোচিত বিষয়বস্তুসমূহ:

২.১ মাধ্যমিক স্তরের ICT শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ

- শিক্ষাক্রম
- পাঠ্যসূচি
- পাঠ্য পুস্তক
- পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

২.২ বিষয় কাঠামো, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, শিখনফল

২.৩ পাঠ পরিসর

- ICT পরিচিতি
- প্রাত্যহিক জীবনে ICT
- মাল্টিমিডিয়া ও ICT
- জালিকা সংযোগ (Networking) ও ICT

ইউনিট ২

মাধ্যমিক স্তরের ICT শিক্ষাক্রম

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মানব সম্পদ উন্নয়ন ও জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের এক কার্যকর মাধ্যম। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এসডিজি'র লক্ষ্য অর্জনরে জরুরী। নিঃসন্দেহে এটি একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ। এই চ্যালেঞ্জের অংশ হিসেবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রমে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' বিষয়টি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের শ্রেণিসমূহে এ বিষয়টি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে প্রবর্তনের মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপকরণ ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি, দক্ষতার বিকাশ এবং পরবর্তীতে উচ্চশিক্ষা লাভের ভিত নির্মাণের মাধ্যমে দক্ষ ও উৎপাদনশীল জনসম্পদ সৃষ্টি করা। যার সুবাদে বাংলাদেশ দ্রুত একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে পারে।

২.১ মাধ্যমিক স্তরের ICT শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিব্যবহার করে বাংলাদেশের সকল মানুষের জীবন সহজ, সুন্দর ও আনন্দময় করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা। তাই জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টি শিক্ষা ব্যবস্থার সকল ধারায় বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হয়েছে।

২.১.১ ICT শিক্ষাক্রম

এসডিজি-এর লক্ষ্য হচ্ছে মানসম্মত শিক্ষার মাধ্যমে দেশকে উন্নত দেশে পরিণত করা। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া এবং মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার প্রধান উপায় হচ্ছে শিক্ষার মাধ্যমে যথোপযুক্ত জনশক্তি সৃষ্টি করা। আর শিক্ষার মাধ্যমে তা করার জন্য প্রয়োজন সময়োপযোগী শিক্ষাক্রম।

শিক্ষাক্রম দলিল ২০১২ অনুযায়ী স্বল্পতম সময়ে উন্নয়নশীল কোনো দেশকে উন্নত দেশের কাতারে নিয়ে যেতে হলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এ বিষয়ে শিক্ষা দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এ জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করার জন্য প্রয়োজন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষার মজবুত প্রাতিষ্ঠানিক ভিত। এ দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সকল ধারায় ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) তথ্যের আদান-প্রদান, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এমন এক অসাধারণ সুযোগ সৃষ্টি করেছে যার অনুপস্থিতিতে স্বাচ্ছন্দময় আধুনিক জীবন চিন্তাই করা যায় না। ব্যক্তিজীবনের উৎকর্ষ সাধন, জাতীয় জীবনের উন্নতি ও প্রগতি এবং বিশ্বের জাতিসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

শিক্ষাক্রম দলিলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি'র গুরুত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশ্বের জ্ঞান ও তথ্যভান্ডারে প্রবেশের অসীম সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। বর্তমানে সর্বত্রই বিভিন্ন কর্মকান্ডে আইসিটি ব্যবহার করা হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-নির্ভর উপকরণ ব্যবহার করে শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে কার্যকর ও আকর্ষণীয় করা হচ্ছে। এর ফলে শিখন কার্যক্রমে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের ভূমিকায় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উক্ত দলিলে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, কর্মপদ্ধতি, শ্রমবাজার ও যোগাযোগ জগতে এক নাটকীয় পরিবর্তন এনেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। ফলশ্রুতিতে আধুনিক বিশ্ব নতুন নতুন দক্ষতার কিংবা দক্ষতার নবায়ন প্রয়োজন বোধ করছে। কিন্তু আমাদের বর্তমান প্রজন্মের এ দক্ষতা অর্জনের সুযোগ প্রচলিত শিক্ষাক্রমে একেবারেই অপ্রতুল। যার প্রভাবে প্রযুক্তি ব্যবহারজনিত বৈষম্য (উরমরঃধষ ফরারফব), সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য, বেকারত্ব, দারিদ্র্য ইত্যাদি সমস্যাগুলো অদুর ভবিষ্যতে আরো প্রকট হয়ে দেখা দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের একটি কার্যকর মাধ্যম হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। এই চ্যালেঞ্জের অংশ হিসেবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাক্রমে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' বিষয়টি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার জন্য UNESCO কর্তৃক Jacques Delors-এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট 'Learning: The Treasure Within'-এ মাধ্যমিক শিক্ষাকে জীবনের প্রবেশদ্বার (gateway to life) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর অর্থ কর্মজীবনে প্রবেশের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যমে অর্জন হবে। এর অংশ হিসেবে ষষ্ঠ,

সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিতে এ বিষয়টি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে প্রবর্তনের মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপকরণ ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি, দক্ষতার বিকাশ এবং পরবর্তীতে উচ্চশিক্ষা লাভের ভিত নির্মাণের মাধ্যমে দক্ষ ও উৎপাদনশীল জনসম্পদ সৃষ্টি করা । যার সুবাদে বাংলাদেশ দ্রুত একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে পারে ।

সার্বিক বিবেচনায় ও জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম কাঠামোতে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে এবং যুগের চাহিদা বিবেচনা করে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর সমন্বয় করা হয়েছে এ শিক্ষাক্রমে ।

২.১.২ পাঠ্যসূচি

'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের শিক্ষাক্রম ২০১২'-তে শ্রেণিভিত্তিক পাঠ্যসূচি প্রণীত হয়েছে । বর্ণিত পাঠ্যসূচিতে শ্রেণিভিত্তিক অধ্যায় বিন্যাস নিম্নরূপ :

ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণি :

অধ্যায়	ষষ্ঠ শ্রেণি	সপ্তম শ্রেণি	অষ্টম শ্রেণি	নবম-দশম শ্রেণি
প্রথম অধ্যায়	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পরিচিতি	প্রাত্যহিক জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং আমাদের বাংলাদেশ
দ্বিতীয় অধ্যায়	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি	কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি	কম্পিউটার নেটওয়ার্ক	কম্পিউটার ও কম্পিউটার ব্যবহারকারীর নিরাপত্তা
তৃতীয় অধ্যায়	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরাপদ ও নৈতিক ব্যবহার	নিরাপদ ও নৈতিক ব্যবহারের গুরুত্ব	আমার শিক্ষায় ইন্টারনেট
চতুর্থ অধ্যায়	ওয়ার্ড প্রসেসিং	ওয়ার্ড প্রসেসিং	স্প্রেডশিটের ব্যবহার	আমার লেখালেখি ও হিসাব
পঞ্চম অধ্যায়	ইন্টারনেট পরিচিতি	শিক্ষায় ইন্টারনেটের ব্যবহার	শিক্ষা ও দৈনন্দিন জীবনে ইন্টারনেটের ব্যবহার	মাল্টিমিডিয়া ও গ্রাফিক্স
ষষ্ঠ অধ্যায়	--	--	--	ডেটাবেজের ব্যবহার

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি :

অধ্যায়	একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি
প্রথম অধ্যায়	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত
দ্বিতীয় অধ্যায়	কমিউনিকেশন সিস্টেমস ও নেটওয়ার্কিং
তৃতীয় অধ্যায়	সংখ্যা পদ্ধতি ও ডিজিটাল ডিভাইস
চতুর্থ অধ্যায়	ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং HTML
পঞ্চম অধ্যায়	প্রোগ্রামিং ভাষা
ষষ্ঠ অধ্যায়	ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

২.১.৩ শিক্ষাক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের কতিপয় বৈশিষ্ট্য

মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম ২০১২ ও পাঠ্যপুস্তকসমূহ পর্যালোচনা করলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের কতিপয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে এর কয়েকটি উল্লেখ করা হলো :

- সাধারণ, মাদ্রাসা ও ইংরেজি শিক্ষা ধারাসহ সকল ধারার শিক্ষার জন্য অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত একমুখী ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন।
- মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শ্রেণিতে (ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ) 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' বিষয় আবশ্যিক হিসাবে সংযোজন।
- বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী, কর্মমুখী ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ।
- শিখন-কৌশল কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে সৃজনশীল করা অর্থাৎ বিশ্লেষণমূলক, চিন্তন উদ্দীপক ও সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর ও কাজ অনুশীলনের মাধ্যমে সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার বিকাশের সুযোগ প্রদান।
- যেসব বিষয়ে ব্যবহারিক কাজ আছে যেমন- বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, কৃষিশিক্ষা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, চারু ও কারুকলা বিষয়ের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অংশের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং শিক্ষাকে জীবন ও বাস্তবমুখী করার প্রয়াস। অর্থাৎ প্রতিটি তত্ত্ব, সূত্র ও নীতি শিক্ষার সাথে সাথে ব্যবহারিক কাজ করার সুযোগ প্রদান।
- হাতে কলমে করে শেখা ও দলগত আলোচনা করে শেখার উপর গুরুত্ব প্রদান।
- শ্রেণি কার্যক্রমে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি।
- শিক্ষাকে জীবন ও বাস্তবমুখী করার প্রয়াস এবং দেশীয় প্রেক্ষাপটে উন্নয়নক্ষম জনশক্তি সৃষ্টির উপর গুরুত্ব প্রদান।
- অধ্যায় থেকে কী কী জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে তা বুদ্ধিবত্তিক, মনোপেশিজ ও আবেগীয় শিখনফল হিসাবে প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে সংযোজন।
- শিক্ষার মাধ্যমে সর্বপ্রকার বৈষম্য দূর করে সমতা বিধানের সুযোগ সৃষ্টি। লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ, জাতি, পেশাগত ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে একীভূত শিক্ষায় গুরুত্ব প্রদান।
- বিশ্বায়নের চাহিদা অনুসারে মানবসম্পদ সৃষ্টির প্রয়াস।
- প্রতি পিরিয়ডের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি, অধ্যায় ভিত্তিক পিরিয়ড নির্ধারণ, শিক্ষাবর্ষে কর্মদিবসের সংখ্যা বৃদ্ধি।
- ধারাবাহিক মূল্যায়নের (গঠনকালীন মূল্যায়ন) মাধ্যমে শিখন দূর্বলতা চিহ্নিত করে নিরাময়মূলক সেবার মাধ্যমে শিখন নিশ্চিতকরণ।
- প্রচলিত ব্যবহারিক পরীক্ষার সংস্কার সাধনের মাধ্যমে অতিরিক্ত নম্বর প্রদানের সুযোগ বৃদ্ধি করা।
- সামষ্টিক মূল্যায়ন/সাময়িক পরীক্ষা ও পাবলিক পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার।
- প্রতিটি বিষয়ের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির প্রান্তিক শিখনফল এবং প্রান্তিক শিখনফলের ভিত্তিতে শ্রেণিভিত্তিক শিখনফল বিন্যস্ত করায় আইসিটি শিক্ষাক্রম উল্লম্বভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।
- ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্যাবলির কোনটির কী মাত্রায় কোন বিষয়ে অর্জিত হবে তা সুষ্ঠুভাবে বিবেচনা করে আইসিটি বিষয়ের উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক শিখনফল বিন্যস্ত করা হয়।

বিবেচনা শেষে বলা যায়, মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম ২০১২-এ 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' বিষয়টি স্থান পাওয়া যথার্থ হয়েছে।

২.১.৪ পাঠ্যপুস্তক

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টির পাঠ্যপুস্তকটি সহজ ভাষায় শিক্ষার্থীবান্ধব করে পাঠ্য বই রচনার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টি ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির শিক্ষাক্রমে প্রথম সংযোজন। ধরে নেওয়া যায়, আমাদের অধিকাংশ শিক্ষার্থী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত নয়। এ প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের জন্য বোধগম্য আকর্ষণীয় আনন্দদায়ক ও মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমে লেখকের জন্য কিছু নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলো শিক্ষার্থীদের মানসিক বয়স, শিক্ষা স্তর ও পাঠদানের সুযোগ সুবিধা বিবেচনায় রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে। এজন্য বিষয়গুলো বাস্তব উদাহরণ, চিত্র, ছবি, চার্ট ইত্যাদি সমন্বয়ে সহজভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি পাঠ পাশাপাশি দুটো পৃষ্ঠায় চলতি ভাষায় এনসিটিবি'র বানানরীতি অনুসরণ করে

রচনা করা হয়েছে। টেকনিক্যাল শব্দ ও পরিভাষার ক্ষেত্রে ইংরেজি ব্যবহার করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলো ডবল ক্রাউন ১/৮ সাইজের কাগজে চার রঙে মুদ্রিত। বিষয়টিতে তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক উভয় ধরনের আলোচনা থাকায় সমন্বিতভাবে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা রয়েছে এবং পাঠ্যপুস্তকও সেভাবেই প্রণীত। বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায় সততা, নৈতিকতা, দেশপ্রেম, ধর্ম নিরপেক্ষতা, পরমত সহিষ্ণুতা, সংবেদনশীলতা ইত্যাদি সামাজিক ও নৈতিক গুণাবলির বিকাশ এবং আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে এবং অধ্যায়ের বিষয়বস্তুগুলোকে নির্দিষ্ট সংখ্যক পাঠে বিভাজন করা হয়েছে। পাঠ আলোচনায় প্রয়োজনীয় তথ্য ও সংশ্লিষ্ট ইলাস্ট্রেশন সংযুক্ত করা হয়েছে। অধ্যায় শেষে 'কাজ' ও 'নতুন শিখলাম' নামে অংশ যুক্ত করা হয়েছে।

২.২ বিষয় কাঠামো, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও শিখনফল

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-তে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' বিষয়েরবিষয় কাঠামো, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও শিখনফল সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

২.২.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি'র বিষয় কাঠামো

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর নির্দেশনা অনুযায়ী 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' বিষয়টি ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত আবশ্যিক পাঠ্য বিষয় হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুযায়ী শিক্ষাক্রম কাঠামোতে শ্রেণিভিত্তিক পরীক্ষার নম্বর ও পিরিয়ড বা সময় বন্টন সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা আছে। যেহেতু বিষয়টিতে তাত্ত্বিক আলোচনার চাইতে ব্যবহারিক বিষয়বস্তু বেশিগুরুত্ব পেয়েছে তাই মূল্যায়নেও এর প্রতিফলন রয়েছে।

শিক্ষাক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের ৬ষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণিতে প্রতিটি ক্লাসের জন্য ৫০ মিনিট এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির জন্য ৬০ মিনিট সময় বরাদ্দ রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। নবম-দশম শ্রেণিতে সপ্তাহে দুটি ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে সপ্তাহে তিনটি ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে। হাতে–কলমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির দক্ষতা উন্নয়নের জন্য অথবা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পাঠদানের জন্য শিক্ষক একাধিক পিরিয়ড একসাথে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন। তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক সমন্বিতভাবে অর্থাৎ তত্ত্বীয় অংশ এবং এ সংশ্লিষ্ট ব্যবহারিক অংশের শিখন-শেখানো কার্যক্রম একই সাথে পরিচালিত হবে।

নিম্নে শ্রেণিভিত্তিক পরীক্ষার নম্বর ও পিরিয়ড বা সময় বন্টন দেখানো হলো:

শ্রেণি	পরীক্ষার নম্বর	সময়বণ্টন (ক্লাস পিরিয়ড)		
		সাপ্তাহিক	সাময়িক	বার্ষিক
ষষ্ঠ-অষ্টম	৫০	২	৩৫	৭০
নবম-দশম	৫০	২	৩২	৬৪
একাদশ-দ্বাদশ	১০০	৩	-	-

২.২.২ লক্ষ্য

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর ১২তম অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে 'তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা'। এতে বলা হয়েছে যে, প্রায় দুই শতাব্দী আগে শিল্প বিপবের কারণে সভ্যতার গতিপ্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছিল, একুশ শতকে তথ্য প্রযুক্তির বিপবের ভেতর দিয়ে আবার সেই গতিপ্রকৃতি পরিবর্তিত হতে যাচ্ছে। এই তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লবের অংশীদার হয়ে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে দারিদ্র্য বিমোচনের একটি অভাবিত সুযোগ পেয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার করে সর্বক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব। রাষ্ট্র পরিচালনায় স্বচ্ছতা এনে দূর্নীতির মূলোৎপাটন করার ক্ষেত্রেও তথ্যপ্রযুক্তি অনেক বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। তাছাড়াও তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তি সরবরাহসহ সম্ভাবনাময় রপ্তানিখাত হিসেবে সফট্ওয়্যার, ডাটা প্রসেসিং বা কলসেন্টার জাতীয় service industry বিকাশে আলাদাভাবে গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষার লক্ষ্য নিম্নরূপ :

- উপর্যুক্ত কর্মযজ্ঞের জন্য তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষায় আন্তর্জাতিক মান ও গুণ সম্পন্ন শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির প্রচেষ্টা চালানো
- তথ্যপ্রযুক্তিকে শুধুমাত্র কম্পিউটার বিজ্ঞানের মাঝে সীমিত না রেখে মোবাইল ফোন, রেডিও, টেলিভিশন, নেটওয়ার্কিং কিংবা সকল তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণের ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ।

(পৃ. ৩১, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০)

শিক্ষাক্রম দলিল ২০১২ অনুযায়ী ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির আইসিটি শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে, "শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের মাধ্যমে মানবিক, সামাজিক ও নৈতিক গুণসম্পন্ন জ্ঞানী, দক্ষ, যুক্তিবাদী ও সৃজনশীল দেশপ্রেমিক জনসম্পদ সৃষ্টি।" তাই উক্ত লক্ষ্য অর্জনে কতিপয় কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। কৌশলের প্রস্তাব অনুযায়ী শিক্ষার একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে উচ্চ স্তর এবং তৎ পরবর্তী চাকুরীকালেও কম্পিউটার শিক্ষা দান ও প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব অরোপ করা হয়েছে। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তি অলিম্পিয়াড আয়োজনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

২.২.৩ উদ্দেশ্য

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-এ ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি, নবম-দশম শ্রেণি ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে কতিপয় উদ্দেশ্যে বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে এ সকল উদ্দেশ্য উল্লেখিত হলো:

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যেসমূহ:

১. শিক্ষার্থীদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অসীম সম্ভাবনা সম্পর্কে অবগত করে বিশ্বের জ্ঞান ও তথ্যভান্ডারে প্রবেশের দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া।
২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাবে ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ সাধন করা।
৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীদের সমর্থ করা।
৪. ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, মেধা ও সৃজনশীলতার বিকাশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা।
৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সাথে সম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি অনুধাবনে সক্ষম করা।
৬. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নৈতিক আচরণের অভ্যাস গড়ে তুলতে সহায়তা করা।
৭. বেকারত্ব নিরসন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত করা।
৮. শিক্ষার্থীদের সহযোগিতামূলক মনোভাব ও নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ ঘটানো।
৯. জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভ করার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা।

উৎস: জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ (মাধ্যমিক), পৃষ্ঠা ২৬।

নবম-দশমশ্রেণির তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যেসমূহ:

১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অসীম সম্ভাবনা সম্পর্কে অবগত হওয়া।
২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশ্বের জ্ঞান ও তথ্যভান্ডার ব্যবহার করা।
৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাবে ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা।
৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে মেধা ও সৃজনশীলতা বিকাশে সক্ষম হওয়া।
৫. দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ হওয়া।
৬. উপকরণ ও ব্যবহারকারীর নিরাপত্তা বজায় রেখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে সক্ষম হওয়া।
৭. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নৈতিকতা বজায় রাখা।
৮. কর্মে সফলতা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হওয়া।
৯. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপকরণ ব্যবহারে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব ও নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জনে সক্ষম হওয়া।
১০. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভ করার দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা।

উৎস: জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ (মাধ্যমিক), পৃষ্ঠা ৫৪।

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যেসমূহ:

১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অসীম সম্ভাবনা সম্পর্কে অবগত হওয়া।
২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশ্বের জ্ঞান ও তথ্যভান্ডার ব্যবহার করতে সক্ষম হওয়া।
৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাবে ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা।

৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে তথ্যের আদান প্রদানের প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।
৫. দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ হওয়া।
৬. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে মেধা ও সৃজনশীলতা বিকাশে সক্ষম হওয়া।
৭. বেকারত্ব নিরসন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মে সফলতা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিব্যবহারে সক্ষম হওয়া।
৮. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপকরণ ব্যবহারে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব প্রদর্শনের মাধ্যমে নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন করা।
৯. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নৈতিক আচরণে অভ্যস্থ হওয়া।
১০. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভ করার দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা।

উৎস: জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ (উচ্চ মাধ্যমিক), পৃষ্ঠা ২৫।

বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ বিবেচনা করলে দেখা যায় যে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' বিষয় অধ্যয়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিভিন্ন জীবনমুখী ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করবে। একই সাথে শিক্ষার্থীর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠার পাশাপাশি প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনের প্রভাবের সংগেও খাপ খাইয়ে নিয়ে নিজেদের আচরণ ও অভ্যাসের পরিবর্তন সাধন করবে। আরো প্রত্যাশা করা যায় যে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অসীম সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে শিক্ষার্থীরা জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অভ্যস্থ হয়ে উঠবে।

২.২.৪ শ্রেণিভিত্তিক শিখনফলের বিভাজন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-এ ষষ্ঠ হতে অষ্টম শ্রেণির প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য একটি করে প্রধান শিখনফল ও অষ্টম শ্রেণি শেষে প্রান্তিক শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। আবার ষষ্ঠ হতে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির ক্ষেত্রে প্রতি শ্রেণির প্রতি অধ্যায়ে বিষয়বস্তুর সাথে মিল করে একাধিক শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে।

নিম্নে ষষ্ঠ হতে অষ্টম শ্রেণির শ্রেণিভিত্তিক শিখনফল ও অষ্টম শ্রেণি শেষে প্রান্তিক শিখনফল বর্ণিত হলো:

ষষ্ঠ হতে অষ্টম শ্রেণির শ্রেণিভিত্তিক শিখনফল :

ক্রম.	৬ষ্ঠ শ্রেণি	৭ম শ্রেণি	৮ম শ্রেণি
১	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে পারবে।	ব্যক্তিজীবন, কর্মক্ষেত্র ও সমাজ জীবনে তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযক্তির ভমিকা মূল্যায়ন করতে পারবে।	বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রায়োগিক ক্ষেত্রসূমহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক যন্ত্রপাতির কাজ ব্যাখ্যা এবং ব্যবহার করতে পারবে।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক যন্ত্রপাতির কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে।	কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতির কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৩	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরাপত্তার বিভিন্ন দিকসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরাপদ ও নৈতিক ব্যবহার সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে।	নিরাপত্তা ও নৈতিকতার গুরুত্ব মূল্যায়ন করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারবে।
৪	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে লেখার কাজ করতে পারবে।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে লেখার কাজ করতে পারবে।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে।
৫	ইন্টারনেট ব্যবহার করে তথ্য অনুসন্ধান করতে পারবে।	ইন্টারনেট ব্যবহার করে শিক্ষা ও দৈনন্দিন জীবন সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে পারবে।	শিক্ষা ও দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধানে ইন্টারনেটের ভুমিকা মূল্যায়ন করতে পারবে।
৬	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক আচরণ করবে।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক আচরণ করবে।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক আচরণ করবে।

উৎস: জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ (মাধ্যমিক), পৃষ্ঠা ২৭।

অষ্টম শ্রেণি শেষে প্রান্তিক শিখনফল

১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব অনুধাবনে সক্ষম হবে এবং ব্যক্তিজীবন, কর্মক্ষেত্র, সমাজ এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে এর ভুমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক যন্ত্রপাতির কাজ ও নেটওয়ার্ক ব্যাখ্যা এবং ব্যবহার করতে সক্ষম হবে;
৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নিরাপদ ও নৈতিকভাবে ব্যবহার করতে পারবে;

৪. ভাষাগত ও গাণিতিক দক্ষতা অর্জনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সঠিক, আকর্ষণীয় ও নান্দনিকভাবে ব্যবহারে সক্ষম হবে;
৫. গুণাগুণ বিচার করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষা ও দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধানে সক্ষম হবে;
৬. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক আচরণ প্রকাশ করবে।

উৎস: জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ (মাধ্যমিক), পৃষ্ঠা ২৬-২৭।

এছাড়া, নমুনা হিসেবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-এ নবম-দশম শ্রেণির প্রথম অধ্যায়ের শিখনফল উল্লেখ করা হলো:

প্রথম অধ্যায়: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ও আমাদের বাংলাদেশ

বুদ্ধিবৃত্তীয়

১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে;
২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অবদান বর্ণনা করতে পারবে;
৩. বাংলাদেশে ই-লার্নিংয়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে;
৪. বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্সের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
৫. বাংলাদেশে ই-সার্ভিসের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে;
৬. বাংলাদেশে ই-কমার্সের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে;
৭. বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করতে পারবে;
৮. সামাজিক যোগাযোগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
৯. বিনোদনের ক্ষেত্রে আইসিটির ইতিবাচক দিকগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে;
১০. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিনির্ভর ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

মনোপেশিজ

১১. 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর বাংলাদেশ' বিষয়ক একটি পোস্টার ডিজাইন করতে পারবে।

আবেগীয়

১২. বাংলাদেশের উন্নয়নে অব্যাহতভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হবে;
১৩. পোস্টার ডিজাইন শীর্ষক দলগত কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করতে আগ্রহী হবে।

উৎস: জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ (মাধ্যমিক), পৃষ্ঠা ৫৮-৫৯।

একই সাথে নমুনা হিসেবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-এ একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির প্রথম অধ্যায়ের শিখনফল উল্লেখ করা হলো:

প্রথম অধ্যায়: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

১. বিশ্বগ্রামের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
২. বিশ্বগ্রাম ধারণা সংশ্লিষ্ট প্রধান উপাদানগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবে;
৩. বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান মূল্যায়ন করতে পারবে;
৪. ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ধারণা বিশ্লেষণ করতে পারবে;
৫. প্রাত্যহিক জীবনে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারবে;
৬. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাম্প্রতিক প্রবণতা বিশ্লেষণ করতে পারবে;
৭. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারে নৈতিকতা বজায় রাখার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে;
৮. সমাজ জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারবে;
৯. অর্থনৈতিক উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে;
১০. মূল্যবোধ বজায় রেখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হবে।

উৎস: জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ (উচ্চ মাধ্যমিক), পৃষ্ঠা ২৮।

লক্ষ করা যায়, ষষ্ঠ হতে অষ্টম শ্রেণি ও নবম-দশম শ্রেণির শিখনফল লেখায় ও নির্ধারণে বুদ্ধিবৃত্তীয়, মনোপেশিজ ও আবেগীয় ক্ষেত্র উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির ক্ষেত্রে উল্লেখিত ক্ষেত্র তিনটি উল্লেখ না করে বিষয়বস্তুর সাথে মিল করে শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে।

২.৩ পাঠ পরিসর ও অনুক্রম

আইসিটি বিষয়ে পাঠ পরিসর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। পাঠ পরিসরের পাশাপাশি অনুক্রমের আলোচনার আবশ্যতা রয়েছে। প্রথমে পাঠ পরিসর ও অনুক্রমের ধারণা সম্পর্কে সাধারণ আলোচনার পর মাধ্যমিক পর্যায়ের আইসিটি শিক্ষাক্রমে এর প্রতিফলন সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হলো।

M. Ediger ও Bhaskara Rao (২০০৩)-এর মতে: "Scope pertains to the breadth of content taught in various units of study in the curriculum." (পৃষ্ঠা: ২৭) অর্থাৎ শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন অধ্যায়ে অলোচিত বিষয়বস্তুর প্রসারতাই পরিসর।

Geraldine O'Neill (২০১০)-এর মতে: "Scope refers to the breadth and the depth of content in a curriculum. This content must include both the knowledge domain and other aspects, such as, affective (values and attitudes) and where appropriate Psychomotor (motor) skills. This is often described as the discipline-specific and generic skills required in a curriculum." (পৃষ্ঠা: ২) অর্থাৎ শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তুর প্রসারতা ও গভীরতাই পরিসর।

Marsh (১৯৯৭)- এর মতে: "Scope refers to the extent and arrangement of curriculum elements that can occur across topics or subjects while 'sequence' refers to the organization over a period of time, in some cases, a number of years." (পৃষ্ঠা: ৫৬) অর্থাৎ শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি ও বিন্যাসই হচ্ছে পরিসর। আর, একটি নির্দিষ্ট সময়কাল বা ক্ষেত্র বিশেষে কয়েক বছরব্যাপী বিষয়বস্তুর সংগঠন হচ্ছে অনুক্রম।

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোর পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, বিভিন্ন অধ্যায়ে শিখনযোগ্য বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা বা পরিব্যাপ্তি ও বিষয় গভীরতা সংক্রান্ত বিবরণ হচ্ছে পরিসর (Scope) এবং নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর বিভিন্ন বিষয়ে অন্তর্ভূক্তি হচ্ছে অনুক্রম (Sequence)। কোন নির্দিষ্ট শ্রেণি বা গ্রেডে শিখন বিষয়বস্তুর গভীরতা ও বিস্তৃতিকে পাঠ পরিসর বলে। সংক্ষেপে, কোনো শ্রেণিতে কি কি শেখানো হবে তার ধারণা, বিষয়বস্তু ইত্যাদির একটি তালিকা হচ্ছে পাঠ পরিসর। শিক্ষাক্রমে এগুলো ক্রমানুসারে সাজানো থাকে। কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণি বা স্তর শেষে একজন শিক্ষার্থী কি কি শিখবে এর একটি বিবরণ শিক্ষাক্রমে বর্ণিত থাকবে। সে অনুযায়ী কোর্স সামগ্রী তৈরি করা হয় এবং শিক্ষক শ্রেণি পাঠদানে সে বিষয়গুলোর শিখন নিশ্চিত করে থাকেন।

Marsh পরিসরের কতগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, পাঠ্যক্রমে পরিসর ধীরে ধীরে নিচু শ্রেণি বা স্তর থেকে উচ্চ স্তরে বিস্তৃত হয়। একই সাথে এক শ্রেণি থেকে অন্য শ্রেণিতে কতিপয় কন্টেন্ট বাদ দিয়ে নতুন কন্টেন্ট যুক্ত করা হয়। তবে, পরিসরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিষয়বস্তুর গভীরতা ও বিস্তৃতিতে পরিবর্তন।

Ediger ও Rao (২০০৩)-এর মতে শিক্ষাক্রমে পরিসরের পর অনুক্রম নির্ধারণ করতে হয়। অনুক্রম নির্ধারণের কতিপয় মানদ- বা অনুমাপক রয়েছে। অনুক্রম রক্ষার ক্ষেত্রে পাঠের অধ্যায় বা ইউনিট নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন ও আগ্রহের বিষয়বস্তু বিবেচনায় আনতে হয়। শিক্ষার্থীদের নিকট বোধগম্য হবে এমন পঠিতব্য বিষয়বস্তু শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভূক্ত করতে হয়। এ ক্ষেত্রে সহজ থেকে কঠিন বিষয়ের অবতারণা করা হয়। তবে অধ্যায়সমূহ পরস্পর থেকে এমনভাবে পৃথক হবে যেন একই শ্রেণিতে একই বিষয় একাধিক অধ্যায়ে না থাকে অর্থাৎ পুনরাবৃত্তি পরিহার করতে হবে। পাঠের কন্টেন্টসমূহ এমন হবে যেন শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা থাকে। একইসাথে পূর্ববর্তী শ্রেণির পাঠের সাথে পরবর্তী শ্রেণির পাঠের ধারাবাহিকতা থাকা চাই এবং এক শ্রেণি থেকে অন্য শ্রেণিতে পাঠ্য বিষয়বস্তুর ক্রম (Order) রক্ষা করা হয়। কন্টেন্টসমূহে সনাতন ধারণা ও বিষয়বস্তুর সাথে চলমান ও আধুনিক বিষয়বস্তুগত ধারণার সমন্বয় করণের ব্যবস্থা থাকবে। মনে রাখতে হবে যে, পঠিতব্য অধ্যায় বা বিষয়বস্তুতে ন্যায্যতা, প্রাসঙ্গিকতা ও যথার্থতা রক্ষা করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে।

পরিসর ও অনুক্রমের সাথে শিক্ষাক্রমের অনুভূমিক বিন্যাস ও উল্লম্ব বিন্যাসের ধারণা সমান্তরালে আলোচনা আবশ্যক। Reyes (২০০০)-এর মতে শিক্ষাক্রমের অনুভূমিক বিন্যাসে (Horizontal Organization of Curriculum) একটি বিষয়ের সাথে অন্যান্য বিষয়ের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়বস্তুকে বিবেচনা করা হয়। আর উল্লম্ব বিন্যাসে (Vertical Organization of Curriculum) নির্দিষ্ট বিষয়ে পূর্ববর্তী শ্রেণিতে অধীত একই বিষয়বস্তু পরবর্তী শ্রেণিতে বিষয় গভীরতা ও বিস্তৃতিতে অর্থাৎ পুরাতন আলোচ্য বিষয়বস্তুর সাথে আর কি কি নতুন বিষয়বস্তু যুক্ত হবে এবং পুরাতন বিষয়বস্তুর কি কি আরো গভীরভাবে আলোচিত হবে তার বিবরণ থাকে। এ কারণে Marsh পরিসরকে অনুভূমিক বিন্যাসের এবং অনুক্রমকে উল্লম্ব বিন্যাসের নামান্তর বলে উল্লেখ করেছেন। আবার, Henson (২০১৫)-এর মতে উল্লম্ব বিন্যাস "শিক্ষাক্রমের সর্পিল মডেল"-কে সমর্থন করে। তিনি বিষয়বস্তুর পরিণমতার জন্য একই বিষয়কে পরবর্তী শ্রেণিতে বা আরো উচ্চতর স্তরে বিষয় গভীরতার সাথে অন্তর্ভূক্তির জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর মতে শিক্ষার্থীরা পূর্ববর্তী শ্রেণিতে সহজ কোন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করলে পরবর্তী শ্রেণিতে আরো কঠিন ও জটিল বিষয় সহজে আয়ত্ব করতে সক্ষম হবে। এক্ষেত্রে বিষয়বস্তুসমূহ বার বার অধ্যয়নের সুযোগ থাকতে হবে। "শিক্ষাক্রমের সর্পিল মডেল" তাই পূর্বে অধীত বিষয়ের সাথে পরবর্তী অধিতব্য বিষয়ের ধাপে ধাপে সংযোগ সাধনকে সমর্থন করে।

Marsh কয়েক দশকে পরিসর নির্ধারণে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণের কতিপয় রীতি বা চর্চা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। এ সকল রীতি বা চর্চাগুলো হচ্ছে:

- বিষয় অনুযায়ী (by subject) বিন্যস্ত করা বা সংগঠিত করা;
- সক্রিয়তা বা কর্মকান্ড (by activity) ও শিখন অভিজ্ঞতা (by experience) অনুযায়ী বিন্যস্ত করা;

- সামাজিক ও পেশাগত (by social & occupational problem) ক্ষেত্রের সমস্যা অনুযায়ী বিন্যস্ত করা;
- পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত (by correlation) বিভিন্ন বিষয় অনুযায়ী বিন্যস্ত করা;
- বড় ক্ষেত্র (by broad fields) অনুযায়ী বিন্যস্ত করা;
- জীবনের বাস্তব সমস্যা বা পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়বস্তু একীভূত করা ।

লক্ষ্য করা গেছে যে, প্রথম দুটি উপায় সবচেয়ে বেশি অনুসরণ করা হয়ে থাকে । বিষয়বস্তুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাজন করে পরিসর নির্ধারণ করা হয় ।

মাধ্যমিক পর্যায়ের 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' বিষয়ের পাঠ বিভাজন:

এবার মাধ্যমিক পর্যায়ের (ষষ্ঠ থেকে দশম) "তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি" বিষয়টির শ্রেণি ও অধ্যায়ভিত্তিক পাঠ বিভাজন, অধ্যায় ভিত্তিক বরাদ্দকৃত পিরিয়ড, পৃষ্ঠা, পাঠ সংখ্যাগুলো লক্ষ্য করি । এ ক্ষেত্রে ২০১৭ সালে পুণর্মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনায় বিবেচনা করা হয়েছে ।

পাঠ বিভাজন ঃ ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণি

অধ্যায়	ষষ্ঠ শ্রেণি	সপ্তম শ্রেণি	অষ্টম শ্রেণি
প্রথম	**তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পরিচিতি:** ১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ধারণা-২টি পাঠ ২. উপাত্ত ও তথ্য ৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার-৩টি পাঠ ৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব- ২টি পাঠ **মোট পাঠ: ৮টি**	**প্রাত্যহিক জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি** ১. ব্যক্তিজীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-২টি পাঠ ২. কর্মক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-৩টি পাঠ ৩. সমাজজীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-২টি পাঠ **মোট পাঠ: ৭টি**	**তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব** ১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব ২. কর্মসৃজন ও কর্মপ্রাপ্তিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ৩. যোগাযোগ ৪. ব্যবসায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব ৫. সরকারি কর্মকান্ডে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগ ৬. চিকিৎসা ৭. গবেষণা **মোট পাঠ: ৭টি**
দ্বিতীয়	**তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি:** ১. কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ২. কম্পিউটার কম্পিউটার খেলা ৩. ইনপুট ডিভাইস ৪. মেমোরি ও স্টোরেজ ডিভাইস ৫. প্রসেসর ও মাদার বোর্ড ৬. আউটপুট ডিভাইস ৭. সফটওয়্যার ৮. এপ্লিকেশন সফটওয়্যার ৯. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আরও কিছু যন্ত্রপাতি **মোট পাঠ: ৯টি**	**কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি** ১. ইনপুট ডিভাইস-২টি পাঠ ২. মেমোরি ও স্টোরেজ ডিভাইস-২টি পাঠ ৩. মাদার বোর্ড-২টি পাঠ ৪. প্রসেসর ৫. ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস-৩টি পাঠ ৬. আউটপুট ডিভাইস **মোট পাঠ: ১১টি**	**কম্পিউটার নেটওয়ার্ক** ১. নেটওয়ার্কের ধারণা ২. টপোলজি ৩. নেটওয়ার্কের ব্যবহার-২টি পাঠ ৪. নেটওয়ার্ক সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি-২টি পাঠ (হাব, সুইচ, রাউটার, মডেম, ল্যান কার্ড) ৫. স্যাটেলাইট ও অপটিক্যাল ফাইবার **মোট পাঠ: ৭টি**

অধ্যায়	ষষ্ঠ শ্রেণি	সপ্তম শ্রেণি	অষ্টম শ্রেণি
তৃতীয়	<u>তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার</u> ১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার ২. আইসিটি যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ৩. সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ ৪. আইসিটি ব্যবহারে ঝুঁকি ও সতর্কতা অবলম্বনের পন্থা-২টি পাঠ **মোট পাঠ: ৫টি**	<u>তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরাপদ ও নৈতিক ব্যবহার</u> ১. সচেতন ব্যবহার ২. আসক্তি-৩টি পাঠ ৩. কপিরাইট ৪. নৈতিকতা ও প্লেজিয়ারিজম-৩টি পাঠ **মোট পাঠ: ৮টি**	<u>তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরাপদ ও নৈতিক ব্যবহার</u> ১. নিরাপত্তা বিষয়ক ধারণা ২. ক্ষতিকারক সফটওয়্যার ৩. কম্পিউটার ভাইরাস ৪. অনলাইন পরিচয় ও তার নিরাপত্তা ৫. সাইবার অপরাধ ৬. দুর্নীতি নিরসন ৭. তথ্য অধিকার ও তথ্য অধিকার আইন **মোট পাঠ: ৭টি**
চতুর্থ	<u>ওয়ার্ড প্রসেসিং</u> ১. ওয়ার্ড প্রসেসর কী? ২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে ওয়ার্ড প্রসেসরের এর গুরুত্ব ৩. ওয়ার্ড প্রসেসর ব্যবহার করে নতুন ফাইল খোলা ও লেখা-২৬টি পাঠ **মোট পাঠ: ২৮টি**	<u>ওয়ার্ড প্রসেসিং</u> • ওয়ার্ড প্রসেসিং ও বাংলা কীবোর্ড এর ব্যবহার-২৮টি পাঠ **মোট পাঠ: ২৮টি**	<u>স্প্রেডশিটের ব্যবহার</u> ১. স্প্রেডশিট ২. স্প্রেডশিট সফটওয়্যার ব্যবহারের কৌশল-২১টি পাঠ **মোট পাঠ: ২২টি**
পঞ্চম	<u>ইন্টারনেট পরিচিতি</u> ১. ইন্টারনেট ২. ইন্টারনেট সংযোগ ও নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্ক খেলা- ২টি পাঠ ৩. ওয়েবসাইট ৪. ওয়েব ব্রাউজার ও সার্চ ইঞ্জিন **মোট পাঠ: ২০টি**	<u>শিক্ষায় ইন্টারনেটের ব্যবহার</u> ১. শিক্ষায় ইন্টারনেট-২টি পাঠ ২. ওয়েব ব্রাউজার ব্যবহার করে শিক্ষা সংশ্লিস্ট তথ্য অনুসন্ধান -১৪টি পাঠ **মোট পাঠ: ১৬টি**	<u>শিক্ষা ও দৈনন্দিন জীবনে ইন্টারনেটের ব্যবহার</u> ১. শিক্ষা ও দৈনন্দিন জীবনে ইন্টারনেটের ব্যবহার ২. শিক্ষা জীবনে ইন্টারনেটের প্রভাব ৩. দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানে ইন্টারনেটের ভূমিকা ৪. ইমেইল-১৩টি পাঠ **মোট পাঠ: ১৬টি**
মোট পাঠ:	৭০	৭০	৬৯
মোট পৃষ্ঠা:	৬৮	৭২	৭৬

পাঠ বিভাজন ঃ নবম-দশম শ্রেণি

অধ্যায়	পাঠ
প্রথম	**তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং আমাদের বাংলাদেশ** ১. একুশ শতক এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ২. তথ্য ও যোগাযোগের প্রযুক্তি বিকাশে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব (মার্কনি ও জগদীশ চন্দ্র বসু, চার্লস ব্যাবেজ, অ্যাডা বায়রন, রে স্যামুয়েল টমলিন, স্যার টিমোথি জন বার্নাস লি, স্টীভ জবস, বিল গেঁস, মার্ক জুকারবার্গ) ৩. ই-লার্নিং ও বাংলাদেশ ৪. ই-গভর্ন্যান্স ও বাংলাদেশ ৫. ই-সার্ভিস ও বাংলাদেশ ৬. ই-কমার্স ও বাংলাদেশ ৭. বাংলাদেশের কর্মক্ষেত্রে আইসিটি ৮. সামাজিক যোগাযোগ ও আইসিটি ৯. বিনোদন ও আইসিটি ১০. ডিজিটাল বাংলাদেশ **মোট পাঠ: ১০টি মোট পৃষ্ঠা: ১৫**
দ্বিতীয় অধ্যায়	**কম্পিউটারের নিরাপত্তা ও ব্যবহারকারীর নিরাপত্তা** ১. কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণে সফটওয়্যারের গুরুত্ব ২. সফটওয়্যার ইনস্টলেশন ও আনইনস্টলেশন ৩. সফটওয়্যার ডিলিট ৪. নিজের কম্পিউটারের নিরাপত্তা (কম্পিউটার ভাইরাস ও এন্টিভাইরাস, পাসওয়ার্ড) ৫. ওয়েবে নিরাপদ থাকা (ক. সাধারণ সাইট, খ. সামাজিক সাইট গ. বয়সোপযোগী সাইট) ৬. কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারে আসক্তি ৭. কম্পিউটার গেমে আসক্তি ৮. সামাজিক নেটওয়ার্কে আসক্তি ৯. যোগাযোগ সাইট ১০. আসক্তি থেকে মুক্ত থাকার উপায় ১১. পাইরেসি ১২. কপিরাইট আইনের প্রয়োজনীয়তা ১৩. তথ্য অধিকার ও নিরাপত্তা ১৪. সাধারণ ট্রাবল শ্যুটিং **মোট পাঠ: ২০টি মোট পৃষ্ঠা: ২৮**
তৃতীয় অধ্যায়	**আমার শিক্ষায় ইন্টারনেট** ১. ডিজিটাল কনটেন্ট ২. ডিজিটাল কনটেন্ট-এর প্রকারভেদ ৩. ই-বুক, ই-বুক ব্যবহারের সুবিধা, বিভিন্ন প্রকার ই-বুক ৪. শিক্ষায় ইন্টারনেট ৫. ইন্টারনেট ও আমার পাঠ্য বিষয়গুলো ৬. আমার ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার ও আইসিটি **মোট পাঠ: ২০টি মোট পৃষ্ঠা: ৮**

অধ্যায়	পাঠ
চতুর্থ অধ্যায়	<u>আমার লেখালেখি ও হিসাব</u> ১. ওয়ার্ড প্রসেসরে আমার লেখার কাজ ২. ওয়ার্ড প্রসেসরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ৩. ওয়ার্ড প্রসেসর ব্যবহারের কৌশল ৪. স্প্রেডসিট ও আমার হিসাব নিকাশ ৫. স্প্রেডশিটের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ ৬. স্প্রেডশিটের বৈশিষ্ট্যসমূহ ৭. স্প্রেডশিট ব্যবহারের কৌশল (গুণ করা, ভাগ করা, শতকরা নির্ণয় করা) ৮. স্প্রেডশিটের ব্যবহারের ক্ষেত্র **মোট পাঠ: ৩০টি মোট পৃষ্ঠা: ১২**
পঞ্চম অধ্যায়	<u>মাল্টিমিডিয়া ও গ্রাফিক্স</u> ১. মাল্টিমিডিয়ার ধারণা ২. মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমসমূহ ৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার (শিক্ষার উপকরণ হিসাবে, বিনোদন, বিজ্ঞাপন, গেমস, এ্যানিমেশন) ৪. প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যারঃ স্লাইড তৈরি ও উপস্থাপন (পাওয়ার পয়েন্ট প্রোগ্রাম খোলা এবং স্লাইড তৈরি, সেভ করা, নতুন স্লাইড যোগ করা, স্লাইড প্রদর্শন করা, ছবি ও ট্রানজিশন যুক্ত করা, ভিডিও যুক্ত করা) ৫. গ্রাফিক্স এর ধারণা ও গুরুত্ব ৬. গ্রাফিক্স সফটওয়্যার ব্যবহার কৌশলঃ ফটোশপ ও ইলাস্ট্রেটর **মোট পাঠ: ৩৫টি মোট পৃষ্ঠা: ৪৬**
ষষ্ঠ অধ্যায়	<u>ডেটাবেজ-এর ব্যবহার</u> ১. ডেটাবেজ-এর ধারণা ২. ডেটাবেজ প্রোগ্রামের বৈশিষ্ট্য ৩. DBMS এর ব্যবহারের কৌশল ৪. DBMS এর গুরুত্ব ৫. ডেটাবেজ ও এক্সেস প্রোগ্রাম ব্যবহারের কৌশল **মোট পাঠ: ২৫টি মোট পৃষ্ঠা: ১৯**
সর্বমোট পাঠ:১৪০	**মোট পৃষ্ঠা:১২৮**

উৎস: জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ (মাধ্যমিক)।

ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যায় ভিত্তিক বরাদ্দকৃত পিরিয়ড নিম্নরূপ:

অধ্যায়	ষষ্ঠ	সপ্তম	অষ্টম	নবম-দশম
প্রথম অধ্যায়	০৯	০৭	০৮	১০
দ্বিতীয় অধ্যায়	০৮	১৪	০৭	২০
তৃতীয় অধ্যায়	০৮	০৮	১০	২০
চতুর্থ অধ্যায়	২৭	২৫	২২	৩০
পঞ্চম অধ্যায়	১৮	১৬	২৩	৩৫
ষষ্ঠ অধ্যায়	-	-	-	২৫
মোট	**৭০**	**৭০**	**৭০**	**১৪০**

উৎস: জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ (মাধ্যমিক)।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-তে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' বিষয়ের প্রতিটি ক্লাসের জন্য ৫০ মিনিট সময় বরাদ্দ রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। এ জন্য সপ্তাহে দুটো করে পিরিয়ড বরাদ্দ করা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা হাতে–কলমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ পায়।

উল্লেখ্য, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণের কৌশল হিসেবে মাধ্যমিক স্তরে নির্ধারিত বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন ধারা অনুসরণ করে। সর্বস্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে সামাজিক, মানবীয় এবং নৈতিক মূল্যবোধসহ পারিপার্শিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুর প্রতিফলন ঘটে থাকে। জ্ঞান-দক্ষতা অর্জন এবং মানবিক মূল্যবোধকে উজ্জীবিত করে যেন দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে এবং আত্মকর্মসংস্থান ও শ্রমের প্রতি শিক্ষার্থী যেন আগ্রহী হয় এবং শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারে। সে বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করে প্রণীত হয় শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক ।

আইসিটি পরিচিতি ও প্রাত্যহিক জীবনে আইসিটি

আধুনিক সভ্যতা হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত দেশগুলো উন্নয়নের মৌলিক সূচকগুলোতে এক অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। এখন উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোও এর সুফল নিতে সচেষ্ট আছে। গতিশীল ও আধুনিক সমাজব্যবস্থা নির্মাণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের বিকল্প নেই। আমরা প্রাত্যহিক জীবনে নানাভাবে আইসিটি ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু প্রযুক্তির নিয়ত পরিবর্তন ও আপডেট-এর সাথেও আমাদেরকে এগুতে হবে। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির প্রথম অধ্যায়ে তথ্য ও উপাত্তের ধারণা গঠনসহ প্রাত্যহিক জীবনে এ সকল তথ্য ও উপাত্ত প্রাপ্তির উৎস ও এর বিভিন্ন প্রকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ৭ থেকে ১০টি পাঠে আইসিটি'র পরিচিতি ও প্রাত্যহিক জীবনে আইসিটি'র ব্যবহার সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। সরকারি বিভিন্ন সেবা, সংবাদ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অফিসের কার্যাবলি সম্পর্কিত সর্বশেষ বিষয়াদি জানার জন্য পৃথিবীর বৃহত্তম ওয়েব পোর্টাল তথা 'জাতীয় তথ্য বাতায়ন' (www.bangladesh.gov.bd) সম্পর্কে অষ্টম শ্রেণিতে আলোচনা করা হয়েছে। এ পোর্টালের মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন কার্যক্রম ও আপডেট তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে।

এছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণির পাঠে নিম্নে উল্লেখিত প্রাত্যহিক জীবনে আইসিটি'র কয়েকটি ব্যবহারেরও উল্লেখ করা হযেছে:

- ব্যবসায়-বাণিজ্যে আইসিটি'র ব্যবহার
- যোগাযোগ ব্যবস্থায় আইসিটি'র ব্যবহার
- ব্যক্তি মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও রক্ষায় আইসিটি'র ব্যবহার
- কেনাকাটায় বা ই-কমার্সে আইসিটি'র ব্যবহার
- কৃষিতে আইসিটি'র ব্যবহার
- অর্থ ও ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আইসিটি'র ব্যবহার
- বিনোদনে আইসিটি'র ব্যবহার
- নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আইসিটি'র ব্যবহার
- স্বাস্থ্য সুরক্ষায় আইসিটি'র ব্যবহার
- আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানাসহ তৎ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে আইসিটি'র ব্যবহার
- দারিদ্য বিমোচনে আইসিটি'র ব্যবহার
- ব্যবসা-বাণিজ্যে আইসিটি'র ব্যবহার
- তথ্য প্রাপ্তিতে আইসিটি'র ব্যবহার

এ ক্ষেত্রে পরিসর, অনুক্রম, শিক্ষাক্রমের অনুভূমিক ও উল্লম্ব বিন্যাস এবং শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন মডেল বিশেষত 'সর্পিল মডেল' অনুসৃত হয়েছে।

মাল্টিমিডিয়া ও আইসিটি

Tony Feldman (1994) মাল্টিমিডিয়া সম্পর্কে বলেন "Multimedia is the seamless integration of data, text, images of all kinds and sound within a single, digital information environment." (পৃষ্ঠা: ৪)। Ranjan Parekh (2013) মাল্টিমিডিয়ার কতিপয় উপাদানের উল্লেখ করেছেন। এ গুলো হচ্ছে :

উপাদান	উদাহরণ
১. লেখা (Text)	বইয়ের অধ্যায়, পত্রিকার নিবন্ধ
২. ছবি (Image)	কোন কিছুর চিত্র
৩. গ্রাফিক্স (Graphics)	নক্সা, ডায়াগ্রাম
৪. শব্দ (Sound)	গান, আবৃত্তি, বক্তৃতা
৫. ভিডিও (Video)	টিভি অনুষ্ঠান, মুভি
৬. এনিমেশন (Animation)	মিনা কার্টুন, নিমো

সুতরাং, মাল্টিমিডিয়া এমন একটি মাধ্যম যাতে বিভিন্ন ধরনের তথ্যকে (যেমন: লিপি, শব্দ, চিত্র, এনিমেশন, ভিডিও প্রভৃতি) একত্রে দর্শক/ব্যবহারকারীদের কাছে উপস্থাপন করা হয়। মাল্টিমিডিয়া দিয়ে ইলেকট্রনিক মাধ্যমকেও বোঝানো হতে পারে যেটির মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়া সম্পর্কিত তথ্য ধারণ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা হয়। শিল্পকলার মিশ্র শিল্পের সাথে মাল্টিমিডিয়ার অনেক মিল রয়েছে। "রিচ মিডিয়া" বা স্বয়ংসম্পূর্ণ মিডিয়া ইন্টারঅ্যাকটিভ মাল্টিমিডিয়ার আরেক নাম। মাল্টিমিডিয়া বলতে আসলে কম্পিউটারের তথ্যকে অডিও, গ্রাফিক্স, ছবি, ভিডিও ও এনিমেশন এবং এর সাথে লেখাও যুক্ত রেখে প্রকাশ করাকে বোঝায়।

মাল্টিমিডিয়াকে দু'টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়: রৈখিক ও অ-রৈখিক। যে বিষয়গুলো কোনো দিকনির্দেশনা ছাড়াই দর্শক দেখতে পারে সেগুলোকে রৈখিক মাল্টিমিডিয়া বলে। যেমন: চলচ্চিত্র। আর যে বিষয়গুলো ব্যবহারকারীকে দিক-নির্দেশনার সুযোগ দেয়। যার ফলে ব্যবহারকারী নিজ পছন্দের বিষয় ব্যবহার করতে পারেন তাকে অ-রৈখিক বা হাইপারমিডিয়া বলে। যেমন: কম্পিউটার গেমস, কম্পিউটার ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রভৃতি। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিতে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন আলোচনা বা কন্টেন্ট নেই। নবম-দশম শ্রেণিতে ৪৬ পৃষ্ঠা ব্যাপি ৩৫টি পাঠে মাল্টিমিডিয়া বিষয়ের পাঠ অন্তর্ভূক্ত আছে। এতে মাল্টিমিডিয়ার ধারণা, মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমসমূহ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার ইত্যাদির সাধারণ আলোচনা আছে। এছাড়া, প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার হিসাবে পাওয়ার পয়েন্টের সাহায্যে বিভিন্ন কাজ করা এবং গ্রাফিক্স সফটওয়্যার হিসাবে ফটোশপ ও ইলাস্ট্রেটর-এর বিভিন্ন ফিচার আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়ের পরিব্যাপ্তির প্রেক্ষিতে উক্ত তিনটি নতুন সফটওয়্যার সম্পর্কিত আলোচনা যথার্থ হয়েছে এবং পরিসর নির্ণয়ের নিয়মাবলী অনুসৃত হয়েছে। তবে একই শ্রেণিতে এতগুলো বিষয় না রেখে কয়েক শ্রেণিতে বিস্তৃত করা শ্রেয় ছিল।

নেটওয়ার্কিং ও আইসিটি

নেটওয়ার্ক শব্দের অর্থ জালের মত বিস্তার করা। নেটওয়ার্ক সম্পর্কে Roza (২০০৮) বলেন, "Networking is the process of making and maintaining connections. These connections can help you in many ways." Miriam-Webster ডিকশনারিতে নেটওয়ার্ক সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> *Networking-the exchange of information or services among individuals, groups, or institutions; specifically, the cultivation of productive relationships for employment or business.*

মূলত: নেটওয়ার্ক হচ্ছে নির্ভরশীল মানুষ বা রিসোর্স যা জীবনকে সহজ ও উৎপাদনশীল করে। নেটওয়ার্কিং একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। এর যথাযথ ব্যবহারের ফলে মানুষ লক্ষ্যমুখী হয়। তবে, নেটওয়ার্কিং-এর মাধ্যমে সফলতার জন্য লক্ষ্য অনুযায়ী কাজ নির্দিষ্ট করে নিতে হবে এবং বাস্তবায়িত কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে সজাগ থেকে ব্যক্তিক ও সামস্টিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। পরিবার ও বন্ধু বা স্থাপিত নেটওয়ার্ক গোষ্ঠীগুলোর সাথে সম্পর্ক গভীর করতে হবে।

কোনো নির্দিষ্ট কাজের জন্য কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক উভয় পরিমন্ডলে নেটওয়ার্ক স্থাপন করা যেতে পারে। এ জন্য বিভিন্ন আইসিটি টুল্‌স ব্যবহার করা যায়। বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নেটওয়ার্ক স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কোনো গ্রুপ বা ফোরামে যুক্ত হয়ে নেটওয়ার্ক স্থাপন ও তা বর্ধিত করণের সুযোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

অষ্টম শ্রেণির দ্বিতীয় অধ্যায়ে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সম্পর্কিত ৭টি পাঠ রয়েছে। এতে নেটওয়ার্ক টপোলজি, নেটওয়ার্ক সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা আছে। ষষ্ঠ শ্রেণির ৫ম অধ্যায়ে 'ইন্টারনেট সংযোগ ও নেটওয়ার্ক-নেটওয়ার্ক খেলা' নামে ২টি পাঠ রয়েছে। এছাড়া, প্রত্যেক শ্রেণিতে ইন্টারনেট ও এর বিবিধ ব্যবহার সংক্রান্ত কয়েকটি পাঠ আছে যা শিক্ষার্থীকে নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেট সংযোগ সম্পর্কে ধারণা লাভে সাহায্য করবে। সার্বিক বিচারে এ সম্পর্কে আরো আলোচনা থাকা দরকার ছিল।

৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত আইসিটি বিষয়টি ৫টি অধ্যায়ে সাজানো হয়েছে। আবার ৯ম শ্রেণিতে ৬টি অধ্যায় আছে। শিক্ষাক্রমের অনুভূমিক ও উল্লম্ব বিন্যাস অনুযায়ী প্রতিটি পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু, পৃষ্ঠা, ইলাস্ট্রেশন ইত্যাদি বিন্যস্ত হয়েছে। বিষয়বস্তু সন্নিবেশের বেলায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায় পাঠে বিভক্ত হওয়ার কারণে শিক্ষকদের পাঠদান করা সহজ হয়েছে। বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট উদাহরণ জীবনঘনিষ্ঠ করে দেয়া হয়েছে। সহজ এবং সাবলীলভাবে বিষয়বস্তু তুলে ধরা হয়েছে, ফলে শিক্ষার্থীরা আইসিটি পড়তে একদিকে যেমন আগ্রহী হবে অন্যদিকে তাদের নৈতিক দিকটিও অত্যন্ত ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবর্তিত হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। একুশ শতকের শিক্ষার্থীদের চাহিদা, দক্ষতা, চ্যালেঞ্জ বিবেচনা করে ৬ষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণি পর্যন্ত আইসিটি বিষয়ের বিষয়বস্তু সাজানো হয়েছে।

প্রতিটি শ্রেণিতে গড়ে ৭০ টি করে (অষ্টম শ্রেণিতে ১টি কম) পাঠ রয়েছে। সে বিচারে প্রতি সপ্তাহে গড়ে ২টি করে পিরিয়ড হলে ৩৫ সপ্তাহে পুরো পাঠ্য বই শেষ করা যাবে। তবে, জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-এর ২৯ পৃষ্ঠায় "বিষয়টি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে যা প্রয়োজন" শিরোনামে উল্লেখিত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কম্পিউটারসহ আইসিটি ল্যাব সুবিধা, ইন্টারনেট সংযোগ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ও ল্যাব সহকারীর ব্যবস্থা ছাড়া শিক্ষাক্রমের যথার্থ বাস্তবায়ন দুরূহ হবে।

সার্বিক বিচারে দেখা যায় যে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' বিষয়টিতে Marsh ও অন্যান্যদের উল্লেখিত পরিসর নির্বাচনের রীতিসমূহ অনুসৃত হয়েছে বলে লক্ষ্য করা যায়।

প্রশ্নাবলি

১. মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' বিষয়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করুন।
২. মাধ্যমিক পর্যায়ে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যেসমূহ লিখুন।
৩. প্রান্তিক শিখনফল কী? অষ্টম শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থীরা আইসিটিতে কী শিখবে?
৪. পাঠ পরিসর কী? পাঠ পরিসরের প্রয়োজনীয়তা লিখুন।
৫. ষষ্ঠ শ্রেণির 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' বিষয়েরএকটি পাঠ পরিসর প্রস্তুত করে বিশ্লেষণ করুন ।
৬. শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্যের আলোকে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' বিষয়ের সকল শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্ত পাঠ্যসূচির যৌক্তিকতা পর্যালোচনা করুন।
৭. ষষ্ঠ হতে নবম-দশম শ্রেণির যেকোন একটি পাঠের উপর ভিত্তি করে উদ্দীপকসহ একটি সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন করুন।

তথ্যসূত্র

কাজী হারুন-অর-রশীদ মিরন. (১০ জুলাই ২০১৫). *সমাজ উন্নয়নে তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তির ব্যবহার*. যায়যায়দিন।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২(মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ বিস্তরণ শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, কারিকুলাম ডেভলপমেন্ট ইউনিট, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ষষ্ঠ-দশম শ্রেণি), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

Benton, L. (2008). *Focused Networking: The Eight Principles of 21st Century Marketing Authorhouse*, Bloomington, Indiana.

Delors, J., et al. (1996). *Learning: The Treasure Within.* Paris: UNESCO.

Geraldine O'Neill. (2010, January 14). *Programme Design & Assessment: Coherence, Sequence and Integration in a Programme.* Retrieved from University College Dublin, Ireland.: Accessed on 15 June 2018: http://www.ucd.ie/t4cms/UCDTLP0065.pdf.

Henson, Kenneth. T. (2015). *Curriculum Planning: Integrating Multiculturalism, Constructivism, and Education Reform-Kenneth T. Henson* (5th ed.). Long Grove: Waveland Press Inc.

Marsh, Colin. J. (1997). *Key Concepts for Understanding Curriculum: Planning, management, and ideology* (5th ed.). Bristol, PA: The Falmer Press, Taylor & Francis Inc.

M. Ediger & Bhaskara Rao. (2003). *Elementary Curriculum* (1st ed.). Discovery Publishing House. New Delhi.

Ramey, K. (2012, November 25). *10 USES OF TECHNOLOGY IN OUR DAILY LIFE*. Retrieved November 11, 2017, from USE OF TECHNOLOGY: https:// www.useoftechnology. com/technology-today-tomorrow/.

Ranjan Parekh. (2013). *Principles of Multimedia* (2nd ed.). Tata McGraw-Hill. New Delhi.

Reyes, F. (2000). *Engineering the curriculum. A guide for educators and school managers*. Manila : De La Salle University Press, Inc.

Roza, Grez. (2008). *Great networking skills*, The Rosen Publishing Group, Inc. New York.

Tony Feldman. (1994). *Multimedia* (1st ed.). Bluprint. London.

ইউনিট ৩ : ফলপ্রসূ আইসিটি শিখন-শেখানো কার্যক্রমের পরিকল্পনা

আলোচিত বিষয়বস্তুসমূহ :

৩.১ ICT বিষয়ের শিখনফল ও ICT পাঠ্যপুস্তকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা

৩.২ ICT তে শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনার বিবেচ্য দিকসমূহ-

- আন্তর্জাতিক শিক্ষাক্রম দলিল ও গবেষণাপত্রের খবরাখবর এবং
- শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য

  এবং ICT এর জন্য একটি পরিকল্পনা কাঠামো

ইউনিট ৩

ফলপ্রসূ আইসিটি শিখন-শেখানো কার্যক্রমের পরিকল্পনা

শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-নির্ভর উপকরণ ব্যবহারের ফলে শিখন-শেখানো কার্যক্রম হয়ে উঠেছে অত্যন্ত কার্যকর, আকর্ষণীয় ও বৈশ্বিক। এতে একদিকে যেমন শিখন কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি তাদের চাহিদায় সাড়া দিতে গিয়ে শিক্ষকের ভূমিকারও অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটেছে। তাছাড়া কর্মপদ্ধতি, শ্রমবাজার ও যোগাযোগ জগতে এক নাটকীয় পরিবর্তন এনেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। ফলশ্রুতিতে আধুনিক বিশ্ব নতুন নতুন দক্ষতার কিংবা দক্ষতার নবায়নের প্রয়োজন বোধ করছে। কিন্তু আমাদের বর্তমান প্রজন্মের এ দক্ষতা অর্জনের সুযোগ প্রচলিত শিক্ষাক্রমে একেবারেই অপ্রতুল। যার প্রভাবে প্রযুক্তি ব্যবহারজনিত বৈষম্য (ডিজিটাল ডিভাইড), সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য, বেকারত্ব, দারিদ্র্য ইত্যাদি সমস্যাগুলো অদুর ভবিষ্যতে আরো প্রকট হয়ে দেখা দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মানব সম্পদ উন্নয়ন ও জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের এক কার্যকর মাধ্যম। নিঃসন্দেহে এটি একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ। এই চ্যালেঞ্জের অংশ হিসেবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাক্রমে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' বিষয়টি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ে এ বিষয়টি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে প্রবর্তনের মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপকরণ ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি, দক্ষতার বিকাশ এবং পরবর্তীতে উচ্চশিক্ষা লাভের ভিত নির্মাণের মাধ্যমে দক্ষ ও উৎপাদনশীল জনসম্পদ সৃষ্টি করা। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রণীত শিক্ষাক্রমে তাত্ত্বিক আলোচনার তুলনায় প্রায়োগিক দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে। আশা করা যায়, এর মাধ্যমে প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ ও উৎপাদনশীল জনসম্পদ তৈরি হবে, যা বাংলাদেশকে দ্রুত একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে সহায়তা করবে।

৩.১ ICT বিষয়ের শিখনফল ওICT পাঠ্যপুস্তকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা

৩.১.১ শিখনফল

আইসিটি বিষয়ের শিখনফল আলোচনার পূর্বে শিখনফল কী এবং কীভাবে শিখনফল লিখতে হয় তা কিছুটা আলোকপাত করা যাক। শাব্দিকভাবে শিখনফল হলো শিখন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অর্জিত ফলাফল।

Spady, William G. (1994) শিখনফল সম্পর্কে বলেন:

> *"... ... ... (Learning outcomes) are the learningresults we desire from students that lead to culminating demonstrations. ... ... This also means that outcomes are not simply the things students believe, feel, remember, know, or understand these and other similar things are all internal mental processes, rather than clear demonstrations of learning. Instead, outcomes arewhat students actually can do with what they know and understand."* (পৃষ্ঠা. ৩৯)

শিখনফল একটি উক্তি যা শিক্ষার্থীরা পাঠ চলাকালীন সময়ে শিখন অভিজ্ঞতার ফলে লাভ করবে। একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে পাঠ পরিচালনার ফলে শিক্ষার্থীরা কিছু পারদর্শিতা অর্জন করে। এর অর্থ হচ্ছে শিক্ষার্থীরা পাঠ শেষে কিছু দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারবে। যেমন: কোনো পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা হয়তো কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশের নাম বলতে ও সনাক্ত করতে পারছে। প্রতিটি পাঠ শেষেই এমনিভাবে শিক্ষার্থীরা কিছু না কিছু করতে পারে। পাঠের মাধ্যমে এরকম কিছু করতে পারাই হলো শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা। একটি পাঠ শেষে শিক্ষার্থীদের অর্জিত পারদর্শিতাগুলোই হলো ঐ পাঠের শিখনফল। অন্যভাবে বললে একটি নির্দিষ্ট পাঠের মাধ্যমে শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদেরকে যে পারদর্শিতাগুলো অর্জনে সহায়তা করে থাকেন তাই শিখনফল। Spady (1994)-এর মতে শিখনফলের মাধ্যমে শিক্ষার্থী সমস্যা সমাধান দক্ষতা, পরিকল্পনার দক্ষতা, সৃজনশীলতার দক্ষতা, চিন্তাশীল লার্নারের দক্ষতা ইত্যাদি প্রত্যাশিত দক্ষতাসমূহ অর্জিত হবে।

৩.১.২ শিখনফল লেখার কৌশল

শিখনফল নির্ধারণের জন্য প্রথমেই একজন শিক্ষককে একটি পাঠের বিষয়বস্তুর পরিধি নির্ধারণ করে নিতে হয়। এরপর পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু থেকে শিক্ষার্থীরা যে এক বা একাধিক পারদর্শিতা অর্জন করবে সে অংশগুলো পৃথকভাবে চিহ্নিত করে নিতে হবে। এই চিহ্নিত পারদর্শিতাগুলোকে শিক্ষার্থীরা কিছু করে দেখাতে পারবে এমন আচরণিক ভাষায় লিখতে হবে। যেমন:

বলতে পারবে, লিখতে পারবে, বর্ণনা করতে পারবে, চিহ্নিত করতে পারবে, চিত্র অঙ্কন করতে পারবে, বিশ্লেষণ করতে পারবে ইত্যাদি। শিখনফলের ভাষায় এমন কিছু লেখা যাবে না যা শিক্ষার্থীরা করে দেখাতে পারবে না অর্থাৎ তারা তাদের আচরণের দ্বারা তা প্রকাশ করতে পারবে না। যেমন: জানতে পারবে, ধারনা লাভ করবে/ অনুধাবন করবে, শিখতে পারবে ইত্যাদি শব্দগুলো শিখনফলে লেখা যাবে না। কারণ, এই শব্দগুলো পর্যবেক্ষণযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য নয়। শিক্ষার্থীরা কিছু করে দেখাতে পারবে বা বোঝা যায় এমন শব্দগুলোই আমরা শিখনফল লিখতে ব্যবহার করব।

৩.১.৩ শিখনফল লেখার ক্ষেত্রে বিবেচ্যদিকসমূহ

১. আমরা পাঠ্যপুস্তকের নির্ধারিত পাঠ অনুযায়ী শিখনফল লিখব। অর্থাৎ পাঠ সংশ্লিষ্ট নয় এমন কিছু শিখনফলে লেখা যাবে না।

২. শিখনফলের ভাষায় ক্রিয়াবাচক শব্দ বা Action Verb ব্যবহার করব। যেমন: "শিক্ষার্থীরা কম্পিউটারে ভাইরাস আক্রমণের কারণসমূহ বর্ণনা করতে পারবে" - এখানে বর্ণনা করতে পারা হলো Action Verb।

৩. একটি শিখনফলে একাধিক পারদর্শিতার কথা লিখব না। যেমন: শিক্ষার্থীরা কম্পিউটারে ভাইরাস আক্রমণের কারণসমূহ বর্ণনা করতে পারবে এবং প্রতিকার উল্লেখ করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে আমরা পৃথক শিখনফল লিখব।

৪. একটি পাঠে একাধিক শিখনফল থাকলে সহজ থেকে কঠিন এই ক্রমে লিখব। অর্থাৎ স্মরণ করা, বুঝতে পারা, প্রয়োগ করা ও উচ্চতর দক্ষতা এই ক্রমে শিখনফল নির্ধারণ করব।

৫. তাছাড়া SMART আইডিয়াটিকে শিখনফল লেখার সময় কাজে লাগাতে পারি।

S – Specific (সুনির্দিষ্ট)

M – Measurable (পরিমাপযোগ্য)

A – Achievable (অর্জনযোগ্য)

R – Realistic (বাস্তবসম্মত)

T – Timebound (নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে থাকা)

শিখনফলের উদাহরণ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-এ অধ্যায় ভিত্তিক শিখনফল, বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো নির্দেশনা, বিশেষ মূল্যায়ন নির্দেশনা ম্যাট্রিক্স আকারে প্রদত্ত হয়েছে। নিম্নে উক্ত শিক্ষাক্রম ম্যাট্রিক্স থেকে কয়েকটি শিখনফলের উদাহরণ প্রদান করা হলো:

শ্রেণি	অধ্যায়	বিষয়বস্তু	শিখনফল		
			বুদ্ধিবৃত্তীয়	মনোপেশিজ	আবেগীয়
নবম-দশম	পঞ্চম অধ্যায় : মাল্টিমিডিয়া ও গ্রাফিক্স	প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার-এর গুরুত্ব, স্লাইড তৈরি ও উপস্থাপন	১. প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার ব্যবহারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৩. প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার ব্যবহারের কৌশল বর্ণনা করতে পারবে।	৪. প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার ব্যবহার করে বিষয় সংশ্লিষ্ট Slide তৈরি ও উপস্থাপন করতে পারবে।	৫. উপস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার ও গ্রাফিক্স সফটওয়্যার ব্যবহারে আগ্রহী হবে।
অষ্টম	চতুর্থ অধ্যায়: স্প্রেডশিটের ব্যবহার	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং স্প্রেডশিট • স্প্রেডশিটের ধারণা	১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং স্প্রেডশিট এর মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. স্প্রেডশিট সফটওয়্যার ব্যবহারের ক্ষেত্রচিহ্নিত করতে পারবে।	৫. স্প্রেডশিট সফটওয়্যার ব্যবহার করে গাণিতিক কাজ সম্পাদন করতে পারবে।	৮. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি মিলেমিশে ব্যবহার এবং দক্ষতা অর্জনে

শ্রেণি	অধ্যায়	বিষয়বস্তু	শিখনফল		
			বুদ্ধিবৃত্তীয়	মনোপেশিজ	আবেগীয়
		• তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং স্প্রেডশিট এর মধ্যে সম্পর্ক • স্প্রেডশিট সফটওয়্যার ব্যবহারের উদ্দেশ্য • স্প্রেডশিট সফটওয়্যার ব্যবহারের কৌশল • স্প্রেডশিট সফটওয়্যার ব্যবহারের ক্ষেত্র ○ গাণিতিক কাজ ○ বার ডায়াগ্রাম	৩. স্প্রেডশিট সফটওয়্যার ব্যবহারের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. স্প্রেডশিট সফটওয়্যার ব্যবহারের কৌশল বর্ণনা করতে পারবে।	৬. স্প্রেডশিট সফটওয়্যার ব্যবহার করে বার ডায়াগ্রাম তৈরি করতে পারবে। ৭. স্বাস্থ্যঝুঁকি এড়িয়ে নিরাপদে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারবে।	পরস্পরকে সহায়তা করতে আগ্রহী হবে। ৯. দলগত কাজে- • সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী হবে। • সহপাঠীদের মতামত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করবে। • নেতৃত্ব প্রদানে উৎসাহ প্রকাশ করবে।

উৎস: জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ (মাধ্যমিক)।

শিখনফল লিখনে ক্রিয়ার ব্যবহার

শিখনফল লিখনে সক্রিয় ক্রিয়া (Action verb) ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে ১৯৫৬ সালে বেঞ্জামিন ব্লুম প্রণীত জ্ঞানগত ডোমেনের পরিমার্জিত রূপ ব্যবহৃত হচ্ছে। পরবর্তীতে Anderson ও Krathwohl ব্লুমের ডোমেনের পরিমার্জন করেন। এ পরিমার্জনের ফলে জ্ঞানের উপ-স্তরের ক্রমে পরিবর্তন ঘটে এবং ধারণাগত সংশোধনও হয়। পরিমার্জন অনুযায়ী Knowledge-এর পরিবর্তে Remember, Comprehension -এর পরিবর্তে Understand, Application-এর পরিবর্তে Apply, Analysis-এর পরিবর্তে Analyse করা হয়। ৫ম অবস্থানের Synthesis-এর পরিবর্তে Create করা হয় এবং একে ৬ষ্ঠ অবস্থানে স্থাপন করা হয়। আর ৬ষ্ঠ অবস্থানের Evaluation-কে Evaluate করে ৫ম অবস্থান প্রদান করা হয়। নিম্নে Anderson ও Krathwohl কর্তৃক পরিমার্জিত সক্রিয় ক্রিয়াসমূহের (Action verb) একটি তালিকা প্রদত্ত হলো:

Definitions	I. Remembering	II.Understanding	III.Applying	IV.Analyzing	V.Evaluating	VI.Creating
Bloom's Definition	Exhibit Memory of previously learned material by recalling facts, terms, basic concepts, and answers.	Demonstrate Understanding of facts and ideas by organizing, comparing, translating, interpreting, giving descriptions, and stating main ideas.	Solve Problems to new situations by applying acquired knowledg, facts, techniques and rules in a different way.	Examine and break in formation into parts by identifying motives or causes. Make Inferences and find evidence to support generalizations.	Present and defend opinions by making judgments about information, validity of ideas, or quality of work based on a set of criteria.	Compile Information together in a different way by combining elements in a new pattern or proposing alternative solutions.
Verbs	Choose Define Find	Classify Compare Contras	Apply Build Choose	Analyze Assume Categorize	Agree Appraise Assess Award	Adapt Build Change Choose

Definitions	I. Remembering	II.Understanding	III.Applying	IV.Analyzing	V.Evaluating	VI.Creating
	How Label List Match Name Omit Recall Relate Select Sho Spell Tell What When Where Which Who Why	Demonstrate Explain Extend Illustrate Infer Interpret Outline Relate Rephrase Show Summarize Translate	Construct Develop Experiment with Identify Interview Makeuseof Model Organize Plan Select Solve Utilize	Classify Compare Conclusion Contrast Discover Dissect Distinguish Divide Examin Function Inference Inspect List Motive Relationships Simplify Survey Takepartin TestforTheme	Choose Compare Conclude Criteria Criticize Decide Deduct Defend Determine Disprove Estimate Evaluate Explain Importance Influence Interpret Judge Justify Mark Measure Opinion Perceive Prioritize Prove Rate Recommend Ruleon Select Suppor	Combine Compile Compose Construct Create Delete Design Develop Discuss Elaborate Estimate Formulate Happen Imagine Improve Invent Makeup Maximize Minimize Modify Original Originate Plan Predict Propose Solution Solve Suppose Test Theory

*Adopter from:*Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001).

৩.১.৫ ICT পাঠ্যপুস্তকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা

শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠ্যবইয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনো স্তরের শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশ, সৃজনশীলতা, অনুসন্ধিৎসা ও মেধার উন্নয়নে পাঠ্যবইয়ের প্রয়োজনীয়তা অসীম। একজন শিক্ষার্থীর জীবনের লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য পাঠ্যবই তার মনের চিন্তাধারাকে সুগঠিত করে এবং একই সাথে তার মনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলে। মূলত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিকে ধারণ করে পাঠ্যবই। সমগ্র বিশ্বের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদানের সর্বাধিক পরিচিত মাধ্যম পাঠ্যবই। আজও তা যেমন আছে আগামী দিনেও তেমনি থাকবে।

UNESCO-এর পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন সংক্রান্ত গাইডলাইন বিষয়ক বুকলেট *Textbooks and learning resources: Guidelines for developers and users*-এ পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে বলা হয়েছে:

> *Learning resource that pulls together the content of learning intended for a specific level and learning area in a systematic way in support of a curriculum. Traditional textbooks are printed, bound and distributed for use as the main resource for teaching and learning in the majority of the world's educational systems.* (পৃ. ২৬)

গাইডলাইনের তৃতীয় অংশে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে তিনটি প্রধান মূলনীতি অনুসরণের উল্লেখ আছে। এগুলো হচ্ছে:

- enhance the quality of education for all learners ;
- promote values, attitudes and skills for learning to live together ;
- enable learners to think and build peace internationally. (পৃ. ১৫)

প্রতিটি মূলনীতিতে ৮টি করে মোট ২৪টি গাইড লাইনের উল্লেখ আছে।

বাংলাদেশের শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড'। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ও শিক্ষার প্রসারে এ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অনন্য। শিক্ষাক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন সাধন, শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে বিশেষ করে আধুনিক মানসম্মত যুগোপযোগী শিক্ষা এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য নৈতিক মূল্যবোধ, সততা, চরিত্র গঠন এবং জনগণ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা ও দেশপ্রেম জাগ্রত করার লক্ষ্যে সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন করেছে। এ নীতিতে উল্লেখ রয়েছে যে, শিক্ষার মূল প্রাণবিন্দু শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক। তাই শিক্ষাক্রম জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটবে এটা যেমন প্রত্যাশিত, তেমনি শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হবে এটাও কাঙ্খিত। যেহেতু একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা দেশের বিরাজমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, দীর্ঘদিনের লালিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের ওপর গড়ে ওঠা বাঞ্ছনীয়। তাই পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থার শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তকে এগুলোর প্রতিফলন সুনিশ্চিত করা হবে। মূলত শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা ও কাঙ্খিত আচরণিক পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি দক্ষ, দেশপ্রেমিক, আত্মনির্ভরশীল, নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন, শ্রমনিষ্ঠ সুনাগরিক জনগোষ্ঠী গড়ে তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য। তাই শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব অপরিসীম।

শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের উপযোগী শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। আর সেই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আলোকেই রচিত হয় পাঠ্যপুস্তক। পুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে লক্ষ রাখা হয় যে প্রকৃত শিক্ষা যেন জীবনঘনিষ্ঠ হয় এবং তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অনুপ্রাণিত করে এবং চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি, অনুসন্ধিৎসা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে সহায়ক হয়। উল্লিখিত বিষয়সমূহকে প্রাধান্য দিয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড নিয়মিতভাবে বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যবইয়ের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-তে প্রতিটি বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য 'লেখক নির্দেশনা' রয়েছে। নিম্নে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য 'লেখক নির্দেশনা' প্রদান করা হলো:

১. লেখককে অবশ্যই শুরুতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষাক্রম দলিলটি ভালোভাবে পাঠ করে এর উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও মর্মার্থ অনুধাবন করতে হবে। বিশেষ করে শিক্ষাক্রমে বর্ণিত শিখনফল, বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো কৌশল, উদাহরণ, মূল্যায়ন ইত্যাদি মৌল বিষয়গুলো ভালোভাবে আয়ত্ত করে নিবেন।

২. লেখককে অবশ্যই পাঠ্যপুস্তক রচনার সময় শিক্ষার্থীদের মানসিক বয়স, শিক্ষা স্তর ও পাঠদানের সুযোগ সুবিধা বিবেচনায় রাখতে হবে।

৩. তাত্ত্বিক ও হাতে কলমে শেখার বিষয়গুলো এমনভাবে বাস্তব উদাহরণ, চিত্র, ছবি, চার্ট ইত্যাদি সমন্বয়ে সহজভাষায় উপস্থাপন করতে হবে যাতে সহজে বোধগম্য ও শিক্ষার্থীবান্ধব হয়। কার্যক্রমগুলো অবশ্যই বিষয়সম্পৃক্ত, অর্থপূর্ণ ও স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪. প্রতিটি পাঠ উপস্থাপনার সময় প্রত্যয়ের সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করার রীতিকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। বরং পাঠ রচনার সময় উদাহরণসহ বর্ণনা দিয়ে এমনভাবে শুরু করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যাতে শিক্ষার্থী বর্ণনার মধ্য দিয়ে অনুসন্ধানমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিষয়ের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

৫. ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব, স্বাস্থ্যঝুঁকি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যন্ত্রপাতির নিরাপদ ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়গুলো পাঠ্যপুস্তকে সঠিকভাবে উপস্থাপনের জন্য লেখক সংবাদপত্র, জার্নাল, প্রকাশিত পুস্তক, নিবন্ধ, প্রতিবেদন, সম্পাদকীয় ইত্যাদির সাহায্য নিতে পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে কপিস্বত্ব আইন মেনে কপি করতে হবে।

৬. বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায় সততা, নৈতিকতা, দেশপ্রেম, ধর্ম নিরপেক্ষতা, পরমত সহিষ্ণুতা, সংবেদনশীলতা ইত্যাদি সামাজিক ও নৈতিক গুণাবলির বিকাশ এবং আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, ঐতিহ্য ওসংস্কৃতির প্রতি অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে।

৭. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের লেখককে অবশ্যই বিদ্যালয় বর্হিভূত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট সুযোগ-সুবিধা যেমন- কম্পিউটার ক্লাব, ল্যাব, মেলা, দক্ষ অতিথি বক্তাকে শ্রেণি কক্ষে আহ্বান, আইসিটি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা, গবেষণা কিংবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভ্রমণ ইত্যাদি ব্যবহারকে উৎসাহ প্রদান করবেন।

৮. তথ্যের রেফারেন্স দেওয়ার প্রচলিত রীতি অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।

৯. লেখক প্রতিটি পাঠ রচনার শুরুতে বক্সে শিখনফল লিখে শুরু করবেন এবং একই শিখনফলের একাধিক পাঠ হতে পারে। খেয়াল রাখতে হবে প্রতিটি পাঠ শেষে নির্দিষ্ট শিখনফলটি যেন অর্জিত হয়।

১০. প্রতিটি পাঠ পাশাপাশি দুটো পৃষ্ঠায় চলতি ভাষায় এনসিটিবি'র বানানরীতি অনুসরণ করে রচনা করতে হবে। টেকনিক্যাল শব্দ ও পরিভাষার ক্ষেত্রে ইংরেজি ব্যবহার করতে পারবেন। এক্ষেত্রে বাংলা ব্যবহারকরলে বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজি ব্যবহার করতে হবে। কোন পাঠের ক্ষেত্রে অধিক অনুশীলনের দরকার হলে অতিরিক্ত পৃষ্ঠা বিবেচনা করা যায়। তবে সে ক্ষেত্রে এটা শিক্ষার্থীর 'নিজে করি' বা 'বাড়ির কাজ' হিসেবে গণ্য হবে।

১১. শিক্ষাক্রমের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি পাঠ ৫০ মিনিটে উপস্থাপনার উপযোগী করে পাঁচটি অধ্যায়ের কাঠামোতে বিন্যস্ত করতে হবে।

১২. পাণ্ডুলিপি : ক. ফন্ট সাইজ ১৪ হতে হবে। খ. লাইন স্পেস ১.৫ হতে হবে। গ. পাণ্ডুলিপির সাইজ ১/৮ ডিসি (২০″-৩০″)/(২২″-৩২″) হবে। ঘ. কন্টেন্ট এরিয়া (৮.৫″×৫.৭৫″)/(৯.৫″×৬.২৫″) হতেহবে।

নবম-দশম শ্রেণির ক্ষেত্রে ১০, ১১ ও ১২ নং দফায় সামান্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এগুলো হচ্ছে:

প্রায়োগিক পাঠের ক্ষেত্রে ২, ৪ বা ৬ পৃষ্ঠায় অনেকগুলি পাঠ অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ফর্মা বিবেচনায় নিয়ে জোড় সংখ্যক পৃষ্ঠায় পাঠগুলো বিন্যস্ত করার অনুরোধ করা হচ্ছে। এছাড়া নবম-দশম শ্রেণির ক্ষেত্রে ফন্ট সাইজ ১২ হতে হবে।

(পৃ. ৪৯ ও ৬০; জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-মাধ্যমিক)

৩.২ ICTতে শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনার বিবেচ্য দিকসমূহ-আন্তর্জাতিক শিক্ষাক্রম দলিল ও গবেষণাপত্রের খবরাখবর এবং শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য এবং ICT এর জন্য একটি পরিকল্পনা কাঠামো

৩.২.১ শিক্ষণ-শিখন পরিকল্পনার বিবেচ্য দিকসমূহ

মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনয়নের জন্য দেশীয় উদ্যোগের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশীয় উদ্যোগগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো- অংশগ্রহণমূলক পাঠদান ও সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি। আর, একুশ শতকের শিক্ষার্থীদের চাহিদা মোকাবেলায় শিখন-শেখানো কার্যক্রমে নতুন সংযোজন মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম। শ্রেণিকক্ষে অন্যান্য উপকরণের পাশাপাশি ল্যাপটপ, প্রজেক্টর ও ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি থাকবে যাতে করে শিক্ষক পাঠদানের সময় অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি বিমূর্ত, কঠিন, দুর্লভ বিষয়গুলো মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের দেখাতে পারেন। যে বিষয়গুলো সাধারণত: শ্রেণি কার্যক্রমে ভিজুয়াল, সিমুলেট এবং এ্যানিমেট করা সম্ভব হয় না সেগুলো শিক্ষক প্রজেক্টর ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের দেখাবেন। তবে, যে কোনো বিষয়ে পাঠদানের বেলায় প্রথমেই খুঁজতে হবে বাস্তব উপকরণ, শিক্ষকের সৃজনশীলতা, বোর্ডের ব্যবহার, দলগত কাজ, একক কাজ ইত্যাদি। ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, স্ক্রিন হলো শিক্ষকের পাঠদানের বিষয়টিকে আরো সহজে, বোধগম্য ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের একটি হাতিয়ার মাত্র যা কখনোই শিক্ষকের বিকল্প নয়।আন্তর্জাতিক উদ্যোগগুলোর অন্যতম হচ্ছে শিক্ষায় আইসিটি সমন্বিতকরণে ইউনেস্কো কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম, আন্তর্জাতিক গবেষণা কার্যক্রম, বিভিন্ন লার্নিং থিওরী ও মডেলসমূহ ও এগুলোর উপযুক্ত ব্যবহার। এগুলোর অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন। নিম্নে এ সংক্রান্ত কতিপয় বিষয় আলোচিত হলো:

বেঞ্জামিন এস. ব্লুম-এর ডোমেন ও ট্রান্সফরমেটিভ লার্নিং মডেল (Transformative Learning Model)

শিখনের উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও শিখন মূল্যায়নের জন্য ১৯৫৬ সালে বেঞ্জামিন এস. ব্লুম প্রবর্তিত লার্নিং ডোমেনসমূহ শিখন-শেখানো কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে আসছে। এ লার্নিং ডোমেনসমূহে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানগত, আবেগিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার বিবরণ উল্লেখ আছে। শ্রেণি শিক্ষক যদি এই তিনটি বিষয়কে সামনে রেখে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করেন তাহলে শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে শিখবে, মূল্যবোধ তৈরি হবে, সৃজনশীল হবে এবং শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে। ডোমেইন বা উপ-ডোমেইন শব্দগুলো সাধারণ শিক্ষকদের দ্বারা অনুধাবন করা এবং প্রয়োগ করা সহজসাধ্য নয়।সহজে এই বিষয়গুলো অনুধাবন ও ব্যবহারের জন্য 3'H-এর সাহায্য নিতে পারা যায়। ১৯৯২ সালে আমেরিকান প্রফেসর David W. Orr প্রথম 3'H ধারণার সূত্রপাত করেন এবং পরে ২০০৮ সালে Yona Sipos, Bryce Battisti এবং Kurt Grimm এক গবেষণা কাজের মাধ্যমে ধারণাটির একটি গ্রহণযোগ্য ও সকলের কাছে বোধগম্য রূপ তোলে ধরেন। তাঁরা এ ধারণাটিকে

ট্রান্সফরমেটিভ লার্নিং মডেল (Transformative Learning Model) হিসেবে অভিহিত করেন। ধারণাটিতে 3'H বলতে Head, Heart এবং Hand-কে বোঝানো হয়েছে এবং এ গুলোকে তিনটি ডোমেনের সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে:

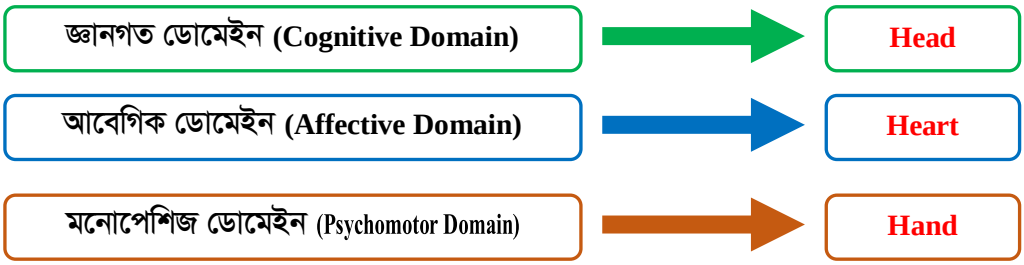

যার প্রথম H মানে Head যা জ্ঞান বা নলেজকে নির্দেশ করে, দ্বিতীয় H মানে Heart যা শিক্ষার্থীর আবেগিক ক্ষেত্র নির্দেশ করে এবং তৃতীয় H মানে Hand যা হাতে-কলমে কাজ করা বুঝায়। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা হৃদয় দিয়ে অনুভব করে, হাতে-কলমে কাজের মধ্য দিয়ে তার জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করবে। কোনো একটি বিষয় যদি শিক্ষার্থীরা জীবন ঘনিষ্ঠ করে হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমে আত্মস্থ করে তাহলে সে বিদ্যা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়। সৃজনশীল পদ্ধতিতে ভালো করার জন্য শিক্ষক পাঠাদানের সময় শিক্ষার্থীর Head, HeartএবংHand এই 3'H কে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা উচিত, তাহলে জ্ঞান-অনুধাবন যেমন হবে আবার সে জ্ঞান নতুন পরিস্থিতিতে কাজে লাগানোর সক্ষমতাও তৈরি হবে। নিম্নে 3'H ধারণাটির চিত্ররূপ প্রদত্ত হলো।

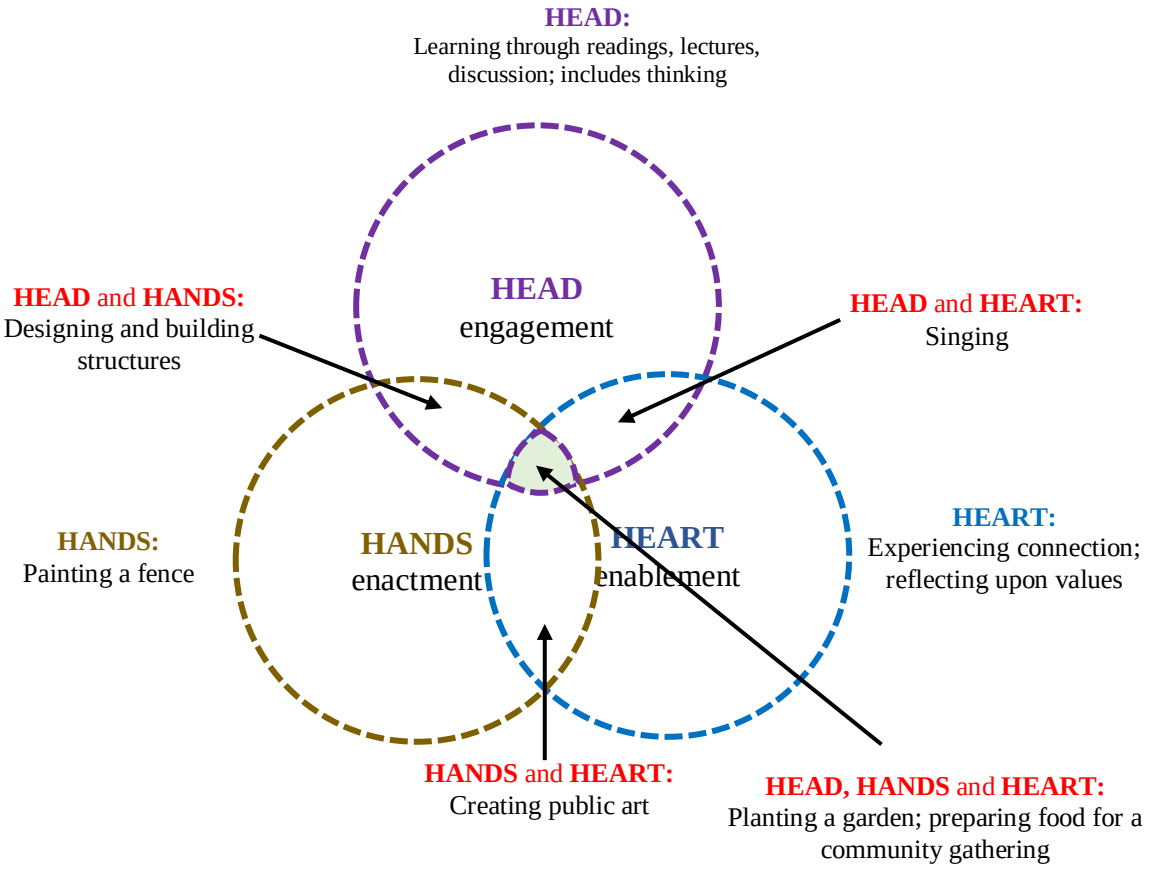

Adopted from: Sipos, Y., Battisti, B., & Grimm, K. (2008).

এডগার ডেল-এর শিখন অভিজ্ঞতার কোণক (Edgar Dale's Cone of Experience)

শিক্ষাবিদ এডগার ডেল (১৯০০–১৮৮৫) আমেরিকার মিনেসোটায় জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯২১ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত তিনি নর্থ ডাকোটার একটি স্কুলের শিক্ষক ও সুপারিনটেন্ডেন্ট হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ইলিনয়েস-এর একটি জুনিয়র হাই স্কুলে তিনি ১৯২৪ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করে ১ বছরের জন্য একটি ইস্টম্যান টিচিং ফিল্ম নামে একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। ১৯২৯ সালে তিনি Ohio State University তে যোগদান করেন এবং অবসরে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত (১৯৭৩ সাল) সেখানে কর্মরত ছিলেন। ১৯৪৬ সালে এডগার ডেল Audiovisual Methods in Teaching নামে তাঁর একটি বইয়ে Cone of Experience এর ধারণার সূত্রপাত করেন। পরবর্তীতে ১৯৫৪ সাল ও ১৯৬৯ সালে মডেলটির পরিমার্জন করা হয়। এডগার ডেল Pestalozzi, Froebel, John Dewey প্রভৃতি শিক্ষা বিজ্ঞানীগণের দর্শন দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ১৯৪৬ সালের ১ম সংস্করণে তিনি ভিজ্যুয়াল লার্নিংকে ১০ টি ক্যাটাগরিতে (1-Verbal Symbols, 2-Visual Symbols, 3-Radio-Recordings-Still Pictures, 4-Motion Pictures, 5-Exhibits, 6-Field Trips, 7-Demonstrations, 8-Dramatic Participation, 9-Contrived Experiences, 10-Direct, Purposeful Experiences) বিভাজন করেন। Seels (১৯৯৭)-এর মতে ১ম সংস্করণে তিনি John Dewey-এর concept of the continuity of learning through experience এর ধারণাটি ব্যবহার করেন। ২য় সংস্করণে তিনি Motion Pictures এর পরে Television অন্তর্ভূক্ত করেন এবং Dramatic Participation এর পরিবর্তে Dramatized Experiences ব্যবহার করেন। এডগার ডেল ৩য় সংস্করণে Television এর পরিবর্তে Educational TV ব্যবহার করেন। Charles E. Baukal, Floyd B. Ausburn, & Lynna J. Ausburn. (2013) এবং Lee, S. J., & Reeves, T. C. (2007). তাঁদের এক গবেষণায় দেখান যে, এডগার ডেল ৩য় সংস্করণে Bruner (১৯৬৬) এর তিন পর্যায়ের শিখন সম্পর্কিত ধারণা দ্বারা ব্যাপকভাবে আলোড়িত হন এবং উক্ত ধারণার পর্যায়গুলো তথা - ACTIVE (হাতে-কলমে শিখন-learning by doing), ICONIC (পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিখন-learning through observation), and SYMBOLIC EXPERIENCE (বিমূর্ত ধারণার মাধ্যমে শিখন-learning through abstraction) ৩য় সংস্করণে প্রকাশিত Cone of Experience এ সমন্বিত করেন। ক্যাটাগরিগুলো নিচ থেকে মূর্ত ধারণার মাধ্যমে বিকশিত হয়ে চূড়ায় বিমূর্ত ধারণার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নে এডগার ডেল-এর ২য় সংস্করণে প্রকাশিত Cone of Experience চিত্র প্রদত্ত হলো:

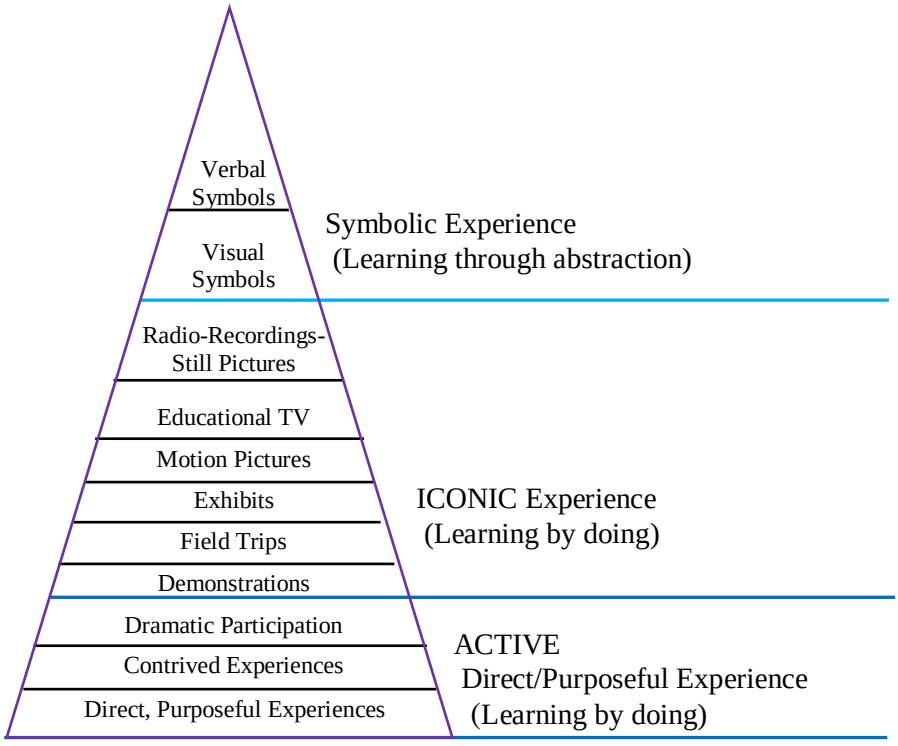

Dale's Cone of Experience (Revised) – adopted from Dale

এডগার ডেল ব্রুনারের শিখন পর্যায়ের ধারণার পাশাপাশি জন ডিউই-এর প্রত্যেক শিশুর ব্যক্তিগত চাহিদা ও সামর্থ্য ইত্যাদি সংক্রান্ত ধারণা সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকারান্তরে অন্যদেরকেও তাঁর Cone of Experience -এ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করার পরোক্ষ অনুমোদন প্রদান করেন বলে ধরে নেওয়া হয় । পরবর্তীতে বিভিন্ন গবেষণার ফলে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বর্তমান মডেলটি পাওয়া যায় । এতে দেখা যায়, কোনো একটি শিখন শুধু পড়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়ার ২ সপ্তাহ পর শিক্ষার্থীরা ১০% স্মরণ করতে পারে, শোনার মাধ্যমে হলে ২০%, দেখার মাধ্যমে হলে ৩০%, একই সাথে দেখা এবং শোনা হলে ৫০%, আলোচনার মাধ্যমে হলে ৭০% পর্যন্ত আয়ত্ব করতে পারে । অপরদিকে বলা এবং করার (দলগত কাজ, একক কাজ, জোড়ায় কাজ, ব্যবহারিক কাজ, বাস্তবে দেখানো ইত্যাদি) মধ্য দিয়ে হলে ৯০% পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা স্মরণ করতে পারে ।এডগার ডেল বিভিন্ন মিডিয়া (Media) ও শিখন অভিজ্ঞতার মাধ্যমগুলো শুধুমাত্র y-অক্ষে স্থাপন করেন এবং মূর্ত থেকে বিমূর্তভাবে শিখনের পরামর্শ দিয়েছেন । তাঁর মডেলটি প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, কর্পোরেট প্রশিক্ষণ এমনকি কাউন্সেলিং-এর কাজেও বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে ।

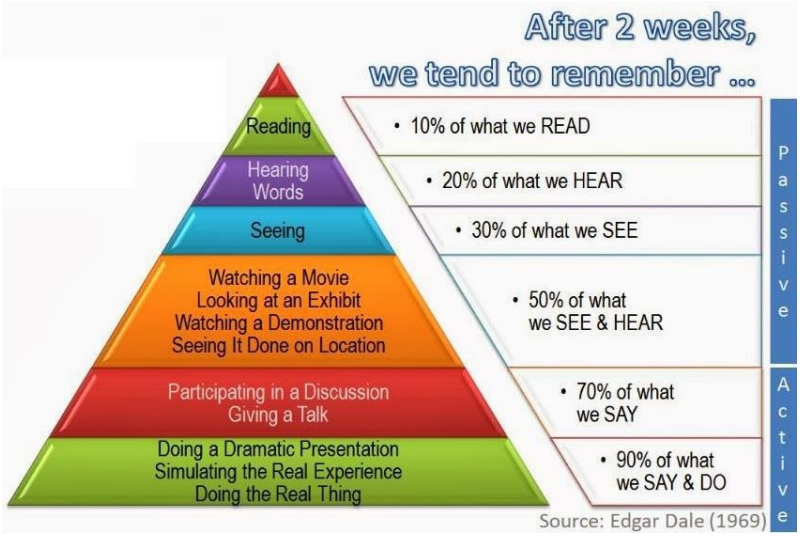

Dale's Cone of Experience (Final Version) – adopted from Dale

ডেল শিখন কার্যে মূর্ত ও বিমূর্ত ধারণার ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহরের উপর জোর দিয়েছেন । তিনি শিখনের ক্ষেত্রে একক কোন মিডিয়া ব্যবহার না করে একাধিক মিডিয়া তথা অডিও-ভিস্যুয়্যাল উপকরণসহ অন্যান্যউপকরণ একইসাথে ব্যবহারের পক্ষপাতী । পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনাকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করেছেন । এ ক্ষেত্রে হাতে-কলমে কাজ করার মাধ্যমে ধারণা গঠন করে শিক্ষার্থীদের শিখন অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধকরণের কথা বলা হয়েছে ।

মডেলটিতে উল্লেখিত শতকরা হারের হিসাব সম্পর্কে বিতর্ক আছে । Dwyer (১৯৭৮)-এর মতে শতকরার বর্তমান হিসাবটি ১৯৬০ সালে Socony-Vacuum Oil Companyএর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ভিত্তিতে তৈরিকৃত । ফলে, পরিমাপের পদ্ধতি, শিক্ষার্থীদের বয়স, শিখন কার্যাবলী, শিখন পদ্ধতি, কন্টেন্ট ইত্যাদি ভেদে বর্ণিত হারে তারতম্য হওয়া স্বাভাবিক । এ প্রসঙ্গে Dwyer বর্ণিত শতকরা হারের সংব্যাখ্যান সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন । সংশয় বা বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব সত্ত্বেও, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ডেল এর এই মডেল শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে উদ্ধৃত করা হচ্ছে ।

উপরের দুটি তত্ত্ব থেকে স্পষ্টভাবে বলা যায়, শিখন কার্যকর এবং স্থায়ী হবে যদি শিখনে তিনটি ডোমেন এর চর্চা হয়, হাতে-কলমে কাজের মধ্য দিয়ে যদি শিক্ষার্থীরা শেখার সুযোগ পায়, শিক্ষার্থীর Head, HeartএবংHand কে যদি সচল রাখা যায় । আমরা যারা শ্রেণি শিক্ষক তারা যদি বক্তব্য পরিহার করে শিক্ষার্থীদের বাস্তবতার স্বাদ নিতে দেই, কাজ করার মধ্য দিয়ে শিখতে দেই, যেখানে যে পরীক্ষণটি করা দরকার তা করতে দেই, 3'H এবং ব্যবহার করি তাহলে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের শিক্ষার্থীরা তৈরি হবে এবং দূর হবে অসম প্রতিযোগিতা ।

শিক্ষায় আইসিটি সমন্বিতকরণে UNESCO এর উদ্যোগ ও ভূমিকা

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) হচ্ছে জাতিসংঘের একটি অঙ্গ সংস্থা। ১৯৪৬ সালের ৪ নভেম্বর এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিশ্ব সংস্থাটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে এর সংবিধানে নিম্নরূপ উল্লেখ আছে:

> *"... ... to contribute to peace and security by promoting collaboration among nations through education, science and culture in order to further universal respect for justice, for the rule of law and for the human rights and fundamental freedoms which are affirmed for the peoples of the world, without distinction of race, sex, language or religion, by the Charter of the United Nations."*
>
> (সূত্র: Home page of http://www.unesco.org)

জাতিসংঘের শিক্ষা সংস্কার ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত কতগুলো বহুল আলোচিত ও সফল উদ্যোগসমূহ হচ্ছে The Millennium Development Goals (MDG), Education for All (EFA), the UN Literacy Decade (UNLD), the Decade of Education for Sustainable Development (DESD)। এ প্রসঙ্গে UNESCO-এর টেকনিক্যাল পেপার *Links between the Global Initiatives in Education*-এ সবিস্তারে বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। এ সকল উদ্যোগের একটি সাধারণ উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের জীবন মানের উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, সুস্বাস্থ্য, মানবাধিকার, পুরুষ-মহিলা নির্বেশেষে সকলের জন্য শিক্ষা।

UNESCO প্রণীত শিক্ষকদের জন্য আইসিটি কম্পিটেন্সি ফ্রেমওয়ার্ক

বিভিন্ন কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় The ICT Competency Framework for Teachers project ফরমুলেশন UNESCO-এর একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। জাতিসংঘের অন্যান্য কর্মসূচির ন্যায় এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের দারিদ্র্য দূরীকরণ, জীবন-মান উন্নয়ন। সে জন্য শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন একটি প্রধান ইস্যু হিসাবে গণ্য করে শিক্ষকদের জন্য আইসিটি ফ্রেম ওয়ার্ক তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ২০০৮ সলে UNESCO তার পার্টনার প্রতিষ্ঠান (CISCO, Intel, ISTE, Microsoft) ও প্রখ্যাত বিষয় বিশেষজ্ঞগণের সাথে ব্যাপক পরামর্শের পর শ্রেণিতে কার্যকরভাবে আইসিটি ব্যবহারের বিষয়ে একটি ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করে। এই ফ্রেমওয়ার্কটি UNESCO ICT-Competency Framework for Teachers (ICT-CFT) নামে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তী সময়ে এর সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন হয় ও তিনটি বুকলেটে এর বিষয়বস্তু প্রকাশিত হয়।

Booklet 1: Policy Framework

এ বুকলেটে ICT-CFT project-এর যৌক্তিকতা, কাঠামো ও এপ্রোচ-এর বিবরণ প্রদান করা হয়।

Booklet 2: Competency Framework Modules

দ্বিতীয় বুকলেটে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ৩টি অভিগমণ (Approach) বিবেচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ অভিগমণসমূহ ২০০৯ সালে ICT-CFT Version 2-তে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। উক্ত অভিগমণসমূহের সফল বাস্তবায়নের জন্যশিক্ষকের ৬টি দৃষ্টিভঙ্গী'র (Aspect) বিপরীতে সর্বমোট ১৮টি মড্যুলে শিক্ষক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়।

Booklet 3: Implementation Guidelines

এ বুকলেটের পরিশিষ্ট-১ এ প্রত্যেক মড্যুলের বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। মড্যুলে বিষয়বস্তুসমূহের সিলেবাস ও পরীক্ষার নমুনার সবিস্তার বিবরণী পরিশিষ্ট-২ এ সন্নিবেশিত করা হয়। তবে, বর্তমানে প্রথম ২টি পর্যায়ের জন্য সিলেবাস ও পরীক্ষার নমুনা প্রদান করা হয়েছে। এ সকল নমুনা উদাহরণ শিক্ষকের জন্য নির্দেশনার সুযোগ তৈরি করেছে।

আইসিটি ফ্রেম ওয়ার্কে ৪টি অধ্যায়, ২টি পরিশিষ্ট, ১টি মুখবন্ধ, ১টি কৃতজ্ঞতা স্বীকার, ১টি সারসংক্ষেপ, ১টি টীকাপুঞ্জ (Glossary) রয়েছে।

এ ফ্রেমওয়ার্কটি নীতি নির্ধারক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণ দাতা সংস্থা, প্রশাসক, শিক্ষা সংস্কারকগণের জন্য একটি গাইড লাইন হিসেবে কাজ করবে।

ফ্রেমওয়ার্কের তিন অভিগমণ (Three approaches of the Framework)

ICT-CFT ফ্রেমওয়ার্কে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ৩টি অভিগমণ (Approach) বিবেচনা করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে:

১. প্রযুক্তি সাক্ষরতা (Technology Literacy)

প্রযুক্তি লিটারেসিতে স্কুল পাঠ্যক্রমের মধ্যে প্রযুক্তি-দক্ষতা একীভূত করে শিক্ষার্থী, নাগরিক ও কর্মী বাহিনী দ্বারা নতুন প্রযুক্তিটি কীভাবে ব্যবহার করা হবে তা বোঝানো হয়েছে। Technology Literacy-এর লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থী, নাগরিক এবং কর্মী বাহিনীকে সামাজিক উন্নয়নের জন্য আইসিটি ব্যবহার এবং অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা উন্নত করতে সক্ষম করে তোলা। Technology Literacy-এরআরো লক্ষ্য হচ্ছে ভর্তি বৃদ্ধি, সকলের জন্য উচ্চমানের রিসোর্স প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, সাক্ষরতা দক্ষতার উন্নয়ন।

২. জ্ঞানের গভীরতা অর্জন (Knowledge Deepening)

জ্ঞানের গভীরতা অর্জন বলতে জটিল ও বাস্তব সমস্যা সমাধানের সামর্থ্যকে বোঝাবে। বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়গুলির বিষয়বস্তুতে এমন সব শিখনের সুযোগ থাকবে যেন শিক্ষার্থী, নাগরিক এবং কর্মীবাহিনী জীবন চলার পথে, কর্মক্ষেত্রে বা সমাজে জটিল ও বাস্তব সমস্যা সমাধানে বিদ্যালয়ে অধীত বিষয়ের জ্ঞান প্রয়োগ করার সামর্থ্য ও দক্ষতা অর্জন করে। এ জাতীয় সমস্যা চেনা বা অচেনা পরিবেশ, খাদ্য নিরাপত্তা বা প্রাত্যহিক জীবনের অন্য যে কোন চলমান সমস্যা হতে পারে। শিক্ষক এ দক্ষতা অর্জন উপযোগী করার জন্য শ্রেণিতে উপযুক্ত কর্মপন্থা নির্ধারণ করে শিক্ষার্থীদেরকে কাজ প্রদান করবেন।

৩. জ্ঞানের সৃষ্টি বা সৃজন (Knowledge Creation)

নতুন উদ্ভাবন, নবতরজ্ঞান বা ধারণা সৃষ্টি এবং উক্ত নতুন জ্ঞান থেকে উপকার প্রাপ্তিতে শিক্ষার্থী, নাগরিক এবং কর্মীদের সামর্থ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা অর্থে জ্ঞানের সৃষ্টি বা সৃজন বোঝাবে। এ ক্ষেত্রে জীবনব্যাপী শিখনের মাধ্যমে দক্ষতা বিকাশ ও উন্নয়নকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এ সকল দক্ষতার কয়েকটি হচ্ছে সমস্যা সমাধান, যোগাযোগ, সহযোগিতা, পরীক্ষণ, সমালোচনামূলক চিন্তা এবং সৃজনশীলতা প্রকাশ। সম্ভবত এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীরা তাদের নিজের শেখার লক্ষ্য এবং পরিকল্পনা তৈরি করতে সক্ষম হবে। এছাড়া নিজেদের সবল ও দুর্বলতাগুলি নির্ণয় করতে পারা, কাজের পরিকল্পনা তৈরি করা, কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকা, নিজের অগ্রগতি মূল্যায়ন করতে পারা, সাফল্য ও ব্যর্থতার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী পরিকল্পনা তৈরি করাও Knowledge Creation-এর অন্যতম লক্ষ্য।

শিক্ষকের কাজের ছয়টি ক্ষেত্র/ দৃষ্টিভঙ্গী (Six aspects of a teacher's work)

ICT-CFT ফ্রেমওয়ার্কে অভিগমণ ৩টিকে শিক্ষকের কাজের ছয়টি দৃষ্টিভঙ্গী'র আওতায় বিন্যস্ত করা হয়েছে।

১. শিক্ষায় আইসিটি'র উপলব্ধি (Understanding ICT in Education)

২. শিক্ষাক্রম ও মূল্যায়ন (Curriculum and Assessment)

৩. শিক্ষাবিজ্ঞান (Pedagogy)

৪. আইসিটি (ICT)

৫. সংগঠন ও প্রশাসন (Organization and Administration)

৬. শিক্ষকের পেশাগত শিখন (Teacher Professional Learning)

নিম্নে Booklet 2তে বর্ণিত ৩টি অভিগমণ ও ৬টি দৃষ্টিভঙ্গীগুচ্ছের বিপরীতে ১৮টি মড্যুলে শিক্ষক যোগ্যতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ একটি ম্যাট্রিক্সে উল্লেখিত হলো :

	TECHNOLOGY LITERACY	KNOWLEDGE DEEPENING	KNOWLEDGE CREATION
UNDERSTANDING ICT IN EDUCATION	Policy awareness	Policy understanding	Policy innovation
CURRICULUM AND ASSESSMENT	Basic knowledge	Knowledge application	Knowledge society skills
PEDAGOGY	Integrate technology	Complex problem solving	Self management
ICT	Basic tools	Complex tools	Pervasive tools
ORGANIZATION AND ADMINISTRATION	Standard classroom	Collaborative groups	Learning organizations
TEACHER PROFESSIONAL LEARNING	Digital literacy	Manage and guide	Teacher as model learner

Adopted from: UNESCO ICT Competency Framework for Teachers (পৃষ্ঠা ৩)

এ প্রসঙ্গে ইউনেস্কোর শিক্ষানীতি (UNESCO's Education Policies) কী তা জানা দরকার। ইউনেস্কোর দৃষ্টিতে শিক্ষা কোনও জাতি বা সম্প্রদায়ের একটি প্রধান কাজ। ইউনেস্কো এবং জাতিসংঘের মতে শিক্ষার মাধ্যমে নিম্নোল্লিখিত লক্ষ্যগুলি অর্জন করা যায়ঃ

- সম্প্রদায়ের মূল মূল্যবোধের বিকাশ এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে অতিক্রম করা।
- শিশু, যুবক এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ব্যক্তিগত উন্নয়ন সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা করা।
- গণতন্ত্রকে উন্নীত করা এবং সমাজে বিশেষ করে নারী ও সংখ্যালঘুদের মধ্যে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।
- বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশ বোঝা এবং দ্বন্দ্বের শান্তিপূর্ণ সমাধান, স্বাস্থ্য এবং মঙ্গলময় উন্নতি উৎসাহিত করা।
- অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমর্থন করা, দারিদ্র্য হ্রাস এবং সমৃদ্ধির ব্যাপক বৃদ্ধি সাধন।

(সংকলিত ঃ *UNESCO ICT Competency Framework fo3 r Teachers,*পৃষ্ঠা ৬)

উল্লেখ্য যে "Education in and for the Information Society" রিপোর্ট-এ UNESCO আইসিটিকে শিক্ষার উন্নতির জন্য সুগভীর প্রভাবক, প্রবৃদ্ধি এবং ক্ষমতায়নের জন্য একটি নিয়ামক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

একুশ শতকের শিক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন (The International Commission on Education for the Twenty-first Century)

১৯৯১ সালের নভেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ইউনেস্কো'র মহাপরিচালককে 'বিংশ শতকের শিক্ষা ও শিখনের প্রতিফলন সম্পর্কে রিপোর্ট তৈরির জন্য আন্তর্জাতিক কমিশন গঠনের আহ্বান জানান। সে প্রেক্ষিতে ১৯৯৩ সালের শুরুতে আনুষ্ঠানিকভাবে "একুশ শতকের শিক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন" গঠিত হয়। তৎকালীন সময়ে ইউনেস্কো'র মহাপরিচালক (Director-General, 1987 – 1999) ছিলেন স্পেনিশ বিজ্ঞানী, পন্ডিত, রাজনীতিবিদ, কুটনীতিক ও কবি Federico Mayor Zaragoza । তিনিJacques Delors এর নেতৃত্বে বিশ্বের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার আরো ১৪ বিশিষ্ট ব্যক্তি সমন্বয়ে এই শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। Jacques Delors ছিলেন ফরাসী রাজনীতিবিদ ও ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৫ সালে European Commission এর প্রেসিডেন্ট। তিনি ১৯৮১ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সের অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। কমিশনের সদস্যগণের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

1. Jacques Delors (France)
2. In'am Al Mufti (Jordan)
3. lsao Amagi (Japan)
4. Roberto Carneiro (Portugal)
5. Fay Chung (Zimbabwe)
6. Bronislaw Geremek (Poland)

7. Aleksandra Kornhauser (Slovenia)
8. Michael Manley (Jamaica)
9. Marisela Padr6n Quero (Venezuela)
10. Marie-AngClique Savank (Senegal)
11. Karan Singh (India)
12. Rodolfo Stavenhagen (Mexico)
13. Studies, El Colegio de Mexico
14. Myong Won Suhr (Republic of Korea)
15. Zhou Nanzhao (China)

কমিশনের কাজগুলো সম্পাদনের জন্য ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে ছয়টি সীমারেখার মধ্যে অনুসন্ধানের বিষয় নির্ধারণ করেন। এগুলো হচ্ছে:

১. শিক্ষা ও সংস্কৃতি (Education and Culture);
২. শিক্ষা ও নাগরিকতা (Education and citizenship);
৩. শিক্ষা ও সামাজিক সংযুক্তি (Education and social cohesion);
৪. শিক্ষা, কর্ম ও চাকুরী (Education and work and employment);
৫. শিক্ষা ও উন্নয়ন (Education anddevelopment);
৬. শিক্ষা, গবেষণা ও বিজ্ঞান (Education andresearch and science).

এই সীমারেখা ছয়টি নিম্নোক্ত তিনটি অনুপ্রস্থ বিষয়ের (Transverse Themes) অধীনে বিবেচনা করে শিক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হয়ঃ

১. যোগাযোগ প্রযুক্তি (Communications Technologies);
২. শিক্ষক ও শিক্ষণ (Teachers and Teaching);
৩. অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনা (Financing and Management);

কমিশন বিভিন্ন দেশ, অঞ্চল ও সম্প্রদায়ের লোক-জন নিয়ে ৮টি পূর্ণাঙ্গ সেশন ও ৮টি ওয়ার্কিং গ্রুপ সেশন পরিচালনা করে। এ সকল সেশনে বিভিন্ন শ্রেণি, পেশা ও সংস্থার প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়। সেশনগুলোতে প্রতিনিধিগণের মধ্যে ছিলেন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে জড়িত শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থী, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এতদ সংক্রান্ত কার্যাবলীর সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ। এছাড়াও কমিশন ব্যাপক পরামর্শ গ্রহণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সুপারিশ প্রণয়ন করে। বিশ্বব্যাপি চরম বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষাগত পরিস্থিতি, ধারণা ও কাঠামো কমিশনকে সুপারিশ প্রণয়নে যথেষ্ট অসুবিধায় ফেলেছিল। একই সাথে কমিশন পূর্ববর্তী বিভিন্ন ডকুমেন্টও বিবেচনায় আনেন। এ গুলোর মধ্যে কয়েকটি হচ্ছেঃ

1. *The World Educational Crisis: A Systems Analysis*, by Philip H. Coombs, then Director ofUNESCO's International Institute for Educational Planning (IIEP), 1968
2. *Learning to Be,* the Faure Commission Report, 1971.

কমিশনের সুপারিশের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

জীবনব্যাপী শেখার ধারণাঃ

একবিংশ শতাব্দীতে সারা জীবনব্যাপী শেখার ধারণাটি একটি প্রধান বিষয় হিসাবে আবির্ভূত হয়। এটি প্রাথাগত ও অব্যাহত শিক্ষার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য তৈরি করেছে।

শিক্ষার চার স্তম্ভঃ

কমিশন জীবনব্যাপী শিখন (Learning throughout Life) ও শিখনের সমাজে অংশগ্রহণ (Society of Learning) এ দু'টি বিষয়কে একুশ শতকের দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এ জন্য একবিংশ শতাব্দীতে সারা জীবনব্যাপী শেখার ধারণাটি একটি প্রধান বিষয় হিসাবে আবির্ভূত হয়। এটি প্রাথাগত ও অব্যাহত শিক্ষা মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য তৈরি করেছে। এ প্রসঙ্গে কমিশন শিক্ষার চারটি স্তম্ভের ধারণার অবতারণা করেন। এ গুলো হচ্ছে:

১. **একত্রে বসবাসের জন্য শিখন** (Learning to live together);

সমাজের অন্যদের সম্পর্কে জানা, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা যেমন: যুগ্মভাবে প্রজেক্ট পরিচালনা, দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনা, পারস্পরিক বোঝাপড়া, শান্তি স্থাপন, নানা গোষ্টীর সাথে চলাফেরা এর অন্তর্ভূক্ত ।

২. **জানার জন্য শিখন** (Learning to know);

কোন ক্ষুদ্র বিষয় সম্পর্কেও গভীর ও বিস্তারিত জ্ঞান অর্জনকে জানার জন্য শিখনকে বোঝানো হচ্ছে । শিখনের জন্য শিখনও এর অন্তর্ভূক্ত ।

৩. **করার জন্য শিখন** (Learning to do);

শুধু বৃত্তিমূলক বিষয়ে দক্ষতা অর্জন ছাড়াও জীবন চলার পথে বিভিন্ন পরিস্থিতি সামাল দেওয়া, দলে কাজ করা ইত্যাদি এর অন্তর্ভূক্ত । তরুণ বা শিক্ষার্থীদের বিবিধ সামাজিক বা অনানুষ্ঠানিক কাজ, কোন কোর্সে অংশগ্রহণ, বিকল্প গবেষণা বা কাজ করার জন্য শিখনের অন্তর্ভূক্ত ।

৪. **হওয়ার জন্য শিখন** (Learning to be);

কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠন, ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারণা গঠন, বিচার্য বিষয় এবং ব্যক্তিগত দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা 'হওয়ার জন্য শিখন'-এর অন্তর্ভূক্ত । শিক্ষা ব্যক্তির কোন সম্ভানা যেমন: স্মৃতি, যুক্তি, নান্দনিকতা, শারীরিক ক্ষমতা এবং যোগাযোগ দক্ষতা ইত্যাদি দিককে উপেক্ষা করে না ।

সঞ্জীবনী কোর্স, পূণ:প্রশিক্ষণ, বয়স্কদের জন্য পূণ: প্রশিক্ষণ বা অগ্রসর প্রশিক্ষণ অয়োজনের মাধ্যমে জীবনব্যাপী শিক্ষা অব্যাহত রাখা যায় । কোন সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা অর্থনৈতিক বিষয়ে অথবা অন্য কোন প্রয়োজনে বিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্টতা রেখে বা পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, শিল্প-কারখানা, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন কর্মকান্ডে নিযুক্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে যৌথভাবে কাজের মাধ্যমে জীবনব্যাপী শিক্ষা চালিয়ে নেওয়া যায় ।

৩.২.২ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি

ইংরেজি কারিকুলাম শব্দটির বাংলা পরিভাষা হিসেবে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যক্রম, পাঠক্রম ইত্যাদি শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে । তবে বাংলাদেশে কারিকুলাম শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে শিক্ষাক্রম ব্যবহার করা হয়েছে । কারিকুলাম কথাটি ল্যাটিন শব্দ Currere থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হলো দৌড়ানো বা ঘোড়দৌড়ের নির্দিষ্ট পথ । আভিধানিক অর্থে শিক্ষাক্রম বলতে বোঝায়, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য একটি কোর্স । বিগত কয়েক দশক ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, শিক্ষাক্রম কথাটিকে শিক্ষাবিদরা নানা অর্থে ব্যবহার করছেন । ফলে এর সুনির্দিষ্ট কোনো একক সংজ্ঞা প্রদান করা অত্যন্ত কঠিন কাজ । শিক্ষাক্রমের সংজ্ঞা আসলে যুগে যুগে লেখকভেদে ক্রমাগত বিবর্তন লাভ করে চলেছে । তাই শিক্ষাক্রমের সর্বজন স্বীকৃত কোনো একক সংজ্ঞার উদ্ভব হয়নি । উন্নত দেশে শিক্ষাক্রম নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষাক্রম বলতে মূলত কোর্স অব স্টাডিকে বোঝানো হতো । শিক্ষাক্রমকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু, কোর্স সীমারেখা, শিক্ষক নির্দেশিকা বা উৎপাদিত সামগ্রী (product) হিসেবে দেখা হতো । শিক্ষাক্রমের এই প্রাচীন ধারণা ১৯৩০ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় প্রচলিত ছিল । প্রাচীনকালে জ্ঞান আহরণ করাই ছিল শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য । এ জন্য শিক্ষাক্রম প্রণয়নে বংশানুক্রমিক সুসংবদ্ধ জ্ঞান ও মানসিক শৃংখলার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হতো । ১৯৩০ সালের পর থেকে শিক্ষাক্রমের প্রাচীন ও সংকীর্ণ ধারণার পরিবর্তন হয় এবং শিক্ষাক্রমের সংজ্ঞা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে । এ সময় শিক্ষাক্রম বলতে স্কুল কর্তৃক পরিচালিত সব শিখন অভিজ্ঞতার সমষ্টিকে বুঝানো হত । ১৯৩৫ সালে ক্যাসওয়েল এবং ক্যাম্পবেল শিক্ষাক্রমের সনাতন ধারণার অবসান ঘটিয়ে আমেরিকায় একটি নতুন সংজ্ঞার প্রস্তাব করেন । তাঁরা বলেন, শিক্ষাক্রম হলো শিক্ষকের পরিচালনায় শিক্ষার্থীর অর্জিত সব অভিজ্ঞতা । অন্যান্য লেখকগণও ক্যাসওয়েল ও ক্যাম্পবেলের অনুসরণে শিক্ষাক্রমকে অভিজ্ঞতা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন । ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি শিক্ষার্থীর জীবনে স্কুলের প্রভাব প্রকটরূপে দেখা দিল । এর ফলে ষাটের দশকে শিক্ষাক্রমের পরিমার্জন ও পরিবর্তনের ব্যাপারে আমেরিকায় অনেক শিক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয় । এই পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কিছু শিক্ষাবিদ শিক্ষাক্রমকে শিখন পরিকল্পনা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেন । এ প্রসঙ্গে টাবা বলেন, 'A Curriculum is a plan for learning.' ষাটের দশকে এবং সত্তরের দশকের প্রথমে অনেকেই স্কুলের কাজকে শিল্প-কারখানার উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করেন । শিল্প-কারখানায় যেমন কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাত করে নানারকম দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা হয়, তেমনি স্কুলের কাজ হবে অশিক্ষিত ও অনভিজ্ঞ শিক্ষার্থীদের দক্ষ, অভিজ্ঞ ও শিক্ষিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা । এ ধারণা অনুযায়ী স্কুলের সার্বিক ফলাফল, শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পারদর্শিতা ও কৃতিত্বের মূল্যায়নের ব্যাপারে শিক্ষাবিদদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি হয় । এর ফল হিসেবে মূল্যায়ন ব্যবস্থা জোরদার করা এবং স্কুলের জবাবদিহিতার প্রশ্ন জোরেশোরে উচ্চারিত হতে থাকে । ১৯৭০ সালে পোফাম ও বেকার শিক্ষাক্রমকে স্কুলের সেই সব পরিকল্পিত

শিখনফল হিসেবে উল্লেখ করেন, যা অর্জনের দায়দায়িত্ব স্কুলের ওপর বর্তায়। ১৯৭৩ সালে ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ লটন শিক্ষাক্রমের উপাদান নির্বাচনের ব্যাপারে সামাজিক কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, 'Curriculum is essentially a selection from the culture of a society.' আশির দশকে এসে লক্ষ্য করা যায়, পরিকল্পনা ও অভিজ্ঞতা ধারণা দুটিকে সমন্বিত করে শিক্ষাক্রমের একটি সুন্দর সংজ্ঞা রচনা করেছেন দুজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ- মার্শ ও স্ট্যাফোর্ড। তাদের কথায়-'Curriculum is an interrelated set of plans and experiences which a student completes under the guidance of the school.' শিক্ষাক্রম হলো শিক্ষার একটি বিশেষ স্তরের (যেমন- প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ইত্যাদি) শিক্ষণীয় বিষয়ের সমষ্টি বা পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা। শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন কৌশল, বিভিন্ন উপকরণ ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মসূচি সব কিছুই শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে। একটি নির্দিষ্ট বয়স ও শ্রেণির শিক্ষার্থীরা কী জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হবে- তার সামগ্রিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল হচ্ছে শিক্ষাক্রম বা কারিকুলাম। কারিকুলাম হচ্ছে সমগ্র শিক্ষা কার্যক্রমের রূপরেখা। কারিকুলামের লক্ষ্য জাতীয় দর্শন, রাষ্ট্রীয় নীতি, জাতীয় ও বৈশ্বিক পরিবেশ, চাহিদা এবং উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তার আলোকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রণীত হয়। এর লক্ষ্য থাকে অনেক ব্যাপক। এ সব লক্ষ্য অর্জন করার জন্য অনেকগুলো সাধারণ উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়। এ সব উদ্দেশ্য অর্জন করতে হলে কোন কোন বিষয়বস্তুর মাধ্যমে অর্জন করতে হবে, তা নির্ধারণ করা হয়। এখান থেকেই নির্ধারণ করা হয় বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য। বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্যসমূহকে আবার স্তরভিত্তিক উদ্দেশ্যে বিন্যাস করা হয়। অতঃপর স্তরের ওপর ভিত্তি করে বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্যকে অর্জন করার জন্য নির্ধারণ করা হয় শিখনফল। একজন শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তীয়, আবেগীয় ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রসমূহ বিবেচনা করে বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও শিখনফল প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। একজন শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট স্তর অনুযায়ী কী অর্জন করবে- তার সুনির্দিষ্ট বর্ণনাই হলো শিখনফল। শিখনফলগুলো হবে সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য ও মূল্যায়নযোগ্য।

পাঠ্যসূচি হলো শিক্ষাক্রমের অংশবিশেষ। সাধারণত শিক্ষাক্রমের একটি বিশেষ উপাদান বিষয়বস্তু (Content) নিয়ে পাঠ্যসূচি গঠিত হয়। কোনো শ্রেণিতে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে কী কী বিষয়বস্তু পড়ানো হবে, তারই বিস্তারিত বিবরণ বা তালিকা হলো পাঠ্যসূচি। সাধারণত শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষাক্রম পৌঁছায় না। কোনো কোর্সের শুরুতেই পাঠ্যসূচি শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছাতে হবে। শিক্ষাক্রমকে একটি বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হলে, পাঠ্যসূচি হবে ওই বৃক্ষের একটি শাখা। শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য শিক্ষার্থীর সামগ্রিক জীবনের বিকাশ সাধন। পক্ষান্তরে পাঠ্যসূচি শিক্ষার্থীর একটি বিশেষ দিকের বিকাশ সাধন করে থাকে। শিক্ষার্থীদের অর্জন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে মূল্যায়নেরও প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশে শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়নে সমকালীন বৈচিত্র্য আনা খুবই জরুরি। বাংলাদেশে বর্তমানে সনাতনী মুখস্থনির্ভর শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে অংশগ্রহণমূলক এপ্রোচকে উৎসাহিত করছে। আশা করা যায়, এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার উত্তরোত্তর বিকাশ ঘটবে এবং বাংলাদেশে এই পদ্ধতি দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৩.২.৩ আইসিটি বিষয় পাঠদানের পরিকল্পনা কাঠামো

পাঠদান একটি পরিকল্পিত কাজ। আইসিটি বিষয় পাঠদানের জন্যও একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনার প্রয়োজন। বিষয়টি পাঠদানে তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি ব্যবহারিক কাজের অংশ আছে। শিক্ষাক্রম মেট্রিক্সের তৃতীয় কলামে পাঠদান পরিকল্পনার কতিপয় উদাহরণ প্রদান করা হয়েছে এবং চতুর্থ কলামে পাঠ মূল্যায়নের কতিপয় নির্দেশনা রয়েছে। এগুলো অনুসরণ করে পাঠ পরিচালানা করা যায়। এছাড়াও পাঠদানের সাধারণ পদ্ধতি ব্যবহার করে পাঠ পরিচালনা করা আবশ্যক।

সুষ্ঠু শিক্ষাদান পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

সুষ্ঠু, বিজ্ঞানভিত্তিক ও যুক্তিপূর্ণ শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। প্রশ্ন আসে, কি কি বৈশিষ্ট থাকলে শিক্ষাদান পদ্ধতিকে সার্থক বলা যায়? এর উত্তরে বলা যায়- পদ্ধতি হবে লক্ষ্য ভিত্তিক। প্রথমে লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিয়ে লক্ষ্যের অনুকূলে বিষয়বস্তু উপস্থাপন ও লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সর্বশেষ লক্ষ্য অর্জন নির্ণয়ের জন্য যথাযথ মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রয়োগকে একটি সুষ্ঠু রূপদান করে। সুষ্ঠু নীতির উপর ভিত্তি করে সুপরিকল্পিত পদ্ধতি প্রয়োগ হতে হবে। জানা থেকে অজানা, বাস্তব থেকে অবাস্তব, মূর্ত থেকে বিমূর্ত, বিশ্লেষণ থেকে সংশ্লেষণ ইত্যাদি হলো সুষ্ঠু পদ্ধতি প্রয়োগের নীতি। প্রয়োজন নীতির অন্যথা হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এটি নির্ভর করে শিক্ষকের দূরদৃষ্টি, প্রজ্ঞা ও কল্পনা শক্তির উপর। শিশু যা শিখে তাই তার আচার-আচরণে রূপান্তরিত হয়ে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয়। তাই শিক্ষার্থীর বয়স, সামর্থ, আগ্রহ, ইচ্ছা ও অভিরুচি অনুযায়ী শিক্ষাদান কার্য পরিচালনা করা বাঞ্চনীয়। সুতরাং পদ্ধতি হবে মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক। উত্তম পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো শিক্ষার্থীর মনকে যুক্তি ও চিন্তাধর্মী করে তোলা। শিক্ষার্থী যত বড় হতে থাকে, তার ভিতর ধীরে ধীরে যুক্তি ও বিচারবুদ্ধিও তত জাগ্রত হয়। সার্থক শিক্ষাদান পদ্ধতি ব্যক্তি ও শ্রেণি উভয়কেই প্রাধান্য দেয়। একজন সার্থক শিক্ষক ব্যক্তি বিশেষের বিভিন্নতার দিকে যেমন খেয়াল

রাখেন, তেমনি সমগ্র শ্রেণির প্রতি তার দৃষ্টি সদা জাগ্রত থাকে। স্বল্প মেধা, গড় মেধা এবং উচ্চ মেধা এই তিন শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সমান দৃষ্টি রেখেই তাকে শিক্ষাদান করতে হয়।

শিক্ষাদান পদ্ধতি

সুষ্ঠু শিক্ষাদান পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য জানা থাকলে একজন শিক্ষকের শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা করা সহজ হয়। কারণ পাঠদানের কলাকৌশলের মধ্যে অন্যতম উপাদান হলো শিক্ষাদান পদ্ধতি। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে সক্রিয় করেন এবং তথ্য সরবারাহ ও বিনিময় করেন। শিক্ষাদান পদ্ধতি একদিকে বিজ্ঞানধর্মী এবং অপদিকে সৃজনশীল শিল্পকলা। এ দুয়ের মাঝে সংযোগ সাধনের মধ্যে রয়েছে পদ্ধতি প্রয়োগের সার্থকতা। সেই সঙ্গে নিজ চিন্তা, যুক্তি ও বিবেচনা দিয়ে পদ্ধতিকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে তুলতে হবে। তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে মুহূর্তেই জানা যায় পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের ঘটনা প্রবাহ। কাজেই শিক্ষাকে নতুনভাবে রূপ দেবার এবং পদ্ধতিকে নতুনভাবে সাজাবার সময় এসেছে। পাঠদানে বৈচিত্র্য আনয়ন করা বা উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করাও একজন শ্রেণি শিক্ষকের অন্যতম কাজ। পাঠদানে বৈচিত্র্য আনয়নের জন্য কার্যকর কয়েকটি পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

অংশগ্রহণমূলক এপ্রোচ

শিক্ষক শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞাতা কাজে লাগিয়ে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করেন। দলগত কাজ, দলগত আলোচনা, ব্রেইন স্টর্মিং, প্রশ্ন-উত্তর, Expert Jigsaw ইত্যাদি এ এপ্রোচের উপাদান। অংশগ্রহণমূলক এপ্রোচে শিক্ষাদানে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং দ্বিমুখী যোগাযোগের মাধ্যমে শিক্ষাদান পরিচালিত হয়। এতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সমান অংশগ্রহণের মাধ্যমে পাঠদান তাৎপর্যমন্ডিত হয় এবং পাঠের সফল সমাপ্তি ঘটে। এ এপ্রোচ জীবন সম্পৃক্ত এবং শিক্ষার্থী নিজেকে সঠিকভাবে বিকাশের সুযোগ পায় এবং দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত হয়।

মিথষ্ক্রিয়ামূলক পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিজ্ঞান বিষয়ক ব্যবহারিক ক্লাশে এ পদ্ধতি অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং আকর্ষণীয় কারণ এ পদ্ধতিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পারস্পরিক আলাপ আলোচনাকে গুরূত্ব দেওয়া হয়। ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে উৎসাহ, সাহস ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় এবং পাঠে আগ্রহী হয়ে ওঠে। শিক্ষক তাঁর বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেন। ফলে শিক্ষণ শিখনে বৈচিত্র্য নিয়ে আসা যায়। বাংলাদেশে আধুনিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এ পদ্ধতি ব্যাপক গুরুত্ব পাচ্ছে। এ পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে মাটি ও মানুষের সাথে শিক্ষার সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং একজন শিক্ষকের এ পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরি।

সহযোগিতামূলক পদ্ধতি

সহযোগিতামূলক পদ্ধতিতে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার একটি উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করবেন। শিক্ষণ-শিখন যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করবে শিক্ষার্থীরা। শিক্ষক এখানে Facilitator বা Moderator হিসেবে তাদের পাঠ গ্রহণে সহায়তা করেন মাত্র। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে তাদের চিন্তা, চেতনা, জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করে প্রদত্ত সমস্যা বিশ্লেষণ করতে পারে। সমাধানের জন্য নিজেরা পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। এখানে শিক্ষার্থীর ভুলকে তিরষ্কার না করে সংশোধন করা হয় এবং ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রয়োগমুখী রাখতে সচেষ্ট হবেন। শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞাতার আলোকেই নতুন কিছু শিখতে পারে ও সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটতে পারে।

শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে শিক্ষক কতটুকু জানেন সেটা বড় কথা নয়, শিক্ষার্থী কতটুকু জেনেছে বা জানার মধ্যে কোনো ত্রুটি আছে কিনা সেটা বড় কথা। পাঠদানে শিক্ষকের অংশগ্রহণ থাকে (৫-১০ শতাংশ) সহায়কের। কোথাও কোনো ভুলত্রুটি হলে শিক্ষক শুধু ভুল সংশোধন করেন। পাঠদানে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ ৯০-৯৫ শতাংশ। সুতরাং সুষ্ঠু পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক উপরিউল্লিখিত পদ্ধতি সমন্বয় করে পাঠদান করলে শিক্ষার্থীরা পাঠে আগ্রহী হবে এবং যৌক্তিক চিন্তার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হবেন। ফলে পাঠদান কার্যক্রম সুন্দর ও আকর্ষণীয় হবে।

শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম একটি উন্নত ধরণের শিল্প। শিক্ষকতা একটি পেশা নয় এটি একটি ব্রত। এই মহান পেশায় যারা নিয়োজিত তাদের চৌকস ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হবে। একজন সফল শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্ণাঙ্গরূপে অনুধাবন করবেন, সময় সম্পর্কে সচেতন থাকবেন, শ্রেণির পরিবেশ ও শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থাকে ভালোভাবে উপলব্ধি করবেন। শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম সুন্দরভাবে পরিচালনা জন্য তিনি বহুবিধ কৌশল সম্পর্কে জানবেন। পদ্ধতি উদ্ভাবন করবেন। সর্বোপরি তিনি শিক্ষার্থীর

মানসিক উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য পাঠদানে বৈচিত্র আনবেন। তাহলে আশা করা যায় গুণগত শিক্ষা সম্পাদনের মাধ্যমে একটি নৈতিকতা, মূল্যবোধ সম্পন্ন সুন্দর জাতি গঠনের দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।

পাঠদানের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়

জ্ঞান অর্জন, নতুন জ্ঞান আবিষ্কার এবং নতুন কলাকৌশল আয়ত্বকরণ ও তা প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষ অতি দ্রুত পৃথিবীর পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। এ পরিবর্তনের অন্যতম অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে শিক্ষক। শিক্ষক একজন অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব যার মূল দায়িত্ব হলো শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করা। এই সুষ্ঠু পরিবেশের মাধ্যমেই শিক্ষার্থী জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ অর্জনের সুযোগ পায়। পরিবর্তিত জগতের নতুন জ্ঞান ও কলাকৌশল আয়ত্বে আনার সুযোগ তখনই পাবে, যখন শিক্ষক সেই জ্ঞান কলাকৌশলে সমৃদ্ধ হবেন এবং যথা সময়ে যথার্থভাবে শিক্ষার্থীর নিকট পৌঁছে দেবেন। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের একটি বিশেষ ক্ষেত্র মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন। আর এ কাজের বিস্তার ঘটানোর জন্য রয়েছেন শিক্ষক। একবিংশ শতাব্দির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শিক্ষককেই এগিয়ে আসতে হবে। এ ব্যাপারে পাঠদান কলাকৌশল উন্নয়নের মাধ্যমে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করায় শিক্ষকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

আইসিটি বিষয় পাঠদানের জন্য একটি সমন্বিত পরিকল্পনা জরুরি। এ জন্য শিক্ষককে পরিকল্পনার আশ্রয় নিতে হবে। একজন শিক্ষক শিক্ষাদান করেন। শিক্ষাদান করার অন্তর্নিহিত ক্ষমতাই তার যোগ্যতা। তার যোগ্যতার মাপকাঠি অর্জিত শিক্ষা সফলতা, অভিজ্ঞতা এবং নিয়মিত পড়াশোনা। নিয়মিত পড়াশোনা, চর্চা-অনুশীলন তার সক্ষমতাকে বৃদ্ধি ও সচল রাখতে এবং হালনাগাদ করণে সাহায্য করে। শিক্ষকের ক্ষমতার মাপকাঠি হলো তিনি কতটা সফলতার সাথে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করতে পারছেন। সকল শিক্ষার্থী যদি তার বিতরণ করা জ্ঞান শতভাগ বুঝতে ও আত্বস্থ করতে পারে এবং উদ্দীপ্ত হয় তবে তার দক্ষতা পরিপূর্ণ বলে ধরা যায়। বাংলাদেশকে একবিংশ শতাব্দির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সময় এসেছে একজন শিক্ষকের প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ কার্যক্রমে সাড়া দিয়ে আধুনিক শিক্ষাদান কার্যসম্পাদনের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার এবং যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণের। একজন উত্তম মানের শিক্ষকই পারেন প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ভালোভাবে শেখাতে। যেহেতু পরিবার, সমাজ এবং জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে বর্তমান প্রজন্মের সৃজনশীলতা, দক্ষতা, জ্ঞানের পরিধির উপর সেহেতু অবশ্যই শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে শিক্ষার্থীর প্রতিভাকে প্রতিপালন ও বিকশিত করার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং জ্ঞানসম্বলিত মানব সম্পদ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। গুণগতমানের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব অর্জনের একটি প্রধান উপাদান। শিক্ষার্থীদের জন্য এই সুযোগ সৃষ্টি করা শিক্ষকের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। শ্রেণি কক্ষে সফলভাবে পাঠদানের জন্য আইসিটি শিক্ষকের নিজ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা প্রয়োজন, একই সাথে শ্রেণিকক্ষে পঠনীয় বিষয় কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কলাকৌশল কী হবে, শিখন সহায়ক শিক্ষা উপকরণ কখন কীভাবে ব্যবহার করা যায়, শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সমানভাবে নজর রেখে, সমভাবে গুরুত্ব দিয়ে কীভাবে পাঠ পরিচালনা করা যায়, পাঠে শিক্ষার্থীদের ঔৎসুক্য সৃষ্টি এবং তাদের চিন্তা ও কল্পনা শক্তির উন্মেষ ঘটানোর উপযোগী অগ্রগতি নিরুপণের জন্য মূল্যযাচাই কীভাবে ব্যবহার করা যায় ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে শিক্ষকের সুস্পষ্ট জ্ঞান ও ধারণা থাকা বিশেষভাবে প্রয়োজন। একজন শিক্ষককে এসব বিষয়গুলোর প্রতিফলন ঘটিয়ে কার্যকর পাঠদান করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকা দরকার।

পাঠের ধারাবাহিক উপস্থাপন

একটি দেশ ও জাতির শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করে একটি দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রেণিকক্ষ। বস্তুত শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে জানতে হলে শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার গুণগতমান সম্পর্কে সবার আগে জানতে হবে। শিক্ষকগণ শ্রেণিকক্ষে যথার্থ, মানসম্পন্ন, কার্যকর পাঠদানে সক্ষম হলেই কেবল সার্থক শিখন সম্ভব হয়। বস্তুত, শ্রেণিকক্ষে কার্যকরী পাঠদানের উপর শিক্ষকের সাফল্য নির্ভর করে। পাঠদান যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়; পাঠদান সম্পূর্ণ মানসিক প্রক্রিয়া।

শিক্ষকের বয়স, অভিজ্ঞতা, ধারণক্ষমতা সব কিছুই বেশি। পক্ষান্তরে শিক্ষার্থীর বয়স কম, অভিজ্ঞতা কম - কিন্তু জানার আগ্রহ বেশি। শিক্ষক শ্রেণিতে একটি বিষয়বস্তু উপস্থাপনে সচেষ্ট থাকেন। তাঁর সময় সসীম। তাঁকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিষয়বস্তুর পারস্পরিক ধারাক্রম বজায় রেখে শিখন সঞ্চালনের কাজটি সুসম্পন্ন করতে হয়। একটি পাঠের সাথে অন্য পাঠের একটি আনুক্রমিক যোগসূত্র থাকে। শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রেও একটি অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রয়েছে। এ কারণে একটি পাঠ সেই একটিতে শেষ হয়ে যায় না। অন্য পাঠের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সূত্র রচিত হয়। শিক্ষকের শ্রেণিতে পাঠ উপস্থাপন কালে এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে। অন্যদিকে পাঠ্য বিষয়টিও ধারাবাহিকভাবে বিস্তৃত। শিক্ষককেও শ্রেণিতে পাঠ উপস্থাপন কালে বিষয়বস্তুর নিরিখেই তার পাঠদান কৌশল ও পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। সুশৃঙ্খল উপস্থাপনার জন্য বিষয়বস্তুর বিস্তার অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে বিষয়বস্তুকে ছোট ছোট পর্বে ভাগে করে নিতে হবে শিক্ষককে। কাজেই শিক্ষককে বিষয়বস্তু ভালোভাবে পড়ে সুশৃঙ্খল উপস্থাপনের জন্য একটি সুনিদিষ্ট পর্যায়ক্রম অনুসরণ করতে হবে।

পাঠদানের সময়ে বিবেচ্য বিষয়

শিক্ষকতা পেশায় সফলতা লাভের জন্য বিষয়বস্তু শ্রেণিকক্ষে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের কাজটি শিক্ষককে নানাভাবে পূর্ব পরিকল্পিত পথে করতে হয়। শ্রেণিকক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শিক্ষক বিভিন্ন করণীয় নির্ধারণ করেন। এ করণীয়গুলো শিক্ষকের প্রধান কাজ। প্রথম পর্যায়ে শিক্ষাদানের জন্য পাঠক্রম বিন্যাস করা, এরপর আসে বিষয়মুখী বা পাঠ্যাংশের বিন্যাস। এই দুই ধরণের কাজ শেষেই শিক্ষকের পরবর্তী কাজ হলো শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করা। এটাই হলো শিক্ষকের প্রত্যক্ষ শিক্ষণমূলক কাজ। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রয়োজন হয়। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন করে তা শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করতে হয়। উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে শিক্ষক সময় ও শ্রম বাঁচাতে প্রয়াসী হবেন।

পাঠদান শেষে বিবেচ্য বিষয়

পাঠদানের প্রতিটি পদক্ষেপ সঠিক ও লক্ষ্যাভিমুখী ছিল কিনা। পাঠ গ্রহণে তিনি শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট সহায়তা করতে পেরেছেন কিনা। শিক্ষার্থীর সাড়া যথেষ্ট ছিল কিনা। পাঠদানে পদ্ধতি ও কৌশলগুলো যথাযথ ছিল কিনা। শিখন অর্থবহ এবং কার্যকর হয়েছে কিনা। এভাবে পর্যালোচনা করা শিক্ষকের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। পাঠদান কাজটা হলো ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়া। এ ধাপগুলো আবার পাঠ সমাপন থেকে আরম্ভ হওয়ার দিকে তাকিয়ে দেখতে হয় : কোন কোন পথ বেয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছেছে। এই পথ পরিক্রমায় কি কি বাধা ছিল? বাধাগুলো কীভাবে অতিক্রম করা হলো? সাফল্যের উপাদানগুলো কী কী? ভবিষ্যতে এই কাজটি আবারো করলে কী কী সংযোজন বা বিয়োজন করা যাবে। যে ধাপে শিখনফল অর্জিত হয়নি বলে প্রতীয়মান হবে, তখন সে অংশগুলো আবার পুনরালোচনায় প্রাধান্য দিতে হবে। এভাবে শিক্ষক তার শ্রেণিতে গৃহীত পদক্ষেপগুলোকে নিয়মিত মূল্যায়ন করে অগ্রসর হবেন। পিছনে ফিরে তাকানোর ফলে নিজের ভুলত্রুটি আবিষ্কার করবেন এবং গ্রহণ বা বর্জনের মাধ্যমে তার পাঠদানের দক্ষতাও অব্যাহতভাবে উন্নত থেকে উন্নতর পর্যায়ে পৌঁছাবে। এ পদক্ষেপ পর্যালোচনার কাজটি একজন সৃজনশীল শিক্ষক পাঠদানকালীনও করবেন। যদি তিনি মনে করেন শ্রেণিতে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপ শিক্ষার্থীদের সক্রিয় শিখণে আগ্রহী করছে না তখন তিনি পদ্ধতি-কৌশল তাৎক্ষণিকভাবে পরিবর্তন করে পাঠকে স্থবিরতার হাত থেকে মুক্তি দিয়ে গতিশীল করে তুলবেন। পদক্ষেপ পর্যালোচনার এ ধারা শিক্ষককে সফল শিক্ষকে পরিণত করে এবং এটি একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। পূর্ব পরিকল্পনা না থাকলে কোনো কাজেই পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়। তাই জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই বিভিন্ন কাজে পরিকল্পনা গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিকল্পনা গ্রহণের গুরুত্ব আরো বেশি। কারণ শিক্ষাদান কার্যে শিক্ষককে শিক্ষার্থীর মন মানসিকতা, শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষাদান কৌশল এই তিনটি উপাদানের প্রতি নজর রেখে সঠিক শিক্ষাদান পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। শিক্ষার্থীর বয়স, সামর্থ ও অভিরুচির বিষয়টিও স্বততই বিবেচনায় রাখতে হয়।

নির্ধারিত সময়ে শিক্ষার্থীর শিখনফল অর্জন ও তা মূল্যায়নের সামগ্রিক কাজ সম্পন্ন করার জন্য বিষয়বস্তুর কতটুকু অংশ উপস্থাপন করা যাবে শিক্ষক তা স্থির করবেন। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও মনোযোগ ধরে রাখতে অংশগ্রহণমূলক শিখন এপ্রোচ অনুসরণ অপরিহার্য। সে উদ্দেশ্য অর্জনে শিক্ষক যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন সেগুলো হলো শিক্ষার্থীদের আসন বিন্যাস (ছোট থেকে বড় যেন শ্রেণিতে উপস্থিত সকলেরই শিক্ষক, বোর্ড, প্রদর্শিত উপকরণ ইত্যাদি সবই দৃষ্টিগোচর হয়) দলগত কাজ বা জোড়ায় কাজ করার জন্য সুবিধাজনকভাবে শিক্ষার্থীদের আসন বিন্যাস।

জেন্ডার সচেতনতা অনুসরণে আসন বিন্যাস জরুরী। ছেলে ও মেয়েদের পৃথক সারিতে না বসিয়ে পাশাপাশি এবং মিলেমিশে বসার সুযোগ তৈরি করতে হবে। দলগতভাবে বা জোড়ায় কাজ করার সময় তারা যেন পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের সুযোগ পায়। এ ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। শ্রেণিতে অল্প মেধা ও বেশি মেধা বা কম মনোযোগী শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক ভাব-বিনিময় অত্যন্ত জরুরি একটি পদক্ষেপ। এ উদ্দেশ্যে উভয় প্রকৃতির শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি এবং মিলেমিশে বসার সুযোগ তৈরি করতে হবে।

শিক্ষণ-শিখন কৌশল

শিক্ষণ শেখানো একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ। কাজটি শ্রেণিকক্ষে যিনি যত সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে পারেন, তিনি তত দক্ষ শিক্ষক। আর এজন্য শিক্ষককে পাঠদানের পূর্বে পাঠদানের কলাকৌশল সম্পর্কে গভীরভাবে জ্ঞান অর্জন করতে হবে এটাই কাম্য। শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার উপর পাঠদানের আধুনিক কলাকৌশল নির্ভরশীল। যিনি শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা অর্জনে বেশি পারদর্শী তিনি তত ভালো শিক্ষক। বিষয়বস্তুর উপর শিক্ষকের পান্ডিত্য ও দক্ষতার ওপর পাঠদান কলাকৌশল যেমন নির্ভর করে, তেমনি শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা, আগ্রহ ও গ্রহণ ক্ষমতার ওপর ও পাঠদানের কলাকৌশল নির্ভর করে। আধুনিক উপকরণ সমৃদ্ধ উন্নত পরিবেশ ও উচ্চ বুদ্ধির শিক্ষার্থীর জন্য শ্রেণি পাঠদানের যে কলাকৌশল হবে অনুন্নত পরিবেশ ও দূর্বল বা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীর জন্য নিশ্চয়ই আলাদা কলাকৌশল প্রয়োগ করতে হবে। তাই একজন যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষককে শ্রেণি পাঠদানের পূর্বে চিন্তা করতে

হবে তিনি কাদেরকে পাঠদান করবেন, শেখাবেন? কেন শেখাবেন? কী শেখাবেন? কীভাবে শেখাবেন? কখন শেখাবেন? এবং কীভাবে মূল্যায়ন করবেন? এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য একজন যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক শ্রেণি পাঠদানের ক্ষেত্রে নিম্মোক্ত কৌশল প্রয়োগ করতে পারেন ।

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করেন আর শিক্ষার্থীরা পাঠে অংশগ্রহণ করে । এ ক্ষেত্রে তাদের বয়স মেধা ও গ্রহণ ক্ষমতা বিবেচনায় আনতে হবে । তাই শিক্ষককে জানতে হবে তিনি কোন শ্রেণির শিক্ষার্থীকে পাঠদান করছেন । পাঠদানের শিখনফল কি হবে এসব শিক্ষককে অনুধাবন করতে হবে; পাঠদানের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর গ্রহণ উপযোগী হতে হবে । বয়সের তুলনায় জটিল বিষয় হলে তারা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে । শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন তা পূর্ব থেকে নির্ধারণ করতে হবে । পাঠদানে মাঝে মাঝে বৈচিত্র আনতে হবে । শিক্ষক কখন পাঠদান করবেন এবং কত সময় যাবত পাঠদান করবেন এটা পূর্ব নির্ধারিত হতে হবে । একজন শিক্ষক হিসেবে শিক্ষার্থীর সার্বিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা জানতে হবে । শিখনফল অর্জিত হয়েছে কিনা শিক্ষক মূল্যায়নের মাধ্যমে বিচার করবেন ।

শিক্ষকের প্রস্তুতি

(ক) পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন;

(খ) শ্রেণি ব্যবস্থাপনা ও শ্রেণি বিন্যাস করবেন;

(গ) বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও প্রেষণা সৃষ্টি করবেন ।

শ্রেণি ব্যবস্থাপনা

গতানুগতিক ধারায় শিক্ষকই শ্রেণিকক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন । কিন্তু আধুনিক শিক্ষণ ও শ্রেণিকক্ষ পাঠদান ব্যবস্থাপনায় । শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়ের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পাঠদান করা হয়ে থাকে । এ প্রক্রিয়ায় বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে শিক্ষক শিক্ষার্থী আলোচনার মাধ্যমে পাঠের উদ্দেশ্য, শিখনফল, পাঠদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন ইত্যাদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । এর ফলে শিক্ষার্থীরা এককভাবে, জোড়ায় ও দলগত কাজের মাধ্যমে মতামত উপস্থাপন করার সুযোগ পায় । শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের ফলে শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্ব, বিশ্বাস, আস্থা ও সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে ওঠে । পাঠ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে একজন শিক্ষক কীভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন, শিখন-শেখানো কার্যাবলি কেমন হবে, যথাযথ উপকরণের ব্যবহার কেমন করে করবেন, মূল্যায়ণ কীভাবে করবেন তা জানা আবশ্যক । নিম্নোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী ফলপ্রসূ পাঠদান করা যেতে পারে-

শিখন- শেখানো কার্যাবলি

(ক) আকর্ষণীয়ভাবে ও প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে বিষয়বস্তু উপস্থাপন/আলোচনা করবেন;

(খ) সব শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে;

(গ) বিষয় সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের গভীরতা থাকতে হবে;

(ঘ) যথাযথ শিখন-কৌশলের ব্যবহার করতে হবে;

(ঙ) পাঠে একঘেয়েমি পরিহার করে পাঠদানে বৈচিত্র আনতে হবে;

(চ) পাঠের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে;

(ছ) প্রশ্ন করার কৌশল, ধারাবাহিকতা ক্রমোচ্চ কাঠিন্যমান রক্ষা করতে হবে;

(জ) শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা সাড়া প্রদান করবে; শিক্ষক ফিডব্যাক দিবেন;

(ঝ) শিক্ষক শিক্ষর্থীর পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া অত্যন্ত আকর্ষণীয় হবে;

(ঞ) শিক্ষকের প্রফুল্লতা ও রসবোধ থাকতে হবে;

(ট) শ্রেণি উপযোগী কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণের বিশুদ্ধতা থাকতে হবে;

(ঠ) শ্রেণি উপযোগী কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণের বিশুদ্ধতা থাকতে হবে ।

উপকরণের ব্যবহার

(ক) সঠিক সময়ে উপকরণ প্রদর্শন করবেন;

(খ) ব্যবহৃত উপকরণের যথার্থতা থাকবে;

(গ) প্রদর্শনের পর উপকরণ সরিয়ে রাখবেন;

(ঘ) চকবোর্ডের/হোয়াইট বোর্ডের যথাযথ ব্যবহার করবেন;

(ঙ) বিভিন্ন সফ্টওয়্যার ব্যবহার;

(চ) স্মার্ট ক্লাসরুমের ধারণা কাজে লাগানো;

(ছ) মাল্টিমিডিয়াসহ বিভিন্ন আইসিটি উপকরণ ব্যবহার ।

মূল্যায়ন

(ক) শিখন ফলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ প্রশ্নের প্রয়োগ করবেন;

(খ) প্রত্যাশিত শিখনফল অর্জনে সফলতা পরিমাপ করবেন;

(গ) প্রয়োজনে বাড়ির কাজ প্রদান করবেন;

(ঘ) সময় ব্যবস্থাপনা মেনে চলবেন;

(ঙ) ধন্যবাদ দিয়ে ক্লাস শেষ করবেন।

পাঠদানে TPACK মডেলের ব্যবহার

TPACK মডেলের এর ধারণাটি একক কোন ব্যক্তির কাজের ফসল নয়। তবে, দীর্ঘ সময়ব্যাপি পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও গবেষণার ফল স্বরূপ আমেরিকান শিক্ষা বিজ্ঞানী Lee S. Shulman (1987 - 1986) ২০০৪ সালে তাঁর *The Wisdom of Practice: Essays on Teaching, Learning and Learning to Teach* গ্রন্থে "Pedagogical Content Knowledge (PCK)" সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা প্রদান করেন। এখানে Pedagogical Knowledge এবং Content Knowledge এ দু'টি ডোমেন বা উপাদানকে শিক্ষণ-শিখনে ব্যবহারের উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ব্যাখ্যা করে দেখান যে, শিক্ষাদানে 'বিষয়জ্ঞান' ও 'পাঠদান পদ্ধতি' পরস্পর স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তিনি এটিকে বৈপরীত্য এবং দ্বি-বিভাজন হিসাবে দেখেন। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকের কোন বিকল্প নেই। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

> *"No microcomputer will replace them, no television system will clone them and distribute them, no scripted lessons will direct and control them, no voucher system will bypass them."* (Lee Shulman, 2006)

পরবর্তীতে Michigan State University- এর Punya Mishra ও Matthew J. Koehler ২০০৬ সালে Technological Knowledge-কে সমন্বিত করে "Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK)" নামে মডেলটিকে পূণ: নামকরণ করেন এবং এ সম্পর্কিত গবেষণা, আলোচনা ইত্যাদি http://tpack.org/ ওয়েব সাইটে প্রকাশের ও শেয়ার করার ব্যবস্থা করেন। মডেলটিতে ৩টি প্রধান বা কোর ডোমেন বা উপাদান আছে। এ গুলো হচ্ছে:

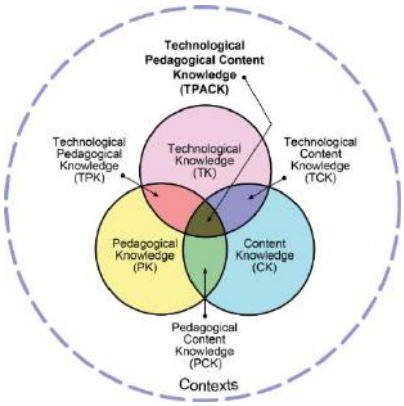

Adopted from: http://tpack.org/

১. প্রযুক্তিগত জ্ঞান বা Technological Knowledge

২. শিক্ষাবিজ্ঞান সংক্রান্ত জ্ঞান বা Pedagogical Knowledge

৩. বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান বা Content Knowledge

উল্লেখিত ৩টি প্রধান ডোমেন থেকে ২টি করে ডোমেন সমন্বয় করে আরো ৩টি উপ-ডোমেন সৃষ্টি হয়েছে। এ গুলো হচ্ছে:

১. প্রযুক্তিগত ও শিক্ষাবিজ্ঞান সংক্রান্ত জ্ঞান বা Technological Pedagogical Knowledge (TPK)

২. প্রযুক্তিগত ও বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান বা Technological Content Knowledge (TCK)

৩. শিক্ষাবিজ্ঞান ও বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান বা Pedagogical Content Knowledge (PCK)

আবার, ৩টি প্রধান ডোমেনকে একত্রে সমন্বয় করে Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK)" নামে মডেলটিকে পূর্ণাঙ্গ মডেলে পরিণত করা হয়েছে।

পাঠদানে SAMR মডেলের ব্যবহার

বর্তমানে শিক্ষণ-শিখনে প্রযুক্তিগত জ্ঞান ব্যবহারের জন্য SAMR মডেলটিও বিবেচনায় নেওয়া হচ্ছে। এ মডেলটি প্রবর্তন করেন Dr. Ruben Puentedura। SAMR মডেলটি একটি কাঠামো যা শ্রেণিকক্ষে প্রযুক্তি একীকরণের (Intrgraation) চারটি ধাপকে শ্রেণিভুক্ত করে। পরে Lefflerd মডেলটির পরিমার্জন করে সিঁড়ি বা সোপান আকারে উপস্থাপন করেন। SAMR-কে বিশ্লেষণ করলে এর পূর্ণরূপ দাঁড়ায় Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition যার মাধ্যমে শিক্ষক কীভাবে প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে পাঠের জটিল ধারণাগুলি শিক্ষার্থীদের নিকট দৃশ্যমান করার প্রয়াস পায় তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নিম্নে ধাপগুলোর সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ প্রদত্ত হলো:

প্রতিকল্পন (Substitution) : সনাতন ব্যবহার্য্য উপকরণের পরিবর্তে প্রযুক্তি সরাসরি বিকল্প হিসাবে কাজ করে, কিন্তু কোন ধারণার কার্যকরী পরিবর্তন ঘটে না। যেমন: কোন বিষয়বস্তু পাঠদানে ব্ল্যাক বোর্ড বা হোয়াইট বোর্ড ব্যবহারের পাশাপাশি কোন প্রেজেন্টেশন সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে পাঠদান। অর্থাৎ সনাতন ব্যবহার্য্য উপকরণের পরিবর্তে বা পাশাপাশি প্রযুক্তি নির্ভর উপকরণ ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

বিবর্ধন (Augmentation) : পাঠদানকে আরো গতিশীল করার জন্য উন্নত প্রযুক্তি সরাসরি বিকল্প হিসাবে কাজ করে। যেমন: কোন বিষয় পাঠদানে মাইন্ড ম্যাপিং করার জন্য সাধারণ 'ফ্লাশ কার্ড'-এর পরিবর্তে 'অন-লাইন ইন্টারেক্টিভ ফ্লাশ কার্ড' বা ইন্টারেক্টিভ স্মার্ট বোর্ড ব্যবহার।

সংশোধন (Modification) : এ পর্যায়ে প্রযুক্তির ব্যবহার পাঠদানের বিষয়বস্তুকে উল্লেখযোগ্যভাবে বোধগম্য করতে ও অর্জন যাচাই করার সুযোগ করে দেয়। যেমন: কোন আলোচ্য বিষয়ে অনলাইন রিসোর্স সংগ্রহ করে তা অধ্যয়ন ও উক্ত রিসোর্স ব্যবহার করে এ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করা। মূলতঃ এ পর্যায়ে প্রযুক্তির ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন যাচাইয়ের সুযোগ তৈরি হয়।

পুনঃসংজ্ঞায়িতকরণ (Redefinition) : এটি মডেলের সর্বোচ্চ পর্যায়। এ পর্যায়ে প্রযুক্তির এমন ব্যবহার প্রত্যাশা করা হয় যেন পাঠদান কার্যক্রম প্রযুক্তি ব্যতীত কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয় অর্থাৎ প্রযুক্তি ব্যবহার ব্যতীত পাঠদান কার্যক্রম অসম্পূর্ণ হবে। যেমন: ধারাবাহিক মূল্যায়নে নিরপেক্ষতা ও নির্ভরযোগ্য টুল্স হিসাবে কোন সফ্টওয়্যার (যেমন-কাহুট, হট-পটেটো ইত্যাদি) ব্যবহার করে মূল্যায়ন করা।

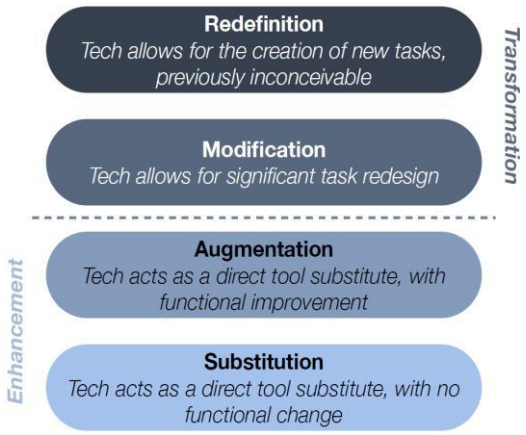

Adopted from: Ruben R. Puentedura

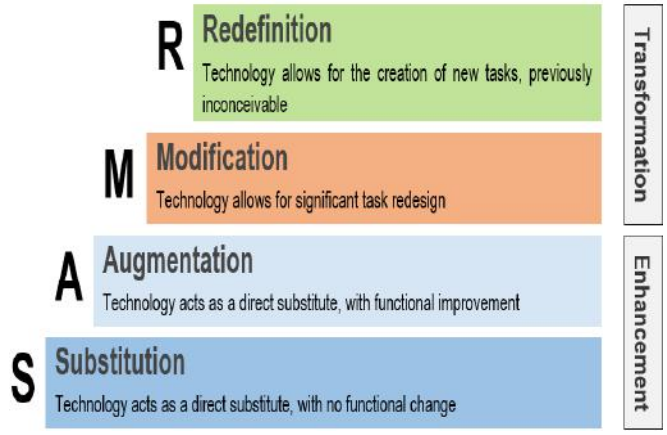

Adopted from: Lefflerd

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণ এপ্রোচ হচ্ছে ফ্লিপ্ড ক্লাসরুম (Flipped Classroom) যা প্রথাগত শিক্ষণ পরিবেশের একটি বিপরীত ধারণা। এটি শ্রেণি পাঠদানের একটি নির্দেশামূলক কৌশল যেখানে মিশ্র পদ্ধতিতে শ্রেণিতে ও শ্রেণি কক্ষের বাইরে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম ব্যাপৃত হয়। এতে শিক্ষার্থীরা শ্রেণি পাঠদানের আগেই নির্দিষ্ট পাঠ্য বিষয়বস্তুর অফলাইন বা অনলাইন বক্তৃতা দেখে, অনলাইন আলোচনায় অংশ নেয় বা বাড়িতে বসে গবেষণা পরিচালনা করে। এটি একটি শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক মডেল যেখানে শিক্ষকের নির্দেশনায় শিক্ষার্থীদের জন্য স্ব-শিখনের মাধ্যমে অর্থপূর্ণ শিখনের সুযোগ তৈরি হয়। শিক্ষক শ্রেণি পাঠদানের পূর্বেই শিক্ষার্থীদেরকে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর কিছু রিসোর্স যথা: ভিডিও, ওয়েব লিংক, রেফারেন্স ম্যাটেরিয়েল প্রদান করে এবং এর কোন কোন অংশ দেখে নিবে তার নির্দেশনা দেন। পরে শ্রেণিতে উক্ত বিষয়বস্তু আলোচনা হয়।

পাঠ পরিকল্পনা তৈরিতে TPACK, SAMR মডেল ও ফ্লিপ্ড ক্লাসরুমের ধারণা সম্যক ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়াও পাঠ পরিকল্পনা তৈরিতে ADDIE Model, প্রযুক্তি সক্রিয় শিক্ষা সংক্রান্ত (Technology Eabled Learning) ও বিভিন্ন সফ্টওয়্যারও ব্যবহৃত হচ্ছে।

নিম্নে আইসিটি বিষয়ের একটি নমুনা পাঠ পরিকল্পনা প্রদত্ত হলো ।

পাঠ পরিকল্পনা নং: ...

পরিচিতি	
শিক্ষকের নাম: রোল নং: বি এড শিক্ষাবর্ষ: বিদ্যালয়ের নাম:	বিষয়: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধ্যায় ৩: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার পাঠ ৩: কম্পিউটার ভাইরাস পৃষ্ঠা:
শ্রেণি: ৬ষ্ঠ শাখা: শিক্ষার্থীর সংখ্যা: উপস্থিত শিক্ষার্থী:	সময়: ৫০ মিনিট পিরিয়ড: তারিখ:

শিখনফল
এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা - ১. কম্পিউটার ভাইরাস কী তা বলতে পারবে । ২. কম্পিউটার কীভাবে ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে । ৩. কম্পিউটারকে ভাইরাসমুক্ত রাখার উপায়গুলো বর্ণনা করতে পারবে ।

সোপান: প্রস্তুতি

বিষয়বস্তু ও সময়	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	পদ্ধতি ও কৌশল	উপকরণ
কুশল বিনিময়, আসন বিন্যাস, মানসিক প্রস্তুতি, পাঠ ঘোষণা **সময়: ৫ মিনিট**	শ্রেণিতে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় ও আসন বিন্যাসের পর নিচের প্রশ্নগুলো করব: ● মানব দেহে ভাইরাসের আক্রমনে কী কী উপসর্গ দেখা দেয়? ● ভাইরাস এক দেহ থেকে অন্য জনের দেহে কীভাবে ছড়াতে পারে? ● কম্পিউটারে ভাইরাস আক্রমণের কোনো ঘটনা জানা আছে কিনা? উপর্যুক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে খুঁজতে পাঠ শিরোনাম **"কম্পিউটার ভাইরাস"** বোর্ডে লিখে আজকের পাঠে প্রবেশ করব ।	● কুশল বিনিময় করবে ● নির্দেশনা মতো আসন গ্রহণ করবে ● আলোচনায় অংশ নেবে ● পাঠ ঘোষণার পর শিরোনাম খাতায় লিখে নিবে ।	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর	-

সোপান: উপস্থাপন

বিষয়বস্তু ও সময়	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	পদ্ধতি ও কৌশল	উপকরণ
ফ্লিপ্‌ড ক্লাসরুম-এর রিসোর্স **সময়: ৫ মি.**	ফ্লিপ্‌ড ক্লাসরুম-এর রিসোর্স সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। এ ক্ষেত্রে কোন জিজ্ঞাসা থাকলে তা শেয়ার করতে বলবো।	শিক্ষার্থীরা ভিডিও দেখে নোট নেবে, আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে এবং পাঠের প্রয়োজনীয় অংশ নোট খাতায় লিখে নেবে। প্রয়োজনে ইন্টারনেট সার্স করে বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত হবে।	মাইন্ড ম্যাপিং, দলগত কাজ, প্রশ্নোত্তর, ইন্টারনেট সার্স	ইন্টারনেট, পিপিটি প্রেজেন্টেশন, ভিডিও, VIPP কার্ড, মাইন্ড ম্যাপিং সফ্‌টওয়্যার
(ক) কম্পিউটার ভাইরাস কী? **সময়: ৫ মি.**	কি ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে 'কম্পিউটার ভাইরাস'-কে সংজ্ঞায়িত করবো।			
(খ) কম্পিউটার ভাইরাসের ক্ষতিকারক দিক **সময়: ৫ মি.**	• ফ্লিপ্‌ড ক্লাসরুম রিসোর্স হিসাবে সরবরাকৃত ভিডিও দেখে কম্পিউটার ভাইরাসের ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে দলগত কাজ দেবো। • বোর্ডে VIPP কার্ড দিয়ে মাইন্ড ম্যাপিং করে ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কম্পিউটার ভাইরাসের ক্ষতিকারক দিকগুলো ব্যাখ্যা করবো।			
(গ) মানব দেহের ভাইরাস ও কম্পিউটার ভাইরাসের মধ্যে পার্থক্য **সময়: ৫ মি.**	• মানব দেহের ভাইরাস ও কম্পিউটার ভাইরাসের মূল পার্থক্য প্রশ্নোত্তর ও অলোচনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করব			
(ঘ) কম্পিউটার কীভাবে ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয় **সময়: ১০ মি.**	• শিক্ষার্থীদেরকে জোড়ায় কাজ দিয়ে কম্পিউটার কীভাবে ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয় তা বোর্ডে VIPP কার্ড সাজিয়ে মাইন্ড ম্যাপিং করে প্রাথমিক ধারণা গঠন করবো • পিপিটি প্রেজেন্টেশন ব্যবহার করে পেনড্রাইভ, সিডি, ডাউনলোড, নেটওয়ার্কিং ইত্যাদির মাধ্যমে ভাইরাস ছড়ানোর উপায় ব্যাখ্যা করবো। এক্ষেত্রে ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে খবর ছড়ানোর বিষয়টি অনুশীলন করে দেখাবো।	শিক্ষার্থীরা পাঠে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো খাতায় লিখে নিবে	মাইন্ড ম্যাপিং, জোড়ায় কাজ, প্রশ্নোত্তর, ভূমিকাভিনয়	ইন্টারনেট, পিপিটি প্রেজেন্টেশন, ভিডিও, পোস্টার পেপার, VIPP কার্ড

সোপান: মূল্যায়ন

বিষয়বস্তু ও সময়	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	পদ্ধতি ও কৌশল	উপকরণ
অর্জন যাচাই **সময়: ১২ মি.**	নিচের দলগত কাজটি দিয়ে শিখন অগ্রগতি যাচাই করবো ও দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকটি দলকে উপস্থাপন করতে বলবো: **<u>কাজ ১:</u>** সত্যিকারের ভাইরাস এবং কম্পিউটার ভাইরাসের মধ্যে মিল এবং অমিলগুলো লিপিবদ্ধ কর । **<u>কাজ ২:</u>** কম্পিউটারকে ভাইরাসমুক্ত রাখার উপায়গুলো লিখ ।	শিক্ষার্থীরা দলগত কাজটি শেষ করে উপস্থাপন করবে ও ফিডব্যাক গ্রহণ করবে	দলগত কাজ	কর্মপত্র (পিপিটি প্রেজেন্টেশন)
সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন **সময়: ৫ মি.**	সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিখন অগ্রগতি যাচাই করবো: ১. কম্পিটার ভাইরাস কী? ২. VIRUS শব্দের পূর্ণরূপ কী? ৩. সাধারণত: কোন্ কোন্ মাধ্যমে কম্পিউটার ভাইরাস ছড়ায়? ৪. কম্পিউটারকে ভাইরাসমুক্ত রাখার উপায় কী?	শিক্ষার্থীরা উত্তর প্রদানের চেষ্টা করবে এবং কোনো দুর্বলতা থাকলে শিক্ষকের সহায়তায় সমাধান করবে	একক জিজ্ঞাসা	কর্মপত্র (পিপিটি প্রেজেন্টেশন)
বাড়ির কাজ **সময়: ৩ মি.**	নিচের বাড়ির কাজটি দেব: কম্পিউটারকে ভাইরাসমুক্ত রাখতে তুমি কী সতর্কতা অবলম্বন করবে?	শিক্ষার্থীরা বাড়ির কাজ ডায়েরিতে লিখে নিবে	একক নোট গ্রহণ	

পাঠ সমাপ্তি
ঘণ্টা পড়ার সাথে সাথে বোর্ড মুছে উপকরণ গুছিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করবো । শিক্ষার্থীরা দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে বিদায় জানাবে ।

প্রশ্নাবলি

১. শিখনফল বলতে কী বোঝায়?
২. কীভাবে শিখনফল লিখতে হয় উদাহরণসহ বর্ণনা করুন ।
৩. শিক্ষাক্রম কী?
৪. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির মধ্যে পার্থক্য কী?
৫. আইসিটি বিষয় পাঠদানে বিবেচ্য দিক কি কি?
৬. পাঠদান কলাকৌশল বর্ণনা করুন ।
৭. পাঠ পরিকল্পনা কী?
৮. ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির আইসিটি বিষয়ের একটি নমুনা পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করুন ।

তথ্যসূত্র

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (৬ষ্ঠ - ৯ম শ্রেণি). (২০১৬). জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা ।

মাহবুবুর রহামন, (২০১১) *কম্পিউটার পরিচিতি*, সিস্টেক পাবলিশার্স, ঢাকা ।

মুজিবর রহমান, (২০১৩)*প্রাথমিক ধারণা: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি*, ভয়েজার পাবলিকেশনস, বাংলা বাজার, ঢাকা ।

মজিবুর রহমান, (২০১৪) *তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি*, সিবিও পাবলিকেশনস, ঢাকা

মুহম্মদ নূরুল হুদা. (২০১৩, এপ্রিল ২৩). *বাংলাদেশে কপিরাইট আইন: সংজ্ঞা ও সমীক্ষা*. Retrieved from http://arts.bdnews24.com/?p=5016.

ড. আলমগীর হোসেন ও ড. লুৎফর রহমান, (২০০৫) *কম্পিউটার ফান্ডামেন্টালস*, ইউপিএল, ঢাকা ।

Anderson, L. W., &Krathwohl, D. R. (2001). *A Taxonomy for learning, teaching, and assessing*, Abridged Edition. Boston, MA: Allyn and Bacon.

Charles E. Baukal, Floyd B. Ausburn, & Lynna J. Ausburn. (January - March 2013). A proposed multimedia cone of abstraction: Updating a classic instructional design theory. *i-manager's Journal of Educational Technology, 9*(4), 15-24.

Delors, J., et al. (1999). *Learning: The Treasure Within.* Paris, UNESCO.

Dwyer, Francis M. (1978). *Strategies for Improving Visual Learning*. State College, PA: Learning Services.

Guttman, C. 2003. *Education in and for the Information Society*. Paris, UNESCO.

Lee, S. J., & Reeves, T. C. (2007). Edgar Dale: A significant contributor to the field of educational technology. *Educational Technology*, 47(6), 56.

Orr, W. D. (1992). Ecological literacy: Education for a post modern world. In J. Pretty, A. Howard, A. Leopold, W. Berry , D. Orr , D. Kline , . . . J. L. Flora , & J. Pretty (Ed.), *The Earthscan Reader in Sustainable Agritulture* (pp. 21-29). London • Sterling, VA: Earthscan.

Puentedura, R. Ruben. (December 11, 2014). *SAMR and TPCK: A Hands-On Approach to Classroom Practice.* Retrieved June 19, 2018, from http://www.hippasus.com/rrpweblog/archives/000140.html.

Seels, B. (1997). *The relationship of media and ISD theory: The unrealized promise of Dale's Cone of Experience.* (ERIC Document Reproduction Service No. ED 409 869). Retrieved June 19, 2018, from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED409869.pdf.

Sipos, Y., Battisti, B., & Grimm, K. (2008). Achieving transformative sustainability learning: Engaging head, hands and heart. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 9, 68-86.

Spady, William G. (1994).*Outcome-Based Education: Critical Issues andAnswers.* Arlington, VA. : American Association of School Administrators.

UNESCO. (2011). *ICT Competency Framework for Teachers*. Paris, UNESCO.

UNESCO. (2005). *Links between the Global Initiatives in Education*. Paris, UNESCO.

UNESCO.(2014). *Textbooks and learning resources: Guidelines for developers and users.*Retrieved from UNESCO,Paris.: Accessed on 15 June 2018: http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002261/226135e.pdf.

ইউনিট ৪ : ডেটাবেজ এর ব্যবহার

আলোচিত বিষয়বস্তুসমূহ:

৪.১ ডেটাবেজ ও রিলেশনাল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (RDBMS) এর ধারণা, পরিচিতি, প্রকারভেদ ও ব্যবহার

৪.২ টেবিল, ফিল্ড, রেকর্ড, ফর্ম, কুয়েরি, রিপোর্ট

৪.৩ টেবিল তৈরি, ডাটা এন্ট্রি, বিদ্যমান টেবিলে নতুন রেকর্ড প্রবেশ করানো, রেকর্ড মুছে ফেলা, নতুনফিল্ড যোগকরা

৪.৪ কুয়েরি করা, রিপোর্ট তৈরি করা

৪.৫ ডেটাবেজ সংক্রান্ত নমুনা প্রজেক্ট তৈরি ।

ইউনিট ৪

ডেটাবেজ এর ব্যবহার

তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণে বিশ্বব্যাপী আলোচিত ও ব্যবহৃত হচ্ছে ডেটাবেজ। ডেটাবেজ মানে তথ্যভান্ডার। কম্পিউটার আবিষ্কারের আগে স্তুপীকৃত ফাইলে তথ্য সংরক্ষণ করা হতো, এখন ডেটাবেজে তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। ডেটাবেজ তৈরির বিভিন্ন প্রোগ্রাম আছে। একটি ডেটাবেজ তৈরি করার পর সেটাকে প্রায়ই হালনাগাদ করতে হয়। এই হালনাগাদের কাজ করার জন্যও বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম আছে। ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ডিবিএমএস, হলো এমন একটি পূর্ণাঙ্গ প্রোগ্রাম যা একই সাথে ডেটাবেজ তৈরি, ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বধান এবং ডাটা প্রসেসের কাজ করা যায়। ডেটাবেজের সাহায্যে ডাটা প্রসেস করে আমরা ঐসব ডেটার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারি। যদিও ডেটা প্রসেস করে নলেজ মাইন করা ডেটাবেজের মুল উদ্দেশ্য নয়। নলেজ মাইনিংয়ের জন্য ডেটা মাইনিং টুলস ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ডেটাবেজের মুল উদ্দেশ্য হলো, সবচেয়ে নিরাপদ উপায়ে ডেটা সংরক্ষণ করা এবং দ্রুত গতিতে ডেটা খোঁজ করা। ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সেই সমস্ত ক্ষেত্রে অপরিহার্য যেখানে একই সময় একাধিক ব্যবহারকারী একই ডাটা ব্যবহার করে থাকেন। যেমন, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাধিক শাখায় অবস্থিত কর্মকর্তারা যদি একই তথ্য, একই সময়ে হালনাগাদ করতে চান, তখন বিভিন্ন সমস্যার তৈরি হতে পারে। ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, এই সমস্যাগুলোকে খুবই দক্ষতার সাথে সামাল দেয়।

ডেটাবেজ হলো কোনো বিষয় সম্পর্কিত সুসংগঠিত ডেটা বা উপাত্তের সমাবেশ। এ জন্য ডেটাবেজকে তথ্য ভান্ডার বলা হয়। সাম্প্রতিককালে ডেটাবেজ সিস্টেম ডেটা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে সরকারি, বেসরকারি এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে। এর ফলে প্রয়োজনীয় যে কোনো তথ্য সহজে এবং দ্রুত পাওয়া যাচ্ছে।

৪.১ ডেটাবেজ ও রিলেশনাল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (RDBMS) এর ধারণা পরিচিতি, প্রকারভেদ ও ব্যবহার

ডেটাবেজ ও এর ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে মূল আলোচনায় যাবার পূর্বে ডেটা এবং তথ্য সম্পর্কে দু'একটি কথা জেনে নেয়া যাক। Datum ল্যাটিন শব্দ থেকে Data শব্দের উৎপত্তি। Datum এক বচন, আর Data হচ্ছে বহুবচন। Datum অর্থ হচ্ছে সিঙ্গেল কোন এন্টিটি বা সিঙ্গেল কোন একটি ঘটনার অবস্থান (বিন্দু)। এজন্য Datum কে Data Points-ও বলা হয়। ডাটার বাংলায় আভিধানিক অর্থ হলো উপাত্ত। সাধারণ অর্থে ডাটা বলতে কোন কিছুর মান (Value) বা মানের সমষ্টিকে বুঝায়। এ জন্য আমরা ডেটাকে বলি কাঁচামাল বা raw materials, আর তথ্যকে বলি meaningful data অর্থাৎ ডেটাকে প্রক্রিয়াকরণের ফলে যে অর্থপূর্ণ ফলাফল পাই তা'ই হলো তথ্য। আবার এই অসংখ্য তথ্য নিয়ে যে ডেটার ভান্ডার তা'ই হলো ডেটাবেজ।

৪.১.১ ডেটাবেজ (Database)

ডেটা শব্দের অর্থ উপাত্ত এবং বেজ শব্দের অর্থ ভান্ডার বা সমাবেশ। সুতরাং ডেটাবেজ হলো উপাত্তসমূহের সুসংঠিত এবং যৌক্তিক সমাবেশ (A database is a collection of data that are logically organized).

According to Oxford Dictionary "A structured set of data held in a computer, especially one that is accessible in various ways."

বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকের শুরুতে 'ফাইল কন্ট্রোল সার্ভিস' ব্যবহার করে প্রথম ডাটাবেজ ব্যবহার শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৭০ সালে Ted Codd-এর প্রবন্ধ প্রকাশের পর 'ডাটাবেজ ম্যাজেমেন্ট সিস্টেম'-এ টেবিলের মাধ্যমে ডাটা উপস্থাপনের ধারণা ব্যবহারের কথা বলেন। যার ফলে ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নুতন ধারণা জনপ্রিয় হয়ে উঠে। বর্তমানে ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন মডেল ব্যবহৃত হচ্ছে।

ডেটাবেজে বিভিন্ন ধরনের ফাইল সুশৃংখলভাবে সংরক্ষণ করে রাখা হয় যাতে খুব সহজেই ডেটাকে প্রয়োজন অনুসারে খুঁজে বের করা যায়। যেমন- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত শিক্ষার্থীদের ডেটাবেজ। ডেটাবেজের উপাদানগুলো হলো - বিট, বাইট, ফিল্ড, রেকর্ড এবং ফাইল।

নিম্নে ট্রি-ডায়াগ্রামের মাধ্যমে ডেটাবেজের উপাদানগুলো দেখানো হলোঃ

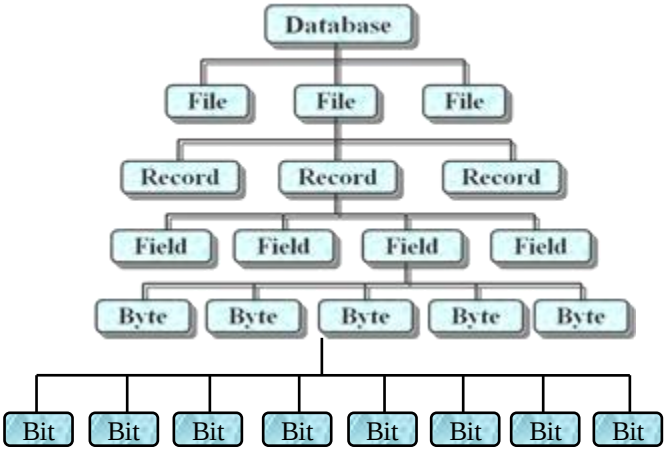

৪.১.২ ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (Database Management System-DBMS)

ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হলো এক ধরনের সফ্টওয়্যার বা কম্পিউটার প্রোগ্রামের সম্ভার যার সাহায্যে ডেটাবেজ তৈরি, সংরক্ষণ, ব্যবহার, পরিবর্তন এবং নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ডেটাবেজ সিস্টেমের মূল উদ্দেশ্য হলো ব্যবহারকারী যাতে সহজে ডেটা সংরক্ষণ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তা ব্যবহার করতে পারে তা নিশ্চিত করা।

Elmarsi & Navathe-এর মতে, "A database management system is a collection of programs that enables users to create and maintain a database."

Korth Silberschatz & Sudarshan-এর মতে, "A databse management system consists of a collection of interrelated data and a set of programs to access those data."

ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (DBMS) এ বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম থাকে যার সাহয্যে ব্যবহারকারী ডেটাবেজের সাথে সংযোগ স্থাপন করে প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করতে পারে।

DBMS এর কাজ (Function of DBMS)

DBMS এর প্রধান কাজগুলো নিম্নরূপ-

১. চাহিদা অনুযায়ী ব্যবহারকারীর জন্য ডেটাবেজ তৈরি করা;

২. ডেটাকে সুশৃংঙ্খল এবং যৌক্তিক উপায়ে সংরক্ষণ করা;

৩. প্রয়োজন অনুযায়ী ডেটাবেজে নতুন নতুন টেবিল যুক্ত করে এর মধ্যে নতুন নতুন ডেটা, রেকর্ড ইত্যাদি সংযুক্ত করা এবং অপ্রয়োজনীয় ডেটা মুছে ফেলা;

৪. প্রয়োজন অনুযায়ী ডেটার ভুল অনুসন্ধান ও সংশোধন করা;

৫. প্রয়োজন অনুযায়ী রেকর্ডসমূহকে যে কোনো ফিল্ডের ভিত্তিতে সংখ্যানুক্রমিক, বর্ণানুক্রমিক বা অন্য কোনোভাবে সাজানো;

৬. একসাথে বহু ব্যবহারকারীকে ডেটা অ্যাকসেস করতে দেওয়ার সুযোগ তৈরি করা;

৭. ডেটা রিডানডেন্সি (Redundancy) বা বাহুল্যতা রোধ করা;

৮. ডেটাবেজ ব্যবহারকারীদের নিয়ন্ত্রণ করা অর্থাৎ অনুমোদন ব্যতীত ডেটাবেজের অ্যাকসেস রোধ করা;

৯. ডেটার নিরাপত্তা তৈরি করা;

১০. প্রয়োজন অনুযায়ী ডেটাবেজের ডেটা প্রিন্ট করা।

DBMS-এর সুবিধা এবং অসুবিধা

DBMS ব্যবহারের বহুবিধ সুবিধা থাকার পাশাপশি এর কিছু অসুবিধাও পরিলক্ষিত হয়। নিচে DBMS এর প্রধান সুবিধাসমূহ এবং অসুবিধাসমূহ দেওয়া হলো।

DBMS-এর সুবিধা

- DBMS ব্যবহার করে ডেটা রিডানডেন্সি বা বাহুল্যতা দূর করা যায়।
- যেহেতু ডেটাবেজে বহু সংখ্যক ফাইল বা টেবিলে ডেটাসমূহ সুসংগঠিত থাকে তাই খুব দ্রুত যেকোনো রেকর্ড অনুসন্ধান করা যায় এবং বিভিন্ন ধরনের রিপোর্ট তৈরি ও প্রিন্ট নেয়া যায়।
- ডেটা শেয়ারিং করার সুযোগ থাকায় বহু ব্যবহারকারী একই সময়ে একই ডেটাবেজে অ্যাকসেস করতে পারে।
- ডেটাবেজ থেকে ডেটা অ্যাকসেস করার জন্য ব্যবহারকারীদের ভিন্ন ভিন্ন পাসওয়ার্ড প্রদানের মাধ্যমে অবৈধ ব্যবহার রোধ করা যায়।

DBMS-এর অসুবিধা

- ডেটাবেজ পদ্ধতি পরিচালনার জন্য ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বাস্তবায়ন অধিক ব্যয় সাপেক্ষ হয়।
- সুসংঠিতভাবে ডেটাকে সংরক্ষণ করতে না পারলে অনেক সময় ডেটা প্রসেসিং এর গতি হ্রাস পায়।
- ডেটাবেজ ম্যানেজম্যান্ট সিস্টেম সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য দক্ষ জনবল প্রয়োজন।

৪.১.৩ রিলেশনাল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (Relational Database Management System- RDBMS)

কতগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত টেবিল বা ফাইল নিয়ে গঠিত ডেটাবেজকে রিলেশনাল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (RDBMS) বলে অর্থাৎ রিলেশনাল ডেটাবেজ একই সঙ্গে একাধিক টেবিলের মধ্যে যৌক্তিক উপায়ে সম্পর্ক তৈরি করে। এ পদ্ধতি সর্বপ্রথম ১৯৭০ সালে IBM কোম্পানিতে Edgar Codd প্রবর্তন করেন। চমৎকার গাণিতিক সূত্রের মাধ্যমে তিনি ডেটাবেজকে উপস্থাপন করেন। তার সূত্র অনুযায়ী সকল ডেটাকে টেবিলের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে। রিলেশনাল ডেটাবেজ তৈরি করার জন্য বিভিন্ন ধরনের সফ্টওয়্যার রয়েছে। বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি সফ্টওয়্যার হলো- মাইক্রোসফ্ট অ্যাক্সেস (Microsoft Access), IBM ডিবি ২ (IBM DB 2), ওরাকল (Oracle), মাইএসকিউএল (MySQL) ও মাইক্রোসফ্ট SQL সার্ভার ।

৪.১.৪ RDBMS এর বৈশিষ্ট্য (Characteristics of RDBMS)

১. এ পদ্ধতিতে সহজেই একাধিক টেবিল তৈরি এবং এদের মধ্যে যৌক্তিক সম্পর্ক স্থাপন করা যায়।

২. টেবিলের মধ্যে সহজেই ডেটা এন্ট্রি (Add), পরিবর্তন (Modify) ও বাদ (Delete) করা যায়।

৩. একই ডেটাবেজে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন টেবিলের ডেটা সহজেই আদান-প্রদান করা যায় এবং এক ডেটাবেজ থেকে অন্য ডেটাবেজ এ ডেটা বিনিময় করা যায়।

৪. প্রয়োজনীয় তথ্য কুয়েরির মাধ্যমে সহজেই খুঁজে বের করা ও রিপোর্ট তৈরির মাধ্যমে তা প্রিন্ট করা যায়।

৫. ডেটাসমূহের উপর বিভিন্ন ধরনের গাণিতিক ও যুক্তিমূলক কাজ করা যায়।

৬. রিপোর্টের মধ্যে প্রয়োজনীয় চার্ট, গ্রাফ, ইমেজ ও ওয়ার্কশিট সংযোজন করা যায়।

৭. ডেটা এন্ট্রির জন্য বিভিন্ন ধরনের গ্রাফিক্যাল ফরম তৈরি করা যায়।

৮. ভুল ডেটা এন্ট্রি প্রতিরোধে বিভিন্ন ভ্যালিডেশনের নিয়ম (Validation Rule) ব্যবহার করা যায়।

৪.১.৫ RDBMS এর ব্যবহার (Uses of RDBMS)

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির অসামান্য উন্নতির সাথে সাথে রিলেশনাল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ব্যবহার দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। RDBMS ব্যবহার করে বর্তমানে প্রায় প্রতিটি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের বিশাল তথ্য ভান্ডারকে সহজেই সংরক্ষণ ও ব্যবহার করছে।

নিম্নে RDBMS এর প্রধান প্রধান ব্যবহারগুলি দেওয়া হলো-

১. স্কুল, কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তথ্য সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়;
২. ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে গ্রাহকের তথ্য ও হিসাব-নিকাশ সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়;
৩. মোবাইল কোম্পানিগুলোতে গ্রাহকদের তথ্য সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়;
৪. বিভিন্ন সুপার শপে দ্রব্যের বিবরণ, মূল্য, ক্রয়-বিক্রয়, লাভ-লোকসান ইত্যাদি রেকর্ডসমূহ সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়;
৫. হাসপাতালে রোগী ও ডাক্তারদের প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়;
৬. বিভিন্ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের ফলাফল সংরক্ষণে ও অনলাইনে প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়;
৭. বাস, ট্রেন ও বিমানের যাত্রার সময়সূচি ও আসন-সংরক্ষণের তথ্য সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়;
৮. দেশের জনসংখ্যার তথ্য সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়;
৯. ই-কমার্স, ই-লার্নিং, ই-গর্ভমেন্ট, এম-কমার্স ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত তথ্যসমূহ সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়;
১০. পেরোল (Payroll) বা বেতন সিস্টেমে ব্যবহৃত হয়।

Microsoft Access হচ্ছে Relational Database Management System (RDBMS) তৈরির Microsoft Office suite-এর একটি প্রোগ্রাম। MS Access 2007-এর পূর্বে এর ফাইল এক্সটেনশন ছিল *.mdb। বর্তমানে MS Access-এর ফাইল এক্সটেনশন হচ্ছে *.accdb। নিচে MS Access 2016-এর উইন্ডোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রদত্ত হলো।

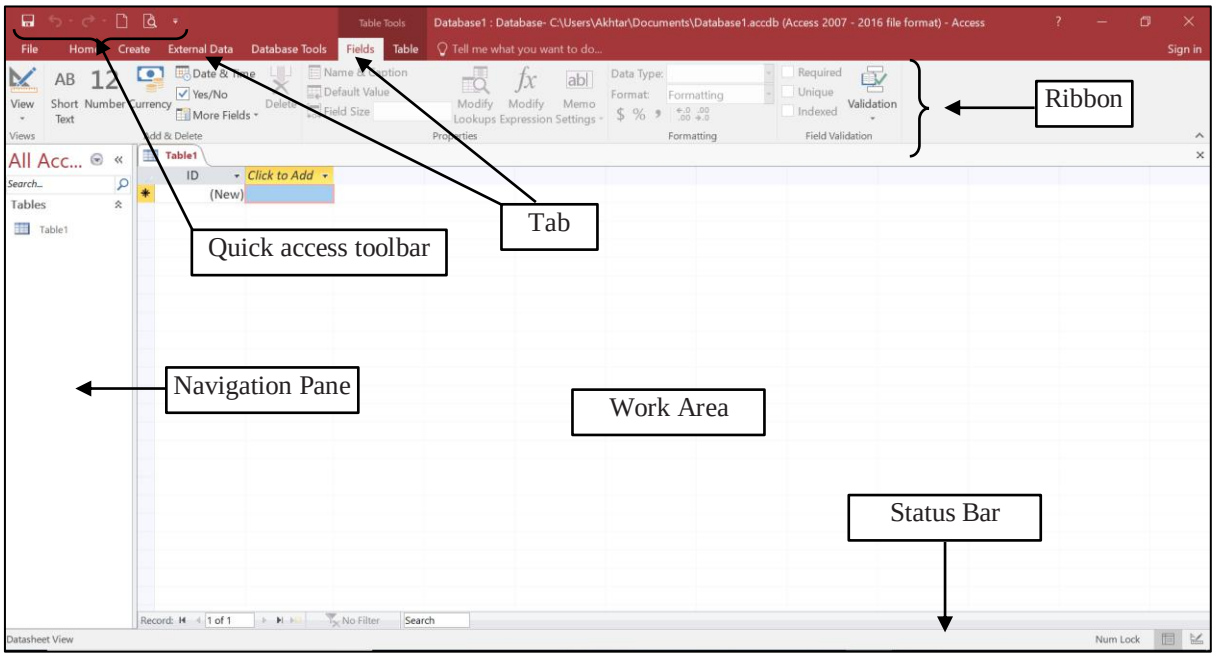

চিত্র : MS Access 2016-এর উইন্ডো

৪.২ টেবিল, ফিল্ড, রেকর্ড, ফর্ম, কুয়েরি, রিপোর্ট

ডেটাবেজ ব্যবস্থাপনায় কতিপয় আইটেম সম্পর্কে জানা দরকার।

বিট (Bit): ডেটার সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম একক হলো বিট। কোনো ডেটাকে কম্পিউটারে প্রেরণের পর কম্পিউটার তা বিটে রূপান্তর করে। বিটের দুটি অবস্থা হলো 0 ও 1 যা বাইনারি অঙ্ক (digit) নামে পরিচিত।

বাইট (Byte): প্রতি ৮টি বিট নিয়ে এক বাইট বা ক্যারেক্টার (অক্ষর) গঠিত হয় অর্থাৎ প্রতিটি ক্যারেক্টার (A, B, ... , 1, 2, ... , @, &, ... ইত্যাদি) কে কম্পিউটার ৮ বিটে রূপান্তর করে। যেমন- A (01000001)

ফিল্ড (Field): অনেকগুলি ক্যারেক্টার বা বাইট নিয়ে গঠিত হয় ফিল্ড। যেমন- Abir। এখানে Abir নামটির মধ্যে 4 বাইট (32 বিট) বা 4টি ক্যারেক্টার আছে।

টেবিল: এক বা একাধিক ফিল্ডের সমষ্টি এবং একটি ডাটাবেজের আন্ডারে তৈরি হয় এক বা একাধিক টেবিল। একটি টেবিল তৈরি করার জন্য অবশ্যই ন্যূনতম একটি ফিল্ডের প্রয়োজন হবে।

রেকর্ড (Record): অনেকগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ফিল্ড নিয়ে গঠিত হয় রেকর্ড। যেমন-

Name	Roll No	Tel
Abir	1	888777

রেকর্ড

ফরম (Forms): ডেটা টেবিলে ডেটা এন্ট্রি কীভাবে হবে এবং কি আকারে ডাটা প্রদর্শিত হবে সেটি ফরম ডিজাইনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এছাড়া টেবিল/কোয়েরী থেকে কোন কোন ফিল্ড নিয়ে ফরম তৈরি হবে তাও নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

কুয়েরি (Query): ডেটাবেজের কোনো একটি ডেটা টেবিলে বিপুল পরিমাণ ডেটা থাকতে পারে। এই বিপুল পরিমাণ ডেটা থেকে কুয়েরির সাহায্যে খুব সহজেই প্রয়োজনীয় ডেটা খুঁজে বের করা যায়। কোনো টেবিলে সংরক্ষিত বিপুল পরিমাণ ডেটা থেকে প্রয়োজনীয় ডেটা খুঁজে বের করার কার্যকরী ব্যবস্থাকে কুয়েরি বলে।

রিপোর্ট (Report): ডাটাবেজ টেবিলের তথ্যাবলী সাজিয়ে প্রিন্ট করার উপযোগী করার জন্যই রিপোর্ট তৈরি করতে হয়।

ফাইল (File): অনেকগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত রেকর্ড নিয়ে গঠিত হয় ফাইল। যেমন-

Name	Roll No	Tel
Abir	1	888777
Tafia	2	999777
Simon	3	666777

টেবিল

সুতরাং পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এক বা একাধিক ফাইল বা টেবিল নিয়ে গঠিত হয় ডেটাবেজ।

এনটিটি (Entity): কোনো ডেটাবেজের বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য যে সব রেকর্ড ব্যবহার করা হয় তাকে এনটিটি বলে। এনটিটি যেমন বাস্তব উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে হতে পারে আবার শুধুমাত্র ধারণার উপর ভিত্তি করেও হতে পারে। যেমন- একজন শিক্ষকের নাম, পদবি, বয়স, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর ইত্যাদির সমন্বয়ে তৈরি হয় এনটিটি।

এনটিটি সেট (Entity set): এনটিটি সেট হলো সমজাতীয় এনটিটির সমাবেশ অর্থাৎ ডেটাবেজের অর্ন্তগত ডেটা ফাইল বা টেবিল সমূহকে এক একটি এনটিটি সেট বলা হয়।

অ্যাট্রিবিউট (Attribute): কোনো একটি এনটিটি সেটের যে প্রোপার্টিজগুলো ঐ এনটিটির বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ করে এবং যার উপর ভিত্তি করে উপাত্ত গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ করা হয় তাকে অ্যাট্রিবিউট বলে। যেমন- একজন শিক্ষকের নাম, পদবি, বয়স, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর ইত্যাদি প্রতিটি পৃথকভাবে এক একটি অ্যাট্রিবিউট। অনেক সময় অ্যাট্রিবিউটকে ডেটা আইটেম, ডেটা উপাদান, ডেটা ফিল্ড, ফিল্ড, আইটেম, অবজেক্ট প্রোপার্টি ইত্যাদি বলা হয়।

অ্যাট্রিবিউট ভ্যালু বা মান (Attribute value): একটি এনটিটি সেটের প্রত্যেকটি অ্যাট্রিবিউটের একটি নির্দিষ্ট মান থাকে। অ্যাট্রিবিউটের এ মানকে তার ভ্যালু বলে। যেমন- Student_info একটি এনটিটি সেট যার অ্যাট্রিবিউটগুলি হলো Name, Roll No ও Tel। এখানে Name অ্যাট্রিবিউটের মান হলো- Abir, Tafia ও Simon, আবার Roll No অ্যাট্রিবিউটের মান হলো-1, 2 ও 3 এবং Tel অ্যাট্রিবিউটের মান হলো- 888777, 999777 ও 666777।

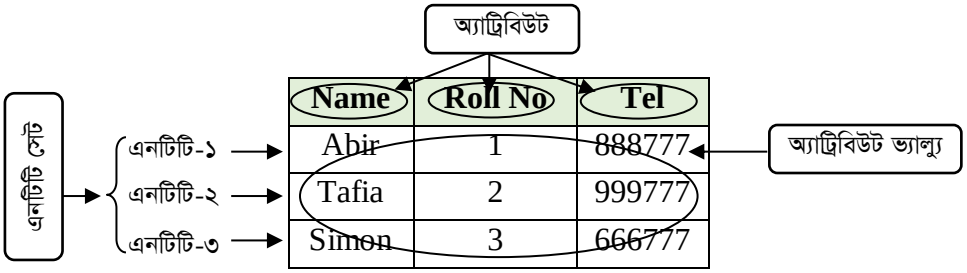

চিত্র : Student_info টেবিল

কী ফিল্ড (Key Field) : কী হচ্ছে সম্পর্কযুক্ত ডাটাবেজের গুরুত্বপূর্ণ সেতু বন্ধন। যে ফিল্ডের ভিত্তিতে কোনো ফাইল বা টেবিলের রেকর্ড শনাক্ত করা হয় তাকে কী ফিল্ড বলে। কী ফিল্ড তিন প্রকার। যথা–

ক. প্রাইমারি কী (Primary Key)

খ. কম্পোজিট প্রাইমারি কী (Composite Primary Key)

গ. ফরেন কী (Foreign Key)

ক. প্রাইমারি কী : প্রতিটি টেবিল বা ফাইলে এক বা একাধিক সাধারণ ফিল্ড থাকতে পারে। কিন্তু প্রতিটি টেবিলে একটি স্বতন্ত্র (Unique) ফিল্ড থাকতে হবে যার ডেটাগুলো একই অর্থাৎ ডুপ্লিকেট হতে পারবে না এবং এ কী-এর অধীনে যে ফিল্ডগুলো থাকবে তা কখনোই ফাঁকা (Null) রাখা যাবে না। এ ফিল্ডকে প্রাইমারি কী বলে। যেমন - শিক্ষার্থীদের ভর্তি ফাইলে রোল নম্বর ফিল্ডকে প্রাইমারি কী ফিল্ড হিসাবে ব্যবহার করা যায়। কারণ একজন শিক্ষার্থীর রোল নম্বরের সাথে অন্যজন শিক্ষার্থীর রোল নম্বরের কোনো মিল থাকে না। নিচে শিক্ষার্থীদের ভর্তি ফাইলে প্রাইমারি কী ফিল্ড দেখানো হলো।

Student_ID	Student_Name	Section	City
101	Jim	A	Dhaka
102	Jenny	A	Khulna
103	Afrin	A	Dhaka
104	Tim	A	Jessore
105	Tina	A	Sylhet

উপরোক্ত টেবিলে Student_ID কে প্রাইমারি কী ফিল্ড হিসেবে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে।

খ. কম্পোজিট প্রাইমারি কী : যখন কোনো টেবিল বা ফাইলে কোনো একটি ফিল্ড দ্বারা রেকর্ডসমূহকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায় না সেক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক ফিল্ড মিলে যদি রেকর্ডসমূহকে স্বতন্ত্রভাবে (Uniquely) চিহ্নিত করা যায় তাহলে ঐ ফিল্ডসমূহকে একত্রে প্রাইমারি কী হিসেবে ডিক্লেয়ার করতে হয়। সুতরাং একই টেবিলে দুই বা ততোধিক ফিল্ডকে প্রাইমারি কী হিসেবে ডিক্লেয়ার করলে তাকে কম্পোজিট প্রাইমারি কী বলে। নিচের টেবিলে Product_ID ও Manufactuter একত্রে কম্পোজিট প্রাইমারি কী ফিল্ড হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

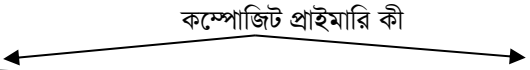

Product_ID	Product _Name	Price	Manufactuter
101	TV	25000	Sony
101	TV	40000	Samsung
102	Fridge	50000	Sony
103	Mobile	20000	Samsung
103	Mobile	25000	Sony

গ. ফরেন কী ফিল্ড : যদি কোনো টেবিলের প্রাইমারি কী ফিল্ড অন্য কোনো টেবিলের সাধারণ ফিল্ড হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে প্রথম টেবিলের প্রাইমারি কী-কে দ্বিতীয় টেবিলের জন্য ফরেন কী বলে।

প্রাইমারি কী

T_ID	T_Name	Designation
1100	Mustafiz	Professor
1101	Afia	Professor
2200	Rasel	Lecturer
2201	Ayesha	Lecturer
3300	Amir	Professor

টেবিল ১

ফরেন কী

S_Code	S_Title	T_ID
1100	Bangla I	1100
1101	Bangla II	1101
2200	English I	2200
2201	English II	2201
3300	Computer	3300

টেবিল ২

উপরোক্ত টেবিল ১ এ প্রাইমারি কী হলো T_ID এবং টেবিল ২ তে প্রাইমারি কী হলো S_Code। টেবিল ১ এর প্রাইমারি কী টেবিল ২ এর জন্য ফরেন কী হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ফরেন কী সাধারণত দুইটি টেবিলের মধ্যে রিলেশন তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহারিক কাজ:

শ্রেণির ১৫ জন সহপঠির ব্যক্তিগত তথ্য নিয়ে একটি টেবিল তৈরি করে এর মধ্যে এনটিটি, এনটিটি সেট, এট্রিবিউট, এট্রিবিউট ভ্যালু ও প্রাইমারি কী চিহ্নিত করুন।

৪.৩ টেবিল তৈরি,ডাটা এন্ট্রি, বিদ্যমান টেবিলে নতুন রেকর্ড প্রবেশ করানো, রেকর্ড মুছে ফেলা, নতুন ফিল্ড যোগকরা

মাইক্রোসফ্ট একসেস্ (Mirosoft Access) ব্যবহার করে সহজেই ডেটাবেজ তৈরি করা যায়। Microsoft Access 2016 ওপেন করার ধাপগুলি নিম্নে দেওয়া হলো -

১. ডেস্কটপের Start বাটনে ক্লিক করার পর Start মেনু থেকে All Programs / Programs এ ক্লিক করতে হবে।

২. অতঃপর প্রোগ্রামের তালিকা থেকে Mirosoft Office Access 2016 এ ক্লিক করতে হবে ।

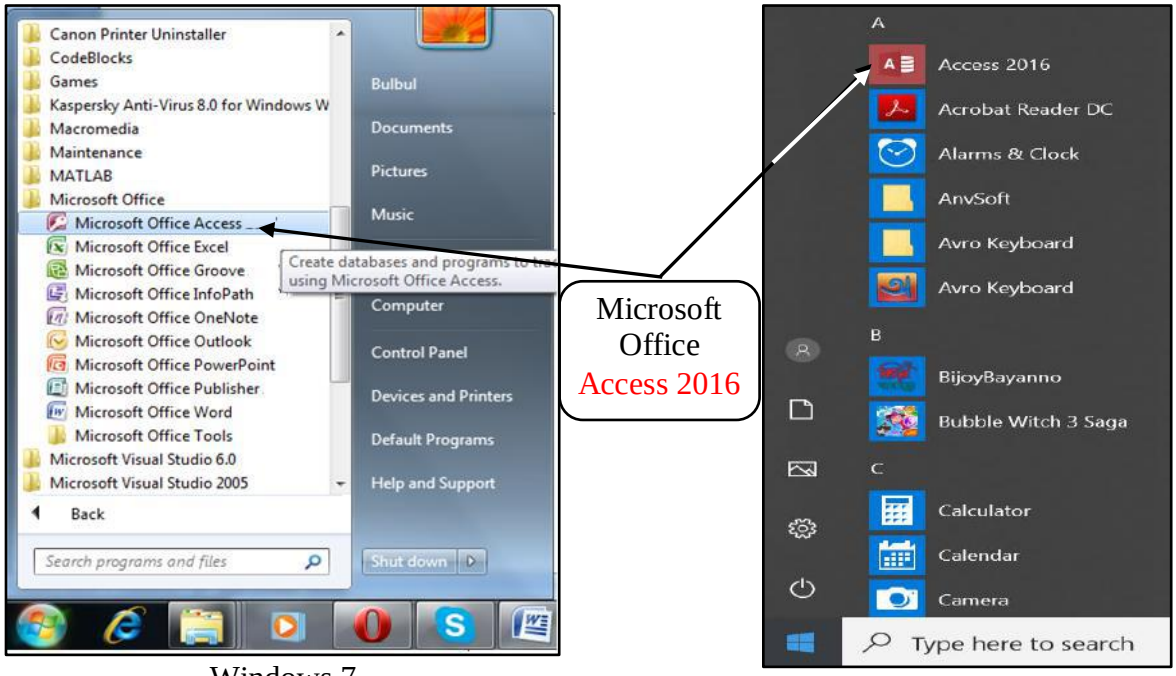

Windows 7 Windows 10

চিত্র: **Mirosoft Access** ওপেন করার ধাপসমূহ

৩. Mirosoft Office Access এ ক্লিক করার পর নিচের চিত্রের মতে একটি উইন্ডো আসবে।

চিত্র: Blank Database ক্রিয়েট করার ধাপসমূহ

৪. উপরের চিত্রে Blank Database এ ক্লিক করার পর নিচের ডান দিকে প্রদর্শিত File Name এর বক্সে একটি নাম যেমন- College লিখে Create বাটনে এ ক্লিক করতে হবে। তাহলে College নামে একটি ডেটাবেজ তৈরি হবে এবং একটি ডিফল্ট টেবিল যেমন- Table1 তৈরি হবে।

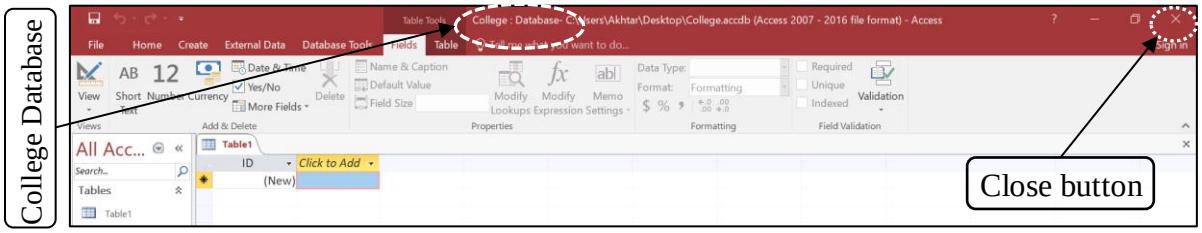

৫. এবার গোল চিহ্নিত স্থানে (Close button) ক্লিক করে টেবিল উইন্ডোটি বন্ধ করি।

এবার আমাদের তৈরিকৃত College ডেটাবেজে টেবিল তৈরি করার পূর্বে নিম্নোক্ত মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে নেই:

ডেটা টাইপ (Data type): ডেটার ধরনকে ডেটা টাইপ বলে। একটি টেবিল তৈরি করার সময় ইচ্ছে করলেই যেকোনো ডেটা এন্ট্রি দেওয়া যায় না। এজন্য ডেটার ধরন নির্ধারণ করতে হয়। ডেটার টাইপ বা প্রকৃতি বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যেমন- শর্ট টেক্সট, লং টেক্সট, নাম্বার, তারিখ/সময়, কারেন্সি, ইয়েস/নো ইত্যাদি। নিম্নে বহুলব্যবহৃত কয়েকটি ডেটা টাইপ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

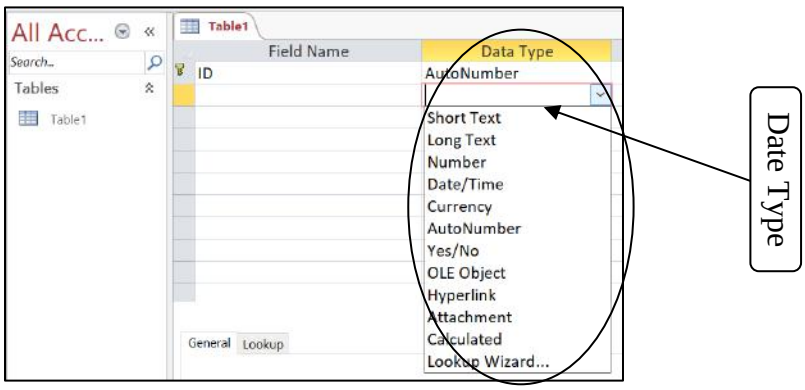

চিত্র: ডেটা টাইপ-এর তালিকা

- **শর্ট টেক্সট (Short Text):** টেক্সট টাইপ ডেটা বা টেক্সট ও কোন ক্যালকুলেশনের দরকার নেই এরূপ নম্বর একত্রে এন্ট্রি করার জন্য Short Text ডেটা টাইপ সিলেক্ট করতে হবে। এ ফিল্ডে সর্বোচ্চ 255 টি ক্যারেক্টার এন্ট্রি দেওয়া যায়। ক্যারেক্টার বলতে এখানে যে কোনো অক্ষর, চিহ্ন, সংখ্যা বা নম্বর ইত্যাদি বুঝায়। যেমন- NUB, Basic_Salary, MI007, House#54, Tareq ইত্যাদি।

- **লং টেক্সট** (Long Text)**:** অনেক বেশি টেক্সট বা টেক্সট ও কোন ক্যালকুলেশনের দরকার নেই এরূপ নম্বর একত্রে এন্ট্রি করার জন্য Long Text ডেটা টাইপ সিলেক্ট করতে হবে। এ ফিল্ডে 63 টি থেকে সর্বোচ্চ 999 টি ক্যারেক্টার এন্ট্রি দেওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী ভার্সনে প্রথমটিকে টেক্সট এবং দ্বিতীয়টিকে মেমো বলা হত।
- **নাম্বার** (Number)**:** যদি সংখ্যাবাচক ডেটা ব্যবহার করে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি করার প্রয়োজন হয় তাহলে Number ডেটা টাইপ সিলেক্ট করতে হবে। অর্থাৎ গাণিতিক হিসাব নিকাশের ক্ষেত্রে সংখ্যাবাচক ডেটা ব্যবহার হয়।
- **তারিখ ও সময়** (Date/Time)**:** তারিখ ও সময় সম্পর্কিত ডেটা এন্ট্রি করার প্রয়োজন হলে Date/Time ডেটা টাইপ সিলেক্ট করতে হবে।
- **কারেন্সি** (Currency)**:** যদি কোনো ফিল্ডে শুধুমাত্র মুদ্রা বা টাকা সংক্রান্ত ডেটা এন্ট্রি করার প্রয়োজন হয় তাহলে Currency ডেটা টাইপ সিলেক্ট করতে হয়। এতে ১ থেকে ৪ ডেসিমেল ঘর পর্যন্ত ক্যালকুলেশন করা যায়।
- **অটো নাম্বার** (Auto Number)**:** যদি রেকর্ডের পর্যায়ক্রমিক নাম্বারিং করার প্রয়োজন হয় তাহলে Auto Number ডেটা টাইপ সিলেক্ট করতে হবে। এটি সিলেক্ট করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে (Automatically) ধারাবাহিক নাম্বার (1, 2, 3, 4, ...) আসবে। এটি একটি নাম্বার ডেটা টাইপ।
- **ইয়েস/নো** (Yes/No)**:** অনেক সময় এমন কিছু ডেটা আছে যেগুলি শুধু সত্য বুঝানোর জন্য হ্যাঁ এবং মিথ্যা বুঝানোর জন্য না ব্যবহার করলেই হয় সেক্ষেত্রে Yes/No ডেটা টাইপ সিলেক্ট করতে হবে। এ ফিল্ডে একটি মাত্র বর্ণ যেমন- Yes এর জন্য Y, No এর জন্য N, True এর জন্য T, False এর জন্য F ব্যবহার করা হয়।
- **OLE Object:** বিভিন্ন প্রোগ্রামের অবজেক্ট (যেমন- MS-Word, MS-Excel, PowerPoint, Photoshop ইত্যাদি) থেকে যদি গ্রাফ, চার্ট, ছবি, টেক্সট ইত্যাদি সংযোজনের প্রয়োজন হয় তাহলে OLE (Object Linking and Embedding) ডেটা টাইপ সিলেক্ট করতে হবে। এতে ২ জিবি পর্যন্ত ডাটা সংযোজন করা যায়।
- **হাইপারলিঙ্ক** (Hyperlink)**:** সাধারণত ওয়েব পেইজের কোনো ফাইলের সাথে ডেটাবেজের কোনো ফাইলের লিঙ্ক করার প্রয়োজন হলে Hyperlink ডেটা টাইপ সিলেক্ট করতে হয়।
- **এটাচমেন্ট** (Attachment)**:** ডিজিটাল ফটো, কোন ফাইল ইত্যাদি রেকর্ডে যুক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এ ধরণের ডাটা টাইপ পূর্ববর্তী ভার্সনে ছিল না। এতে ২ জিবি পর্যন্ত ডাটা সংযোজন করা যায়।
- **লুক-আপ উইজার্ড (**Lookup Wizard**):** যদি ডেটা ফিল্ডে লিখে ডেটা এন্ট্রি না করে অর্থাৎ লিস্ট বা তালিকা থেকে পছন্দনীয় মান সংযোজন করতে চাওয়া হয় তাহলে Lookup Wizard ডেটা টাইপ সিলেক্ট করতে হয়।

ডেটা ফিল্ড ডেসক্রিপশন (Data Field Description) **:**

অনেক সময় ফিল্ডের নাম সংক্ষিপ্ত করে লিখা হয় (যেমন- Student ID তে S_ID লিখা)। এ ক্ষেত্রে এ ফিল্ডটির সম্পূর্ণ নাম বা এর সম্পর্কে কিছু লিখে রাখতে চাইলে Description ফিল্ডে তা লিখে রাখতে হয়। সংক্ষিপ্ত করে লিখা ফিল্ডটি সম্পর্কে এ তথ্য যে কোনো সময় দেখা যায়। ডেটা টেবিল ডিজাইনের তৃতীয় কলামে Description ফিল্ডটি পাওয়া যাবে। এটা একটি ঐচ্ছিক অংশ।

Student_Info

Field Name	Data Type	Description (Optional)
ID	AutoNumber	
S_ID	Short Text	Student's ID Number
S_Name	Short Text	Student's Name
Address	Short Text	Address of Student
Phone	Number	Phone of Student

Description

চিত্র: Data Field Description-এর নমুনা

ডেটা টাইপ প্রোপার্টিজ (Data Type Properties) **:**

প্রতিটি ডেটা টাইপ এর উপর ভিত্তি করে প্রতিটি ফিল্ডের জন্য নির্দিষ্ট কিছু প্রোপার্টিজ থাকে। প্রোপার্টিজ থেকে ফিল্ডের আকৃতি, ইনডেক্স, ডেটাসমূহ কীভাবে প্রদর্শিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয়।

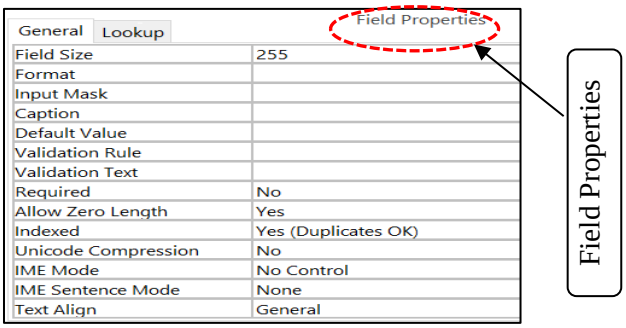

চিত্রঃ Field Properties-এর তালিকা

নিচে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ডেটা টাইপ প্রোপার্টিজ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

- **Field Size** : এক এক ফিল্ডে এক এক সাইজের ডেটা এন্ট্রি দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। কোনো ফিল্ডের সাইজ বা আকার কত হবে অর্থাৎ সর্বোচ্চ কতটি ক্যারেক্টার বা অক্ষর লিখার প্রয়োজন হবে তা এখানে লিখে দিতে হয়।
- **Format** : মুদ্রা বা টাকা সংক্রান্ত ডেটা এন্ট্রির জন্য Currency সিলেক্ট করতে হয়। এখানে Format বক্সে ক্লিক করার পর ডানদিকে Drop Down Key তে ক্লিক করে প্রয়োজনীয় Currency Format সিলেক্ট করা যায়।
- **Input Mask** : Input Mask এর সাহায্যে টেক্সট বক্সে ভ্যালু এন্ট্রি করা যায়। এর জন্য Field Properties এর Input Mask বক্সে নির্দিষ্ট ক্যারেক্টার এন্ট্রি করতে হবে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ক্যারেক্টারের ব্যবহার নিচের টেবিলে দেওয়া হলো-

Character	Description
0	0 থেকে 9 সংখ্যা এন্ট্রি করা যাবে। তবে কোনো যোগ (+) ও বিয়োগ (–) চিহ্ন এন্ট্রি করা যাবে না।
9	স্পেস এবং যে কোনো সংখ্যা এন্ট্রি করা যাবে । তবে কোনো যোগ (+) ও বিয়োগ (–) চিহ্ন এন্ট্রি করা যাবে না।
#	স্পেস, যে কোনো সংখ্যা, যোগ (+) ও বিয়োগ (–) এন্ট্রি করা যাবে।
L	A থেকে Z পর্যন্ত যে কোনো অক্ষর এন্ট্রি করা যাবে।
A	সংখ্যা এবং অক্ষর উভয়ই এন্ট্রি করা যাবে ।
&	স্পেস এবং যে কোনো ক্যারেক্টার এন্ট্রি করা যাবে।
<	ছোট হাতের অক্ষর (Lowercase) নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে যা-ই এন্ট্রি দেওয়া হোক না কেন তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছোট হাতের অক্ষরে রূপান্তরিত হবে।
>	বড় হাতের অক্ষর (Uppercase) নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে যা-ই এন্ট্রি দেওয়া হোক না কেন তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বড় হাতের অক্ষরে রূপান্তরিত হবে।

- **Caption** : ফিল্ড নেম টাইপ করার সময় এটি সংক্ষেপে টাইপ করলেও Caption Property তে ঐ ফিল্ড সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ লিখা যায়। এর ফলে টেবিলকে Datasheet View তে ওপেন করলে ফিল্ড এর বিস্তারিত বিবরণ হেডিং হিসেবে প্রদর্শিত হবে ফিল্ড নেম এর পরিবর্তে ।
- **Default Value** : অনেক সময় কোনো কোনো কলামের প্রতিটি ফিল্ডে একই ডেটা লিখতে হয়। এ অবস্থায় Default Value বক্সে নির্দিষ্ট ডেটাটি লিখে দিলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট ফিল্ডের ডেটা হিসেবে ইনপুট হবে অর্থাৎ ডেটাটি বারবার লিখতে হবে না। এখানে উল্লেখ্য যে, Auto Number এবং OLE object ব্যতীত সকল ফিল্ডের জন্য ডিফল্ট ভ্যালু সেট করা যায় ।
- **Validation Rule :** কোনো ফিল্ডের মধ্যে ডেটা এন্ট্রি যদি কোনো শর্তের উপর নির্ভর করে হয় তাহলে Validation Rule এর বক্সে শর্তটি লিখে দিতে হয়। এর ফলে শর্তের বাহিরে ডেটা এন্ট্রি দিলে Error Message দিবে এবং ডেটাটি এন্ট্রি নিবে না।

- **Validation Text :** Validation Rule এর বক্সে শর্ত সেট করার পর ভুল ডেটা এন্ট্রি করলে কি Error Message দেখাবে তা এখানে লিখে দেওয়া যায় ।
- **Indexed :** ডেটা এন্ট্রি যেভাবেই করা হউক না কেন তা যেন পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে ডেটা ফাইলে প্রদর্শিত হয় এর জন্য Indexed Property তে default ভ্যালু No এর পরিবর্তে Yes সিলেক্ট করতে হয় ।

ডেটাবেজ টেবিল তৈরি: টেবিল তৈরি করার ধাপসমূহ নিম্নরূপ-

১. টেবিল তৈরির জন্য Create ট্যাব-এর রিবন থেকে Table Design-এ ক্লিক করতে হবে ।

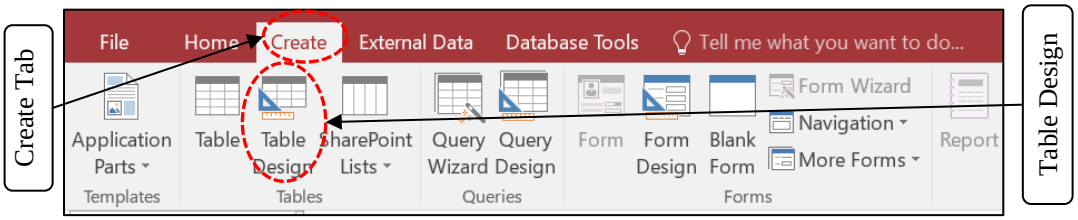

২. এরপর Table Design এ ক্লিক করলে নিচের চিত্রের মতো উইন্ডোটি স্ক্রিনে দেখা যাবে । এ কাজটি ডিফল্ট টেবিলেও করা যাবে বা নুতন টেবিল তৈরি করেও করা যাবে ।

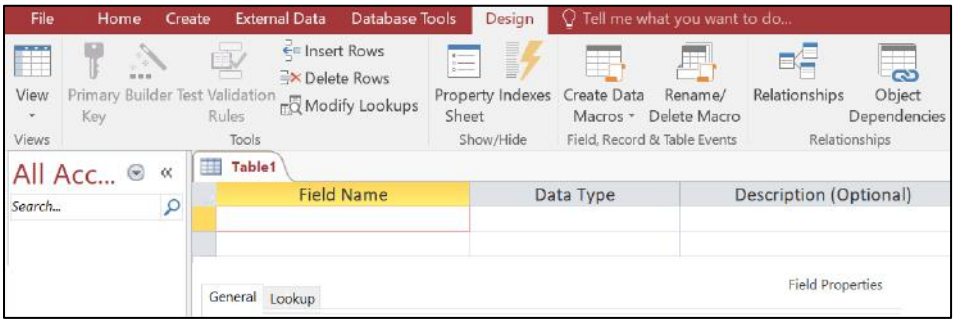

৩. ধরা যাক Student_Info নামে নিচের টেবিলটি তৈরি করতে হবে ।

S_ID	S_Name	Address	Phone
101	Imran	Khulna	555666
102	Hasib	Dhaka	666555
103	Abir	Khulna	777888
104	Tafia	Dhaka	888777
105	Linchi	Jessore	555777

Field Name

৪. এখন Field Name কলামে S_ID, S_Name, Address ও Phone টাইপ করতে হবে এবং S_ID ফিল্ডকে প্রাইমারি কী হিসেবে সেট করতে হবে যাতে একই রেকর্ড একাধিকবার এন্ট্রি দেওয়া না যায় । এখানে উল্লেখ্য যে, যে ফিল্ডটিকে প্রাইমারি কী হিসেবে সেট করা হয় তার পাশে চাবির ছবি প্রদর্শিত হয় ।

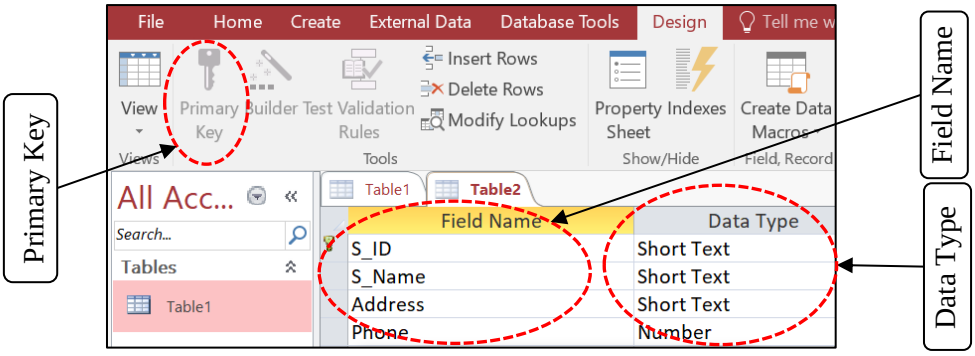

৫. এবার টেবিলটি সেভ করার জন্য কীবোর্ড থেকে Ctrl+S প্রেস করি। তাহলে Save As ডায়ালগ বক্স প্রদর্শিত হবে এবং টেবিল নেম হিসেবে Student_Info লিখে OK বাটনে ক্লিক করলে টেবিলটি Student_Info নামে সেভ হবে। ডিফল্ট টেবিল Table1-কে ডিলিট করে নেই।

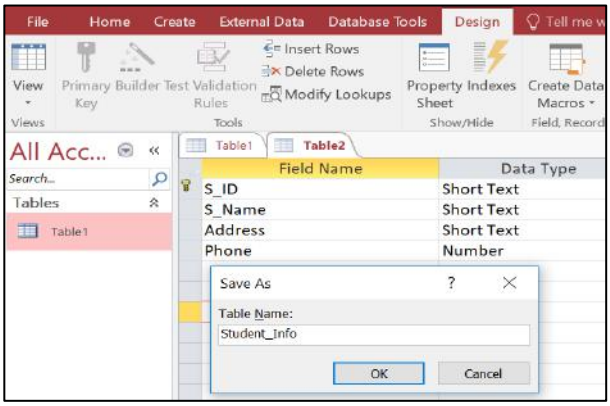

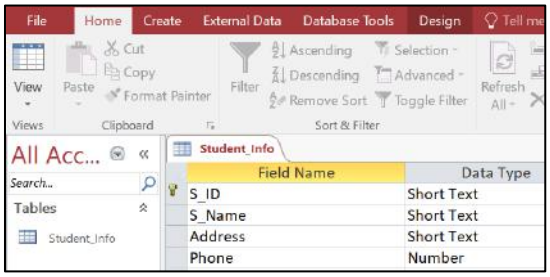

৬. এবার টেবিলে ডেটা এন্ট্রি দেওয়ার জন্য Student_Info টেবিলটিকে ডিজাইন মোড থেকে ডেটাশিট মোডে নিতে হবে। এর জন্য View আইকনে ক্লিক করতে হবে। তাহলে নিচের চিত্রের মত করে প্রদর্শিত হবে।

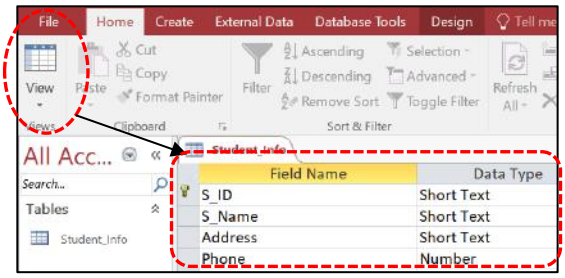

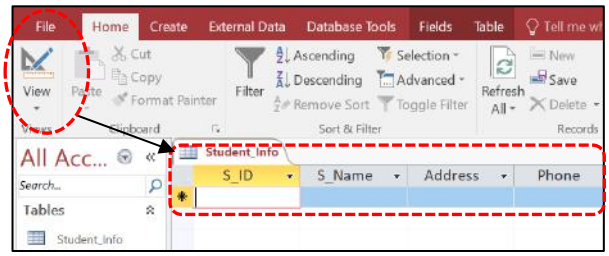

৭. এখন টেবিলে ডেটা এন্ট্রি করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রতিটি রেকর্ড এন্ট্রির ক্ষেত্রে প্রথমেই প্রাইমারি কী ফিল্ড যেমন- S_ID তে ডেটা এন্ট্রি করতে হবে। পর্যায়ক্রমে নিম্নের ডেটাগুলি এন্ট্রি করি। টেবিলে ডেটা এন্ট্রির পর সেগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেভ হয়ে যায়।

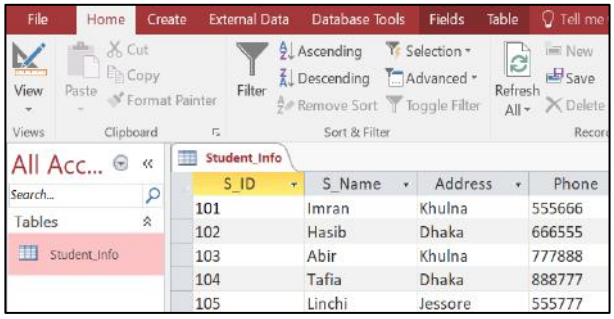

৮. একই নিয়মে নিচের টেবিলগুলি যেমন- Marks, Subject ও Teacher তৈরি করি এবং ডেটা এন্ট্রি করি।

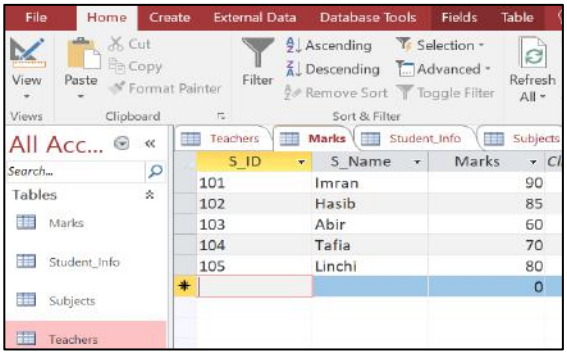

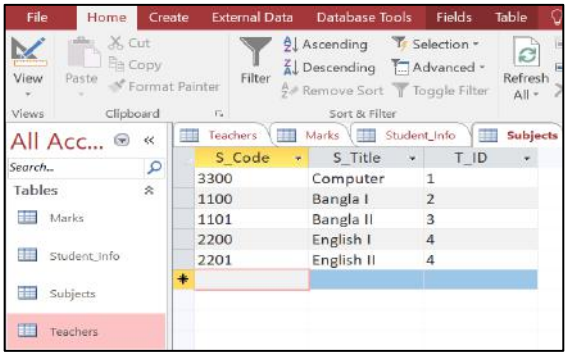

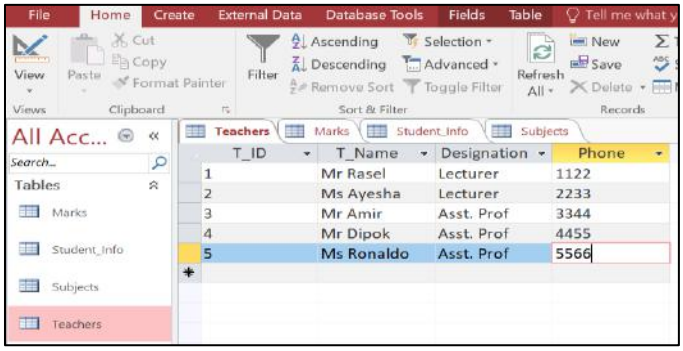

ব্যবহারিক কাজ:

শ্রেণির ১০ জন সহপাঠির নাম, রোল এবং ফোন নম্বর এন্ট্রি দেওয়ার জন্য একটি টেবিল তৈরি করুন।

8.4 কুয়েরি (Query) করা এবং রিপোর্ট তৈরি করা

ডেটাবেজের কোনো একটি ডেটা টেবিলে বিপুল পরিমাণ ডেটা থাকতে পারে। এই বিপুল পরিমাণ ডেটা থেকে কুয়েরির সাহায্যে খুব সহজেই প্রয়োজনীয় ডেটা খুঁজে বের করা যায়। কোনো টেবিলে সংরক্ষিত বিপুল পরিমাণ ডেটা থেকে প্রয়োজনীয় ডেটা খুঁজে বের করার কার্যকরী ব্যবস্থাকে কুয়েরি বলে। এ সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো-

উদাহরণ: পূর্বে তৈরিকৃত College ডেটাবেজ থেকে যে সকল শিক্ষার্থীর এড্রেস Dhaka তাদের রেকর্ডসমূহ কুয়েরি করে খুঁজে বের করতে হবে।

কুয়েরি করার ধাপগুলি নিম্নরূপ-

১. কুয়েরি করার জন্য প্রথমেই পূর্বে তৈরিকৃত College ডেটাবেজটি ওপেন করতে হবে। এরপর Create ট্যাবে ক্লিক করে Query Wizard এ ক্লিক করলে নিচের উইন্ডোটির মতো New Query ডায়ালগ বক্স স্ক্রিনে প্রদর্শিত হবে।

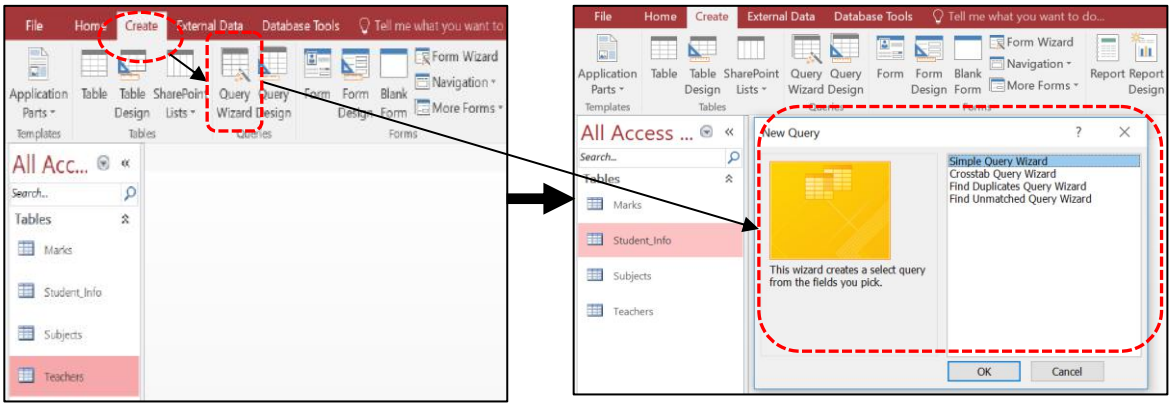

২. এখন New Query ডায়ালগ বক্স-এর Avaliable Fields থেকে প্রয়োজনীয় ফিল্ডগুলো সিলেক্ট করে নিয়ে Next বাটনে ক্লিক করতে হয়।

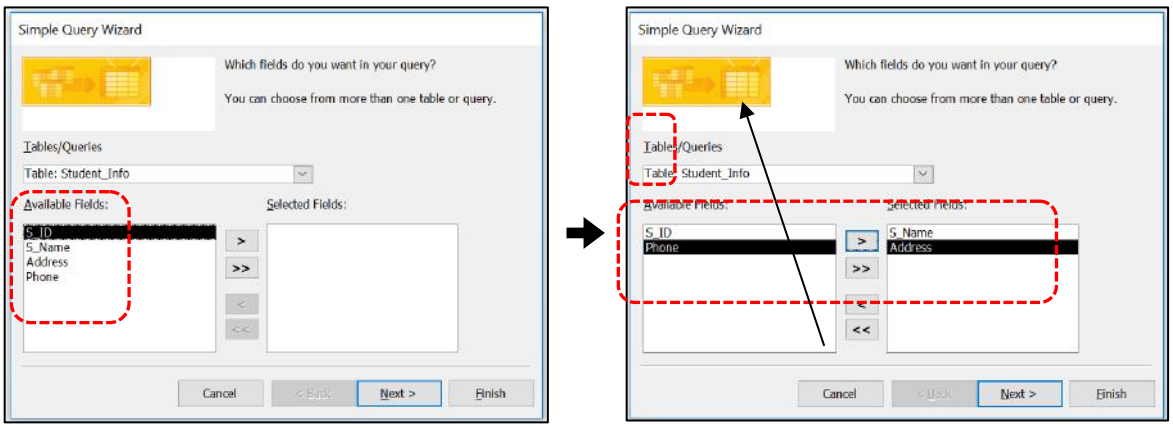

৩. Next বাটনে ক্লিক করলে যে ডায়ালগ বক্স আসবে তাতে একটি টাইটেল (যেমন: Student_Info Address) দিয়ে Finish বাটনে ক্লিক করলে সিলেক্ট করা ফিল্ডযুক্ত তথ্য প্রদর্শিত হবে।

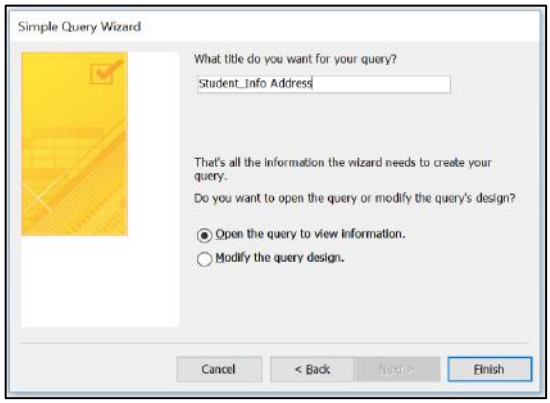

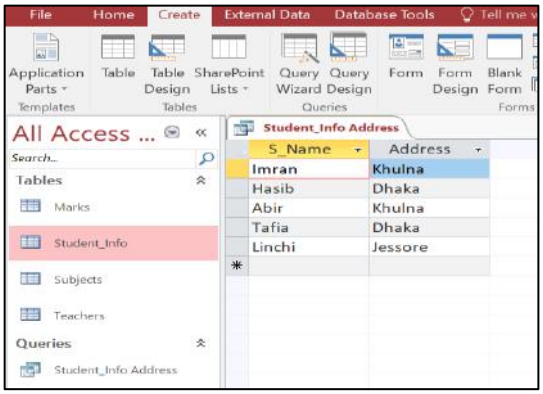

৪. প্রদর্শিত টেবিল-এর Address ফিল্ডের ড্রপডাউন বক্স থেকে Dhaka সিলেক্ট করে দিলে Dhaka ঠিকানা সম্বলিত টেবিল প্রদর্শিত হবে।

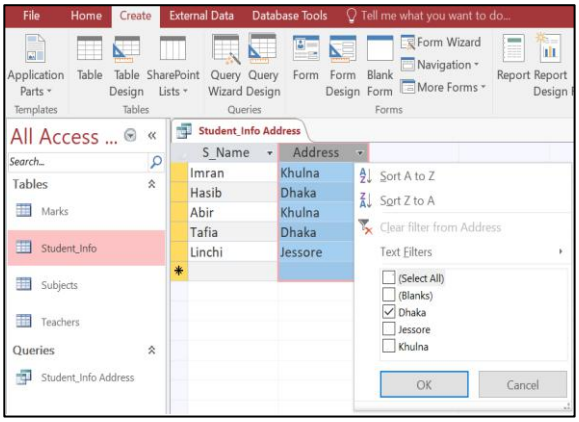

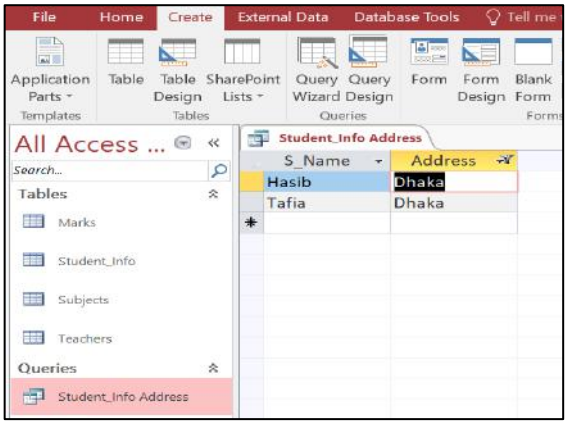

৫. কুয়েরিটি প্রিন্ট করার জন্য এটিকে রিপোর্ট আকারে প্রকাশ করতে হবে। এ জন্য Create ট্যাব থেকে Report-এ ক্লিক করলে প্রিন্টযোগ্য রিপোর্ট তৈরি হবে। উপরের ধাপসমূহ অনুসরণ করে যে কোনো ডেটা খুঁজা ও প্রিন্ট করা যাবে।

৪.৪.১ সর্টিং (Sorting)

সর্টিং (Sorting): ডেটাকে সর্টিং বা ফিল্টারিং বা ইনডেক্সিং করা ডেটাবেজের খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যেমন- কোনো টেবিলে প্রাইমারি কী সংযুক্ত S_ID ফিল্ড ছাড়াও অন্য ফিল্ড যেমন- S_Name ফিল্ডের ডেটাগুলোকে ক্রম অনুসারে সাজানোর প্রয়োজন হতে পারে। দুইভাবে ডেটাকে সর্টিং করা যায় যথা-

১. Ascending Order সর্টিং
২. Descending Order সর্টিং

১. Ascending Order সর্টিং: একই শ্রেণিভূক্ত কতগুলি উপাত্তকে মানের উচ্চক্রম অনুসারে সাজানোর পদ্ধতিকে Ascending Order সর্টিং বলে। যেমন ৫ জন শিক্ষার্থীর নির্বাচনী পরীক্ষায় কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরগুলি যদি 80, 46, 90, 92, 83 হয়, তবে এর মধ্যে সবচেয়ে কম নম্বর, তারপর দ্বিতীয় সর্বনিম্ন নম্বর এভাবে যদি নম্বরগুলিকে সাজানো হয় তবে তাকে Ascending order সর্টিং বলে। আবার ইংরেজি বর্ণক্রমানুসারে যেমন- A, B, C, D ... ... Z পর্যন্ত সাজানোকেও Ascending Order সর্টিং বলে।

২. **Descending Order সর্টিং:** একই শ্রেণিভূক্ত কতগুলি উপাত্তকে মানের নিম্নক্রম অনুসারে সাজানোর পদ্ধতিকে Descending order সর্টিং বলে। যেমন ৫ জন শিক্ষার্থীর নির্বাচনী পরীক্ষায় কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরগুলি যদি 80, 46, 90, 92, 83 হয়, তবে এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি নম্বর, তারপর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নম্বর এভাবে যদি নম্বরগুলিকে সাজানো হয় তবে তাকে Descending Order সর্টিং বলে। আবার যদি সবচেয়ে কম নম্বর থেকে বেশি নম্বরে সাজানো হয় তাকে Ascending Order সর্টিং বলে। আবার ইংরেজি বর্ণগুলিকে বিপরীত ক্রমানুসারে যেমন Z, Y, X, W, ... A পর্যন্ত সাজানোকেও Descending order সর্টিং বলে।

উদাহরণ: Marks টেবিল থেকে শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরসমূহ তাদের মানের নিম্ন ক্রমানুসারে সাজাতে হবে।

নিচে সর্টিং করার ধাপগুলি প্রদর্শিত হলো ঃ

সর্টিং করার জন্য প্রথমেই পূর্বে তৈরিকৃত College ডেটাবেজটি ওপেন করে Marks টেবিলটি ওপেন করতে হবে। এরপর Marks ফিল্ডের ড্রপডাউন বক্স থেকে Largest to Smallest সিলেক্ট করে দিলে নম্বরগুলো বড় থেকে ছোট মানে প্রদর্শিত হবে। একইভাবে Smallest to Largest সিলেক্ট করে দিলে নম্বরগুলো ছোট থেকে বড় মানে প্রদর্শিত হবে।

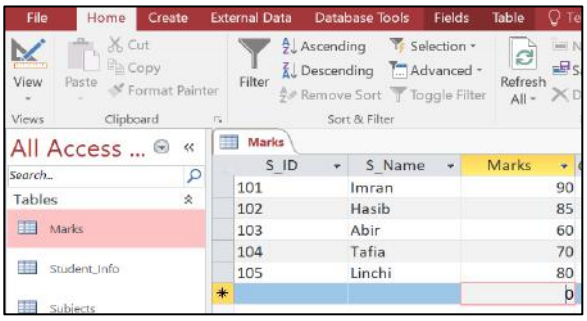

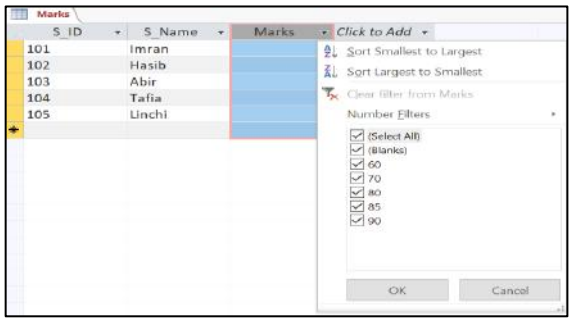

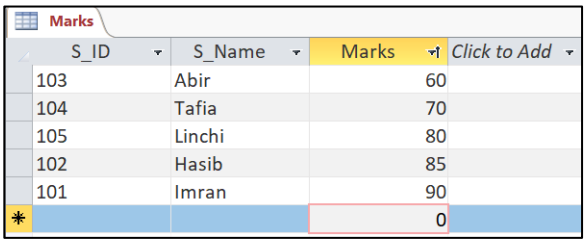

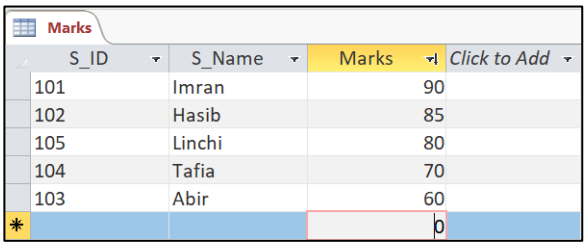

৪.৪.২ ইন্ডেক্সিং (Indexing)

ইন্ডেক্সিং বলতে সাধারণত ডেটাবেজে সংরক্ষিত ডেটাসমূহকে এমনভাবে সাজিয়ে রাখাকে বোঝায়, যাতে ব্যবহারকারী খুব সহজেই বিশাল তথ্য ভান্ডার থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে বের করতে পারে। এজন্য ডেটা টেবিলের রেকর্ডসমূহকে যৌক্তিক বিন্যাসে সাজানোকে ইন্ডেক্সিং বলে। অর্থাৎ এর মাধ্যমে যে কোনো ধরনের সূচি প্রণয়ন করা বুঝায়।

Indexing

Roll	Student Name	Marks
1	Noman	40
2	Rupu	41
25	Aiyesha	41
4	Rafit	35
5	Sumaiya	43
7	Synthia	24

Roll	Student Name	Marks
1	Noman	40
2	Rupu	41
4	Rafit	35
5	Sumaiya	43
7	Synthia	24
25	Aiyesha	41

ইনডেক্সিং করার সময় নিম্নের বিষয়গুলি বিবেচনা করা হয়-

১. ইনডেক্সিং করার সময় ইনডেক্সের একটি নাম দিতে হয় এবং কী ফিল্ডের উপর ভিত্তি করে ইনডেক্স করা হয়। যে ফিল্ডের উপর ইনডেক্স করা হবে সাধারণত তার নামের অনুরূপ নাম নির্বাচন করা হয়।

২. এক বা একাধিক ফিল্ডের উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনে ইনডেক্সিং করা যায়। একটি ডেটা টেবিলে এক বা একাধিক ইনডেক্স থাকতে পারে।

৪.৪.৩ ডেটাবেজ রিলেশন (Database Relation)

ডেটাবেজের ক্ষেত্রে কোনো একটি ফিল্ডের উপর ভিত্তি করে দুই বা ততোধিক টেবিলের মধ্যে ডেটা আদান প্রদানের জন্য যে সম্পর্ক তৈরি করা হয় তাকে ডেটাবেজ রিলেশন বলে। এ রিলেশনকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. One-to-One relation
২. One-to-Many relation
৩. Many-to-One relation
৪. Many-to-Many relation

১. One-to-One relation:
যদি ডেটাবেজের কোনো একটি ডেটা টেবিলের একটি রেকর্ড অপর একটি ডেটা টেবিলের শুধুমাত্র একটি রেকর্ডের সাথে সম্পর্কিত থাকে তবে তাদের মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাকে One-to-One relation বলে।

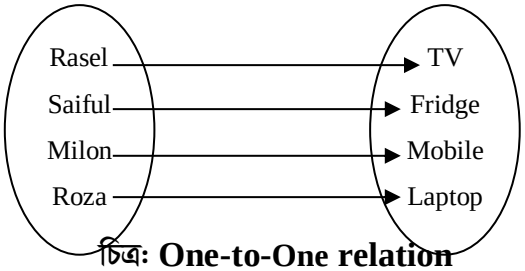

চিত্র: **One-to-One relation**

২. One-to-Many relation :
যদি কোনো ডেটাবেজের কোনো একটি ডেটা টেবিলের একটি রেকর্ড অপর একটি টেবিলের একাধিক রেকর্ডের সাথে সম্পর্কিত থাকে তাকে One-to-many relation বলে।

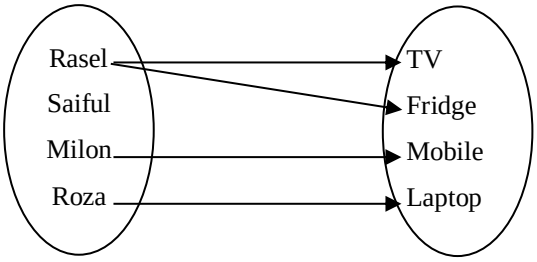

চিত্র: **One-to-Many**

৩. Many-to-One relation:
এটি One-to-many রিলেশনশিপের সম্পূর্ণ বিপরীত। যদি কোনো ডেটাবেজের কেনো একটি ডেটা টেবিলের একাধিক রেকর্ড অপর একটি টেবিলের একটি রেকর্ডের সাথে সম্পর্কিত থাকে তাকে Many-to-One relation বলে।

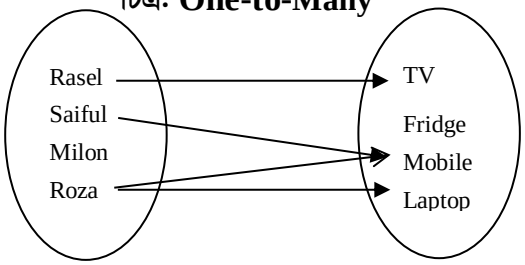

চিত্র: **Many-to-One relation**

৪. Many-to-Many relation :
যদি ডেটাবেজের কোনো একটি ডেটা টেবিলের একাধিক রেকর্ড অপর একটি টেবিলের একাধিক রেকর্ডের সাথে সম্পর্কিত থাকে তাকে Many-to-Many relation বলে।

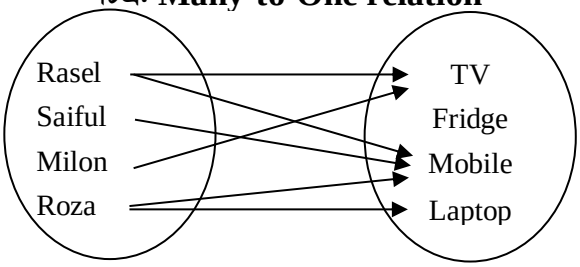

চিত্র: **Many-to-Many relation**

৪.৫ ডেটাবেজ সংক্রান্ত নমুনা প্রজেক্ট তৈরি

জোড়ায় বা দলে নিম্নের প্রজেক্টগুলো অনুশীলন করা যেতে পারে। এর বাইরেও নিজস্ব চিন্তা চেতনা দিয়ে যে কোনো প্রজেক্ট তৈরি করা যেতে পারে। তবে একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে, প্রতিটি প্রজেক্ট যেন জীবন ঘনিষ্ঠ হয়, ব্যবহারিক জীবন বা পেশাগত জীবন থেকে নেয়া হয়।

১. কয়েকজন সহপাঠি মিলে তিন টেবিল বিশিষ্ট একটি ডেটাবেজ তৈরি করুন এবং এতে বিভিন্ন কী (যেমন প্রাইমারী কী, ফরেন কী, কম্পোজি প্রাইমারী কী) প্রদর্শন করুন।
২. কয়েকজন শিক্ষার্থী/প্রশিক্ষণার্থী মিলে শ্রেণির শিক্ষার্থীদের Result নামে একটি ডেটাবেজ তৈরি করুন এবং SQL (select, where, from) ব্যবহার করে যারা GPA 5.00 পেয়েছে তাদের তালিকা উপস্থাপন করুন।

৩. দলগতভাবে কলেজের কমপক্ষে ১০০ জন শিক্ষার্থীর নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, ক্লাসের নাম এবং রক্তের গ্রুপ ইত্যাদি ডেটা নিয়ে Student Management নামে একটি ডেটাবেজ তৈরি করুন। এদের মধ্য থেকে কুয়েরি করে বিভিন্ন ব্লাড গ্রুপের তালিকা শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করুন।

৪. পৌরসভার জন্ম নিবন্ধনের জন্য জন্ম তারিখ, লিংগ, পিতার নাম, মাতার নাম, ধর্ম ও জন্মস্থান, স্থায়ী ঠিকানা ও বর্তমান ঠিকানা ইত্যাদি তথ্যগুলোর সুযোগ রেখে একটি ডেটাবেজ তৈরি করুন।

৫. কলেজের লাইব্রেরি কার্যক্রমের তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য Book name, Book ID, Author name, Recipient name, Received date ইত্যাদি ফিল্ড ব্যবহার করে একটি ডেটাবেজ সফটওয়্যার তৈরি করুন।

৬. নিম্নের নমুনা টেবিল ব্যবহার করে একটি ডেটাবেজ তৈরি করুন:

ID	Name	Class	Address	Date of Birth	City	Grade
1001	Samin	XI	H#5, R#A, Dhanmondi	02/05/1998	Dhaka	A+
1002	Arnob	XI	H#9, R#C, Mirpur	06/08/1998	Sylhet	B+
1003	Rakib	XII	H#9, R#4/A, Motijheel	01/02/1999	Comilla	A+
1004	Rafi	XII	H#9, R#C, Uttara	09/09/1997	Jessore	A

এখানে ID কে প্রাইমারি কি ধরা হয়েছে।

প্রশ্নাবলি

১. রিলেশনাল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কী? এর বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার লিখুন।

২. কুয়েরি বলতে কী বোঝেন? কুয়েরি-এর ব্যবহার লিখুন।

৩. ইন্ডেন্টিং বলতে কী বোঝেন? ইন্ডেন্টিং-এর ব্যবহার লিখুন।

৪. বিদ্যমান টেবিলে নতুন রেকর্ড প্রবেশ করানো, রেকর্ড মুছে ফেলা, নতুন ফিল্ড যোগ করার প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।

তথ্যসূত্র

মোস্তফা জব্বার. (২০১৪). *তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি)*, সিবিএ পাবলিকেশন, ঢাকা।

মো: মাহবুবুর রহমান. (২০১৩), *মাইক্রোসফট একসেস*, সিস্টেক পাবলিশার্স, ঢাকা।

Ayyavaraiah, Monelli., & Gopi, Arepalli. (2017). Database Management System, New Delhi: Horizon Books.

Mary Lemons. (2016). *Microsoft Official Academic Course: MICROSOFT ACCESS 2016.* Retrieved from John Wiley & Sons, Inc.: Accessed on 15 June 2018: https://www.dit.ie/media/ittraining/msoffice/MOAC_Access_2016.pdf.

ইউনিট ৫ : প্রোগ্রামিং ভাষা

আলোচিত বিষয়বস্তুসমূহ:

৫.১: প্রোগ্রামের ধারণা: প্রাথমিক আলোচনা

৫.২: উচ্চ স্তরের ভাষা ও কয়েকটি প্রোগ্রামিং ভাষার সংক্ষিপ্ত ধারণা

৫.৩: অনুবাদক প্রোগ্রাম: অ্যাসেম্বলার, কম্পাইলার ও ইন্টারপ্রিটার

৫.৪: প্রোগ্রাম সংগঠন ও প্রোগ্রাম তৈরির ধাপসমূহ

৫.৫: অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট

৫.৬: প্রোগ্রাম ডিজাইন মডেল

৫.৭: সি-প্রোগ্রামিং: বৈশিষ্ট্য, ধারণা, প্রোগ্রাম কম্পাইলিং, প্রোগ্রামের গঠন

৫.৮: ডেটা টাইপ

৫.৯: ধ্রুবক, চলক, রাশিমালা, কি-ওয়ার্ড

৫.১০: ইনপুট ও আউটপুট স্টেটমেন্ট

৫.১১: কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট

৫.১২: লুপ

৫.১৩: অ্যারে

ইউনিট ৫

প্রোগ্রামিং ভাষা

কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারগুলোকে সচল করা ও সেগুলো দ্বারা কাঙ্খিত কাজ করিয়ে নেয়ার জন্য কম্পিউটারের অভ্যন্তরে যা কাজ করে তাই সফটওয়্যার। অর্থাৎ কম্পিউটারের প্রাণশক্তি হচ্ছে সফটওয়্যার। আর সফটওয়্যার হচ্ছে কতগুলি প্রোগ্রামের সমষ্টি। কম্পিউটারের নির্দেশনা আসে মাইক্রোপ্রসেসর হতে। তাই প্রোগ্রামগুলো আসলে মাইক্রোপ্রসেসরের জন্যই তৈরি। প্রোগ্রামের মাধ্যমে মাইক্রোপ্রসেসর অন্যান্য অংশকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে।

৫.১ প্রোগ্রামের ধারণা - প্রাথমিক আলোচনা

হার্ডওয়্যারকে কর্মক্ষম করতে গেলে বা তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে প্রয়োজন হয় নির্দেশনার। আর নির্দেশনাগুলো সুবিন্যস্ত উপায়ে দিতে গেলে যা করণীয় তাই প্রোগ্রাম। প্রোগ্রামের মাধ্যমে হার্ডওয়্যারকে ফাংশনাল করার এবং হার্ডওয়্যার দিয়ে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৫.১.১ প্রোগ্রাম

কম্পিউটারের সাহায্যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষ কিছু শব্দ, বর্ণ, অঙ্ক, চিহ্ন ব্যবহার করে এদেরকে সুনির্দিষ্ট নিয়মানুসারে বিন্যস্ত করে ধারাবাহিকভাবে লিখিত কতগুলো কমান্ড বা নির্দেশের সমষ্টিকে প্রোগ্রাম বলে। এ নির্দেশের ফলে ব্যবহারকারী তার আখাঙ্খিত কাজটি পায়। প্রোগ্রাম সাধারণত কম্পিউটারের সহায়ক স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকে। ব্যবহারকারীর চাহিদা অনুযায়ী অপারেটিং সিস্টেম নির্দিষ্ট প্রোগ্রামকে প্রধান মেমোরিতে নিয়ে আসে। এরপর ইউজার ঐ প্রোগ্রামটি ব্যবহার করে তার প্রয়োজনীয় কাজটি করতে পারে।

৫.১.২ প্রোগ্রামিং ভাষা

কোন যন্ত্রকে নির্দেশনা দিতে হলে তার মত করেই নির্দেশনা দিতে হয়। প্রযুক্তির বিকাশের মাধ্যমে অনেক আধুনিক যন্ত্রেই এখন যন্ত্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হয় প্রোগ্রামের। আর এ প্রোগ্রামগুলো বা এই প্রোগ্রামের নির্দেশনাগুলো দিতে ব্যবহার করা হয় ভাষা। প্রোগ্রামে উল্লেখিত নির্দেশ অনুধাবন করে সে অনুযায়ী কাজ করার জন্য সেই যন্ত্রের সার্কিটগুলো বিশেষভাবে বিন্যস্ত থাকে। ফলে কোন্ নির্দেশের অনুসারে কী কাজ করতে হবে তা যন্ত্রটি ঠিক বুঝে নিতে পারে। এই নির্দেশনা দেবার জন্য যে ভাষা ব্যবহার হয় তাকে আমরা বলতে পারি প্রোগ্রামিং ভাষা।

অর্থাৎ সঠিক বিন্যাস অনুযায়ী নির্দিষ্ট নিয়মে তৈরি নির্দেশ বা নির্দেশমালাকে বলতে পারি প্রোগ্রাম। আর সে প্রোগ্রাম রচনার জন্য ব্যবহৃত বর্ণ, চিহ্নসহ এর ব্যবহারের নিয়ম (ঝুহঃধী) বা ব্যাকরণকে বলা হয় প্রোগ্রামিং ভাষা।

প্রোগ্রামিং ভাষা তৈরি করার উদ্দেশ্য হল প্রোগ্রামার যাতে মাইক্রোপ্রসেসরের জন্য অর্থবোধক প্রোগ্রাম তৈরি করতে পারেন। ডিজিটাল সার্কিটকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। এর মাধ্যমে কম্পিউটারের অনেক জটিল জটিল সমস্যা সমাধান সম্ভব হয়েছে।

প্রোগ্রামিং ভাষার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন:

কাজ (Function): প্রোগ্রামিং ভাষা হচ্ছে এক ধরনের ভাষা যা দিয়ে কম্পিউটার প্রোগ্রাম লেখা যায়, এবং এই প্রোগ্রামগুলোর সাহায্যে কম্পিউটারকে কোনো গণনামূলক কাজ করার নির্দেশ দেয়া যায় এবং সম্ভব হলে কম্পিউটারের বাইরের যন্ত্রাংশ যেমন প্রিন্টার, রোবট, ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

লক্ষ্য (Target): প্রোগ্রামিং ভাষাগুলো থেকে স্বাভাবিক ভাষাগুলোর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে স্বাভাবিক মুখের ভাষা কেবল মানুষে-মানুষে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত হয়, অন্যদিকে প্রোগ্রামিং ভাষাগুলো মানুষকে যন্ত্রের কাছে আদেশ পৌঁছে দিতে সাহায্য করে। কিছু প্রোগ্রামিং ভাষা এক যন্ত্রকে আরেক যন্ত্রের সাথে যোগাযোগে সাহায্য করে। যেমন কিছু প্রোগ্রাম পোস্টস্ক্রিপ্ট প্রোগ্রাম তৈরির মাধ্যমে প্রিন্টার বা ডিসপ্লে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

সংগঠন (Constructs): প্রোগ্রামিং ভাষার সাহায্যে কিছু সংগঠন থাকে যেগুলো দিয়ে বিভিন্ন উপাত্ত কাঠামো (data structure) সংজ্ঞায়িত করা হয় কিংবা নির্দেশ পালনের প্রবাহ বা ধারা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

প্রকাশ ক্ষমতা (Expressive power): গণনা তত্ত্বে (theory of computation) প্রোগ্রামিং ভাষাসমূহকেতারা কী ধরনের গণনা (computation) প্রকাশ করতে পারে, তার ওপর ভিত্তি করে শ্রেণিকরণ করা হয়।

৫.১.৩ প্রোগ্রামিং প্রজন্ম

প্রোগ্রামিং ভাষা বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে বর্তমান অবস্থায় এসেছে। পরিবর্তন বা বিকাশের একেকটি পর্যায় বা ধাপকে প্রোগ্রামিং প্রজন্ম বলে।

প্রোগ্রামের ভাষাকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথাঃ

১. Low Level Language (নিম্নস্তরের ভাষা)

২. Mid Level Language (মধ্যস্তরের ভাষা)

৩. High Level Language (উচ্চস্তরের ভাষা)

১৯৪৫ সাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত কয়েকশত প্রোগ্রামিং ল্যাগুয়েজ তৈরি করা হয়েছে। এ সকল ভাষাকে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গঠন বিচারে এবং মানুষের বোধগম্যতার ভিত্তিতে পাঁচটি প্রজন্মে ভাগ করা হয়েছে। যথা -

১. প্রথম প্রজন্ম (১৯৪৫): Machine Language

২. দ্বিতীয় প্রজন্ম (১৯৫০): Assembly Language

৩. তৃতীয় প্রজন্ম (১৯৬০): High Level Language

৪. চতুর্থ প্রজন্ম (১৯৭০): Very High Level Language

৫. পঞ্চম প্রজন্ম (১৯৮০): Natural Language

মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ বা প্রথম প্রজন্মের ভাষা

কম্পিউটার বিজ্ঞানে যান্ত্রিক ভাষা (ইংরেজি: Machine code বা machine language) হচ্ছে এক ধরনের নিম্নস্তরের প্রোগ্রামিং ভাষা যা কোনো কম্পিউটারের কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট বা সিপিইউ সরাসরি বুঝতে পারে। যান্ত্রিক ভাষা দ্বিমিক বা বাইনারি কোডে লেখা হয়, অর্থাৎ 0 ও 1-এর সমন্বয়ে যান্ত্রিক ভাষার বিভিন্ন নির্দেশগুলি লেখা হয়। যান্ত্রিক ভাষায় এই নির্দেশগুলি কী হবে তা সিপিইউ-এর প্রস্তুতকারক কোম্পানি ও মডেলের উপর নির্ভর করে। যেমন- AMD প্রসেসরের জন্য যান্ত্রিক ভাষা Intel প্রসেসরের যান্ত্রিক ভাষা থেকে আলাদা হবে যদিও দুটোর দ্বারা একই কাজ করা সম্ভব।

অর্থাৎ কম্পিউটারের সরাসরি বোধগম্য ভাষাকে মেশিন ভাষা বলে। মেশিন ভাষা কম্পিউটারের নিজস্ব ভাষা যা কোনোরূপ রূপান্তর ছাড়া নির্বাহ (Execute) করা যায়। কম্পিউটারের বর্তনীগুলো বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় সহজেই। তাই, মেশিন ভাষার প্রতিটি নির্দেশ, স্মৃতির অবস্থান, ডেটা লিখিত হয় মূলত বাইনারি প্রতীকে। মেশিন ভাষার প্রতিটি নির্দেশের দুটি অংশ থাকে।

এগুলো হচ্ছে-

(ক) অপারেশন কোড বা অপকোড এবং

(খ) অপারেন্ড

বাইনারীতে লিখতে হয় বলে মেশিন ভাষায় প্রোগ্রাম রচনা খুব সময় ও পরিশ্রমের কাজ। মেশিন ভাষায় প্রোগ্রাম লিখার সময় একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির মাইক্রো-প্রসেসরের জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশনা সেট (Instruction set) অনুসরণ করতে হয়। ফলে সেই প্রোগ্রাম অন্য কোনো মাইক্রো-প্রসেসরে বা কম্পিউটারে ব্যবহার করা যায় না। এ জন্যই আইবিএম (অর্থাৎ উইন্ডোজ ভিত্তিক) কম্পিউটারে রচিত প্রোগ্রাম ম্যাক (অ্যাপেল) কম্পিউটারে চলে না।

প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে বর্তমানে সাধারণত মেশিন ভাষা ব্যবহার করা হয় না। যে ভাষায় প্রোগ্রাম রচনা করা হোক না কেন সেটিকে মেশিন উপযোগী ভাষায় রূপান্তর করা হয়। এ ধরণের মেশিন ভাষাকে প্রথম প্রজন্মের ভাষা বলে।

মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে প্রোগ্রাম লিখার সুবিধা

১. এ ভাষা জানা থাকলে কম্পিউটারের অভ্যন্তরীন সংগঠন বা নির্মাণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।
২. এ ভাষায় লেখা প্রোগ্রামের কার্যকারিতা সহজ।
৩. এ ভাষা ব্যবহার কওে মেশিনে ব্যবহৃত সার্কিটের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করা যায়।
৪. এ ভাষা কম্পিউটার সহজে বুঝে। ফলে কাজ দ্রুত হয়।

মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে প্রোগ্রাম লিখার অসুবিধা

১. এ ভাষায় এক ধরনের কম্পিউটারের জন্য লিখিত প্রোগ্রাম অন্য ধরণের মেশিনে ব্যবহার করা যায় না।
২. এ ভাষায় প্রোগ্রাম লিখতে অনেক সময়ের প্রয়োজন।
৩. এ ভাষা ব্যবহার করে প্রোগ্রাম লিখতে হলে কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ সংগঠন সম্পর্কে জানা থাকা প্রয়োজন- যা অত্যন্ত কঠিন ও ক্লান্তিকর।
৪. এ ভাষায় প্রোগ্রাম অত্যন্ত দীর্ঘ হয়; ফলে ভুলের সম্ভাবনা থাকে।

অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ বা দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাষা

যান্ত্রিক ভাষায় প্রোগ্রাম লেখা অত্যন্ত কঠিন ও সময়সাপেক্ষ। প্রোগ্রামারকে মেশিনের প্রতিটি বিটের হিসাব রাখতে হয়। কেবল 0 ও 1-এ লেখা বলে প্রোগ্রামের ভুলত্রুটি ধরতেও অসুবিধা হয়। মার্কিন গণিতবিদ গ্রেস মারি হপার ১৯৫২ সালে এই সমস্যাগুলি দূর করার লক্ষ্যে অ্যাসেম্বলি ভাষা উদ্ভাবন করেন। অ্যাসেম্বলি ভাষা থেকে যান্ত্রিক ভাষায় অনুবাদের জন্য বিশেষ ধরনের অনুবাদক প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয়, যার নাম দেয়া হয়েছে অ্যাসেম্বলার। অ্যাসেম্বলি ভাষায় যান্ত্রিক ভাষার কিছু কিছু নির্দেশ বাইনারী সংখ্যার বদলে সরাসরি ইংরেজি ভাষায় প্রদান করা যায়। যেমন যোগ করার নির্দেশ প্রদান করতে হলে যান্ত্রিক ভাষায় 100010 লিখতে হত। কিন্তু অ্যাসেম্বলি ভাষায় সরাসরি ADD লিখলেই হয়।

অর্থাৎ যে প্রোগ্রামিং ভাষায় নিউমেরিক কোড এর পরিবর্তে সাংকেতিক বা নেমোনিক কোড ব্যবহার করা হয় সে ভাষাকে অ্যাসেম্বলি ভাষা বলে। মেশিন ভাষার প্রতিটি নির্দেশের বাইনারী কোডকে এসেম্বলি ভাষায় একটি বিশেষ শব্দ বা নাম দেওয়া হয়। নির্দেশের তাৎপর্য অনুযায়ী প্রদত্ত এ নাম দ্বারা নির্দেশকে মনে রাখা সহজ হয়। ফলে প্রোগ্রাম রচনা মেশিন ভাষার তুলনায় কিছুটা সহজ হয়। অ্যাসেম্বলি ভাষার সাংকেতিক নামকে নেমোনিক বলে। মেশিন ভাষার মত এ ভাষাও এক মেশিনের জন্য তৈরি করা প্রোগ্রাম অন্য মেশিন বুঝতে পারে না। অর্থাৎ এক ধরনের কম্পিউটারের প্রোগ্রাম অন্য ধরণের কম্পিউটারে নির্বাহ করা যায় না। অ্যাসেম্বলি ভাষাকে দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাষা বলে।

অ্যাসেম্বলি ভাষায় প্রোগ্রাম লিখার সুবিধা

১. এ ভাষায় লিখা প্রোগ্রাম সংক্ষিপ্ত হয়।
২. এ ভাষা জানা থাকলে কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ সংগঠন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।
৩. এ ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামে মেমোরি এ্যাড্রেসের বর্ণনার প্রয়োজন পড়ে না।
৪. এ ভাষার তৈরি করা প্রোগ্রামে ভুলের পরিমাণ অনেক কম।

অ্যাসেম্বলি ভাষায় প্রোগ্রাম লিখার অসুবিধা

১. মেশিন ভাষার মত অ্যাসেম্বলি ভাষায় প্রোগ্রাম লিখতে অনেক সময়ের প্রয়োজন ।
২. এক ধরণের কম্পিউটারের জন্য তৈরি করা প্রোগ্রাম অন্য মেশিনে ব্যবহার করা যায় না ।
৩. এ ভাষা ব্যবহার করে প্রোগ্রাম রচনা করতে হলে কম্পিউটারের অভ্যন্তরীন সংগঠন সম্পর্কে জানা প্রয়োজন- যা অত্যন্ত কঠিন ও ক্লান্তিকর ।
৪. অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে রচিত প্রোগ্রামের কার্যকারিতার জন্য অনুবাদক প্রোগ্রাম অ্যাসেম্বলারের উপর নির্ভর করতে হয় ।

মেশিন ভাষা ও অ্যাসেম্বলি ভাষায় নির্দেশনা

মেশিন ভাষা এবং এসেম্বলী ভাষায় প্রদত্ত নির্দেশগুলিকে মূলত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়-
গাণিতিক নির্দেশ (Arithmetic Instructions)

- যোগ (Addition/Summation)
- বিয়োগ (Subtraction)
- গুণ (Multiplication)
- ভাগ (Division)

নিয়ন্ত্রণমূলক নির্দেশ (Control Instructions)

- লোড (Load)
- স্টোর (Store)
- জাম্প (Jump)

ইনপুট-আউটপুট নির্দেশ (Input-Output Instructions)

- পড় (Read)
- লেখ (Write)

প্রত্যক্ষ/সরাসরি ব্যবহারমূলক নির্দেশ (Direct Use/Instructions)

- যেমন শুরু করা (Start)
- স্থগিত করা (Halt)
- সমাপ্ত করা (End)

মেশিন ভাষা ও অ্যাসেম্বলি ভাষার পার্থক্য

ক্রম.	মেশিন ভাষা	অ্যাসেম্বলি ভাষা
১	যে প্রোগ্রামিং ভাষা কম্পিউটার সরাসরি বুঝতে পারে তাকে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ বা যন্ত্রের ভাষা বলে ।	যে প্রোগ্রামিং ভাষায় নিউমেরিক কোড এর পরিবর্তে নেমোনিক কোড ব্যবহার করা হয় তাকে অ্যাসেম্বলি ভাষা বলে ।
২	এ ভাষায় লেখা প্রোগ্রামকে অবজেক্ট কোড বলে ।	এ ভাষায় লেখা প্রোগ্রাম হচ্ছে সোর্স কোড ।
৩	সাধারণত বাইনারি ০ ও ১ দিয়ে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ লিখতে হয় ।	মেশিন ভাষার প্রতিটি নির্দেশের বাইনারী কোডকে এসেম্বলি ভাষায় একটি বিশেষ শব্দ বা নাম দেওয়া হয় ।
৪	মেশিন ভাষায় প্রোগ্রাম লেখা খুব ক্লান্তিকর ও সময় বেশি লাগে ।	মেশিন ভাষার তুলনায় অ্যাসেম্বলি ভাষায় প্রোগ্রাম লেখা অপেক্ষাকৃত সহজ ও কম সময় লাগে ।
৫	মেশিন ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামের জন্য কোনো অনুবাদক প্রোগ্রামের প্রয়োজন নাই ।	অ্যাসেম্বলি ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামে মেশিন ভাষায় রূপান্তরের জন্য অনুবাদক প্রোগ্রাম হিসেবে অ্যাসেম্বলার ব্যবহৃত হয় ।

৫.২ উচ্চ স্তরের ভাষা

মেশিন ভাষার ক্লান্তি দূর করার প্রচেষ্টা কিছুটা সফল হয়ে উঠেছে অ্যাসেম্বলি ভাষা তৈরির মাধ্যমে। কিন্তু অ্যাসেম্বলি ভাষাও মেশিন নির্ভরতা ত্যাগ করতে পারে নাই। পরবর্তী পর্যায়ে এ মেশিন নির্ভরতা দূর হয়ে প্রোগ্রামিংকে মানুষের জন্য অনেক সহজ হয়ে উঠেছে উচ্চস্তরের ভাষা তৈরির মাধ্যমে। উচ্চস্তরের ভাষার আরেকটি সুবিধা হচ্ছে সেটি প্রায় মানুষের ভাষার কাছাকাছি।

যে ধরণের প্রোগ্রামিং ভাষা মানুষের ভাষার কাছাকাছি সেসব ভাষাকে উচ্চস্তরের ভাষা বলা হয়। মানুষের বোধগম্য হওয়ার ফলে এ সব ভাষায় প্রোগ্রাম রচনা করা অনেক সহজ। কিন্তু কম্পিউটার বা যন্ত্র সরাসরি এ ধরণের ভাষা বুঝতে পারে না। তাই এ সব ভাষাকে অনুবাদক প্রোগ্রামের সাহায্যে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করে নিতে হয়। যেমনঃ সি, সি++, জাভা ইত্যাদি হচ্ছে উচ্চস্তরের ভাষার উদাহরণ।

উচ্চস্তরের ভাষায় তৈরি একই প্রোগ্রাম একাধিক মেশিনে চালানো যায়। মানুষের বোধগম্য হওয়ার কারণে এ ভাষায় প্রোগ্রাম রচনায় ভুলের পরিমাণ কম থাকে এবং ভুল হলেও সহজেই তা সংশোধন করা সম্ভব। যেহেতু সোর্স কোডে প্রোগ্রাম লেখা হয় তাই এ ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম রান করতে হলে মেমোরি বেশি লাগে। এ ধরনের ভাষাকে তৃতীয় প্রজন্মের ভাষা বলা হয়।

উচ্চতর ভাষা বা ৩য় প্রজন্মের ভাষার সুবিধা

১. উচ্চতর ভাষায় প্রোগ্রাম লিখা অনেক সহজ ও দ্রুত হয়।
২. উচ্চতর ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম যে কোনো কম্পিউটারে ব্যবহার করা যায়।
৩. এ ধরণের ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামের ভুল সংশোধন অনেক সহজ।
৪. প্রোগ্রাম তৈরির সময়ে কি ধরণের সার্কিটে ব্যবহার করা হবে তা নিয়ে ভাবতে হয় না।
৫. এ ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম নিম্নস্তরের ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামের তুলনায় সংক্ষিপ্ত হয়।

উচ্চতর ভাষা বা ৩য় প্রজন্মের ভাষার অসুবিধা

১. উচ্চতর ভাষায় প্রোগ্রাম লিখার পূর্বে ল্যাঙ্গুয়েজের স্ট্রাকচার সম্পর্কে ধারণা থাকতে হয়।
২. উচ্চতর ভাষায় ব্যবহৃত প্রোগ্রাম লিখতে হলে এর কমান্ডের সিনটেক্স বা ব্যাকরণ জেনে নিতে হয়।
৩. এ ধরণের ভাষায় রচিত প্রোগ্রাম কার্যকর করতে অনুবাদক প্রোগ্রাম ব্যবহার করতে হয়।

অতি উচ্চস্তরের ভাষা বা চতুর্থ প্রজন্মের ভাষাঃ

মানুষের বোধগম্যতার মাত্রা বাড়াতে গিয়ে এবং প্রোগ্রামিংকে আরও সহজ করার উদ্দেশ্যে চতুর্থ প্রজন্মের ভাষার সৃষ্টি। চতুর্থ প্রজন্মের ভাষাগুলোই অতি উচ্চ স্তরের ভাষা হিসেবে সুপরিচিত। এ ধরণের ভাষা মানুষের ভাষার খুব কাছাকাছি। 4GL (4^{th} Generation Language) বা অতি উচ্চ স্তরের ভাষা তৃতীয় প্রজন্মের ভাষার চেয়ে আরও বেশি সুবিধাজনক। পূর্বের প্রজন্মের ভাষাগুলোতে ডেটা প্রক্রিয়াকরণের বর্ণনা বিস্তারিতভাবে লিখতে হয়। কিন্তু 4GL-এ তা বিস্তারিতভাবে দিতে হয় না। ফলে এ ভাষাকে নন-প্রসিডিউরাল ল্যাঙ্গুয়েজও বলা হয়। রিপোর্ট, পর্দায় ফলাফলের গঠন, ডেটা রেকর্ড, ইনপুট ডেটা প্রভৃতি নির্দিষ্টকরণে সরল কোয়ারি নির্দেশ ব্যবহারের ক্ষমতা চতুর্থ প্রজন্মের ভাষার বৈশিষ্ট্য। এ ভাষায় প্রোগ্রাম লেখার পর সম্পূর্ণ প্রোগ্রাম কম্পাইল করার প্রয়োজন হয় না। কমান্ড লেখার সাথে সাথেই তা কম্পাইল হয়ে যায়। SQL, Visual Basic, Oracle ইত্যাদি হচ্ছে চতুর্থ প্রজন্মের ভাষার উদাহরণ। ডেটাবেজ প্রোগ্রামের জন্য এর ব্যবহার বাড়ছে এবং জনপ্রিয় হচ্ছে।

চতুর্থ প্রজন্মের ভাষার কিছু সুবিধা

১. প্রোগ্রাম উন্নয়ন সহজ করার জন্য অনেক সুবিধা থাকে।
২. যে কোনো ধরণের মেশিনে চলতে সক্ষম।
৩. রক্ষণাবেক্ষণ সহজতর, ভুলের পরিমাণ কম।
৪. সহজে প্রোগ্রাম পরিবর্তন করে উন্নয়ন করা যায়।
৫. অনেকটা মানুষের ভাষার মতই।

চতুর্থ প্রজন্মের ভাষার কিছু অসুবিধা

১. অন্য প্রজন্মের ভাষার তুলনায় কম দক্ষ ।
২. ৩য় প্রজন্মের তুলনায় দক্ষতাও কম ।
৩. এ ভাষায় প্রোগ্রাম নির্বাহ করতে সময় বেশি লাগে ।

ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ বা পঞ্চম প্রজন্মের ভাষা

চতুর্থ প্রজন্মের ভাষার উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের ভাষার মতোই প্রোগ্রাম ভাষাকে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ বা পঞ্চম প্রজন্মের ভাষা বলে । এ ধরণের ভাষা এখনও পরীক্ষামূলক । এ প্রজন্মের ভাষা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করে তৈরি করা হয়েছে ।এ ধরণের ভাষাকে রূপান্তরে ব্যবহৃত অনুবাদককে বুদ্ধিমান বা ইন্টেলিজেন্ট কম্পাইলার বলা হয় ।

উচ্চতর ভাষার ব্যবহার

১. বড় প্রোগ্রাম তৈরির জন্য উচ্চতর ভাষার ব্যবহার করতে হয় ।
২. যে সব ক্ষেত্রে বেশি মেমোরি প্রয়োজন সে সব ক্ষেত্রে উচ্চতর ভাষা দিয়ে প্রোগ্রাম তৈরি করা হয় ।
৩. বিভিন্ন ধরণের এ্যাপ্লিকেশন তৈরিতে উচ্চতর ভাষা প্রয়োজন ।
৪. অপেক্ষাকৃত জটিল প্রোগ্রাম তৈরিতে উচ্চতর ভাষা ব্যবহার করা হয় ।

মেশিন ভাষা ও উচ্চতর ভাষার তুলনা

	মেশিন ভাষা	উচ্চস্তরের ভাষা
১	যে প্রোগ্রামিং ভাষা কম্পিউটার সরাসরি বুঝতে পারে তাকে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ বা যন্ত্রের ভাষা বলে ।	যে প্রোগ্রামিং ভাষা মানুষের ভাষার কাছাকাছি- সে ধরণের ভাষাকে উচ্চস্তরের ভাষা বলে ।
২	মেশিনের ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে অবজেক্ট প্রোগ্রাম বলা হয় ।	উচ্চস্তরের ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে সোর্স প্রোগ্রাম বলে ।
৩	মেশিন ভাষায় প্রোগ্রাম তৈরির সময়ে মেশিনে কি ধরণের সার্কিট ব্যবহার করা হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে প্রোগ্রাম তৈরি করতে হয় । অর্থাৎ এক মেশিনের জন্য তৈরি করা ভাষা অন্য মেশিনে ব্যবহার করা যায় না ।	উচ্চস্তরের ভাষায় প্রোগ্রাম তৈরির সময়ে মেশিনে কি ধরণের সার্কিটে ব্যবহার করা হয়েছে তা নিয়ে ভাবতে হয় না । অর্থাৎ যে কোনো মেশিনে এই ভাষা ব্যবহার করা যায় ।
৪	মেশিন ভাষায় প্রোগ্রাম লেখা অত্যন্ত ক্লান্তিকর ও সময়সাপেক্ষ ।	মেশিন ভাষার তুলনায় উচ্চস্তরের ভাষায় প্রোগ্রাম লেখা অপেক্ষাকৃত সহজ ও কম সময়সাপেক্ষ । প্রোগ্রাম নির্বাহে কম সময় প্রয়োজন পড়ে ।
৫	মেশিন ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামে অনুবাদক প্রোগ্রামের প্রয়োজন নাই ।	উচ্চস্তরের ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামে অনুবাদক প্রোগ্রাম ব্যবহার করতে হয় ।
৬	বাইনারি সংখ্যা অর্থাৎ ০ ও ১ দিয়ে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ লিখতে হয় ।	সি++, ফরটান, জাভা ইত্যাদি উচ্চস্তরের ভাষার উদাহরণ ।

কয়েকটি উচ্চতর ভাষা

সি (C)

সি একটি প্রোগ্রামিং ভাষা । ডেনিস রিচি, সত্তরের দশকে বেল ল্যাবে কাজ করার সময় সি ভাষা তৈরি করেন । ভাষাটি তৈরির প্রথম উদ্দেশ্য ছিল ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেম এর কোড লেখায় এর ব্যবহার । কিন্তু অচিরেই এটি একটি বহুল ব্যবহৃত ভাষায় পরিণত হয় । সি++ ও জাভাসহ পরবর্তীকালের অনেক প্রোগ্রামিং ভাষার উপর সি'র গভীর প্রভাব পড়েছে । সি এর সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে এর Portability । সি দিয়ে রচিত প্রোগ্রাম যে কোনো অপাররেটিং সিস্টেমের কম্পিউটারে চালানো যায় । সত্তর এবং আশির দশকের দিকে সি এর জনপ্রিয়তা বাড়ার সাথে সাথে এর অনেকগুলো ভার্সন তৈরি হয় ।

সি++ (C++)

সি++ (উচ্চারণ: সি প্লাস প্লাস) একটি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ভাষা। ১৯৮০ সালে বিয়ারনি স্ট্রাউস্টেপ (Bjarne Stroustrup) যুক্তরাষ্ট্রের এটিএন্ডটি বেল ল্যাবরেটরিতে (AT&T Bell Laboratory) এটি ডেভেলপ করেন। মূলত সিমুলা ৬৭ এবং সি প্রোগ্রামিং ভাষার সুবিধাজনক বৈশিষ্ট্যগুলোর সমন্বয় সাধন করে সি++ তৈরি হয়।

সি এর সাথে এখানে যা সংযুক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু হলো- প্রথমে Classes, ভার্চুয়াল ফাংশন, অপারেটর ওভারলোডিং, মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স, ব্যতিক্রম গ্রহণ করার ক্ষমতা (Exception Handling), পলিমরফিজম ইত্যাদি। নিচের চিত্রে সি++ এর বিভিন্ন ফিচার দেখানো হলো:

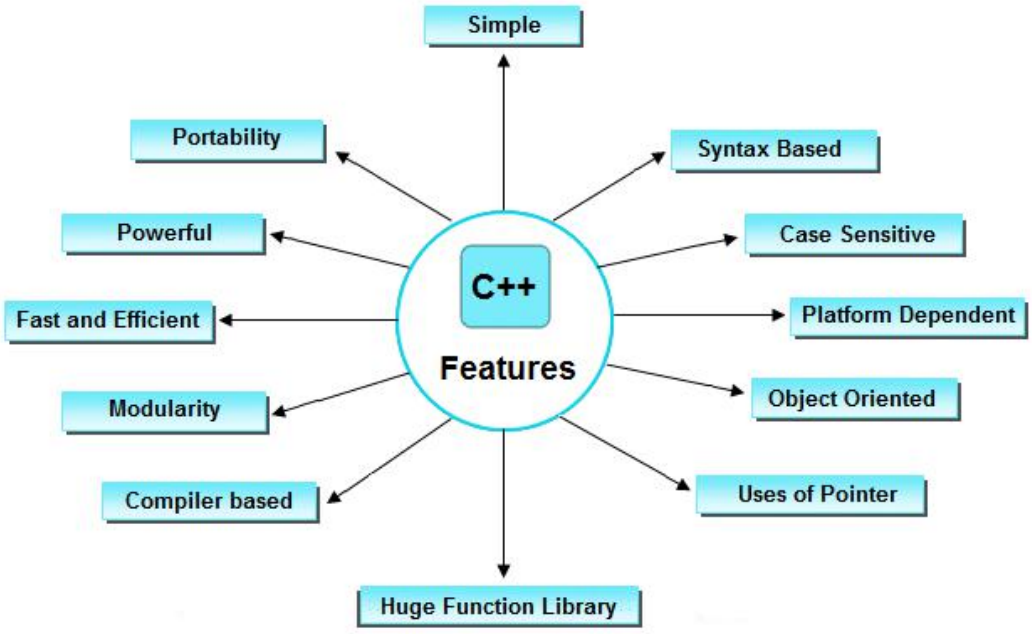

উৎস: https://www.sitesbay.com

বিয়ারনি স্ট্রাউস্ট্রেপ (Bjarne Stroustrup) ১৯৭৯ সালে 'সি' নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। তিনি খেয়াল করেন যে, বড় পরিসরের সফটওয়্যার উন্নয়নে সিমুলা প্রোগ্রামিং ভাষা বেশ কার্যকরী। কিন্তু ভাষাটি অনুশীলনের ক্ষেত্রে বেশ ধীর গতির। আবার বিসিপিএল বেশ দ্রুত কিন্তু বড় পরিসরের সফটওয়্যার উন্নয়নের জন্য তেমন শক্তিশালী নয়। বিয়ারনি স্টাউস্ট্রেপ যখন এটিএন্ডটি বেল ল্যাবরেটরিতে এ কাজ শুরু করেন তখন ইউনিক্স কার্নেল নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বেশ সমস্যার সম্মুখীন হন। তিনি 'সি' প্রোগ্রামিং ভাষায় সিমুলা এর সুবিধাগুলো অন্তর্ভুক্ত করার কাজে করতে থাকেন। এ কাজে 'সি' প্রোগ্রামিং ভাষাকে নির্বাচন করা হয়। কারণ এটি সহজ, দ্রুততর, বহনযোগ্য এবং এর ব্যাপক ব্যবহার। সি এবং সিমুলা ছাড়াও তিনি আরো কিছু প্রোগ্রামিং ভাষা নিয়ে গবেষণা করেন। যেমন: আলগোল ৬৮, অ্যাডা, সিএলইউ এবং এমএল।

ভিজুয়াল বেসিক (Visual Basic)

ভিজুয়াল বেসিক (সংক্ষেপে ভিবি বা VB) একটি তৃতীয় প্রজন্মের ঘটনা চালিত (event-driven) প্রোগ্রামিং ভাষা এবং মাইক্রোসফটের "কম" বা কম্পোনেন্ট অবজেক্ট মডেল (COM -Component Object Model) এর আইডিই (IDE - Integrated Development Environment)। মাইক্রোসফট এই ভাষাকে বাজারে আনে পুরাতন বেসিক ভাষার উন্নত সংস্করণ হিসেবে ১৯৯১ সালে প্রথম এবং ২০০৮ সালে শেখার জন্য উন্মুক্ত করে। এটি হচ্ছে বেসিক (BASIC - Beginner's All Purpose Symbolic Instruction Codes) ভাষা। এটি কম্পিউটারের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত প্রোগ্রামিং ভাষার একটি। দৃশ্যমান বা গ্রাফিকাল বৈশিষ্ট্য এবং বেসিক ভাষার উত্তরাধিকার VB-কে তুলনামূলকভাবে সহজে আয়ত্ব এবং ব্যবহার করার সুবিধা প্রদান করেছে। ভিজুয়াল বেসিকের শেষ প্রকাশনা ছিল ১৯৯৮ সালের সংস্করণ ৬। এটির জন্য মাইক্রোসফটের বর্ধিত সহযোগিতা ২০০৮ এর মার্চ মাসে শেষ হয়েছে। বর্তমানে এই ভাষাটি ভিজুয়াল বেসিক ডট নেট দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

ভিজুয়াল বেসিকের আগমন বেসিক ভাষা থেকে। ভিবি জিইউআই - গ্রাফিকাল ইউজার ইন্টারফেস (GUI-graphical user interface) বা ব্যবহারকারীর জন্য দৃশ্যমান ব্যবহার ব্যবস্থার র‍্যাপিড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট বা র‍্যাড (RAD -rapid application development) অ্যাপ্লিকেশন চালু করেছে। এছাড়াও ডেটা অ্যাকসেস অবজেক্ট, রিমোট ডেটা অবজেক্ট ইত্যাদির মাধ্যমে ডেটাবেজে কাজ করার এবং অ্যাকটিভএক্স (ActiveX) নিয়ন্ত্রক ও ডিজিটাল বস্তু (অবজেক্ট) তৈরি করার সুবিধা দিয়েছে। ভিবিএ (VBA), ভিবি স্ক্রিপ্ট ইত্যাদি স্ক্রিপ্টিং ভাষা সিন্ট্যাক্সের দিক থেকে ভিজুয়াল বেসিকের মতই, কিন্তু কাজ করে ভিন্ন ভাবে।

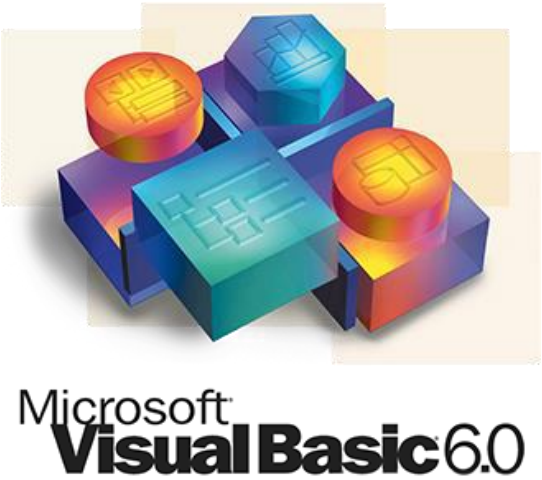

উৎস: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Visual_Basic_6.0_logo.png

একজন প্রোগ্রামার ভিজুয়াল বেসিকের সাথেই দিয়ে দেয়া কম্পোনেন্টের দ্বারা একটি অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম দাঁড় করাতে পারবেন। ভিজুয়াল বেসিকে লেখা প্রোগ্রাম সরাসরি উইন্ডোজ এপিআই ব্যবহার করতে পারে কিন্তু সেক্ষেত্রে "এক্সটার্নাল ফাংশন" বিবৃত করা প্রয়োজন।

২০১৪ সাল পর্যন্ত ভিজুয়াল বেসিক ডট নেট থেকেও ভিজুয়াল বেসিক ৬.০ পছন্দ করে এমন ডেভেলপারদের সংখ্যা হাজার হাজার ছিল।

জাভা (Java)

১৯৯৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সান মাইক্রোসিস্টেম এর একদল বিশেষজ্ঞের সমন্বিত প্রচেষ্টায় জাভা ডিজাইন করার পরে এটি অতি দ্রুত বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রোগ্রামিং ভাষার একটিতে পরিণত হয়। এটি অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ভাষা হিসেবে পরিচিত। জাভা'র এই জনপ্রিয়তার মুল কারণ এর বহনযোগ্যতা (portability), নিরাপত্তা, এবং অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ও ওয়েব প্রোগ্রামিং এর প্রতি পরিপূর্ণ সাপোর্ট।

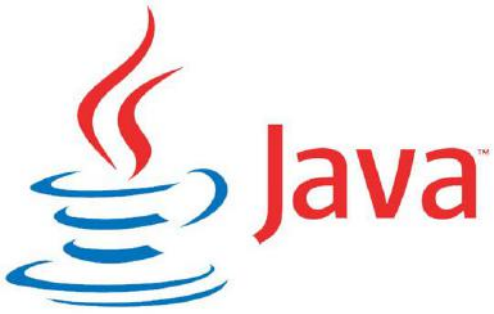

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Java_programming_language_logo.svg

James Gosling, Mike Sheridan, Ges Patrick Naughton ১৯৯১ সালের জুনে জাভা প্রোগ্রামিং প্রজেক্ট শুরু করেন। James Gosling এর অফিসের বাহিরের ওক গাছের সাথে মিল রেখে জাভা ভাষাকে "IK (Oak)" নামে ডাকা হয়। এরপর এর নাম রাখা হয় "গ্রীন"। মূলত কফি শপে বসে জাভার ধারণা আসে এ কারনেই জাভার প্রতীক নির্ধারণ করা হয় কফি মগ এবং জাভা কফির সাথে মিল রেখে এর সর্বশেষ নামাকরণ করা হয় "জাভা"। ১৯৯৫ সালে সান মাইক্রোসিস্টেমস জাভা-১.০ প্রকাশ করেন। তাদের মূলনীতি ছিল "একবার লিখুন, যে কোনো জায়গায় চালান (Write Once, Run Anywhere or WORA)"। জাভার এই গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে পোর্টেবলিটি-যার কারণে জাভা এত জনপ্রিয়। এছাড়াও এটি হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর সফল বাস্তবায়ন।

ওরাকল (Oracal)

বর্তমানে জনপ্রিয় ডটাবেজগুলোর মধ্যে ওরাকল অন্যতম। স্বতন্ত্র অবস্থান থাকায় বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হওয়া ডটাবেজ সফটওয়্যার ওরাকল। এখনও পর্যন্ত আইবিএমের ডিবি ব্যতীত ওরাকলের তেমন কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। তবে এসকিউএল সার্ভার এবং মাইএসকিউএল এর বেশ জনপ্রিয়তা থাকলেও বড় ডাটাবেজ সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলো ওরাকলের উপর নির্ভরশীল। ওরাকল এর উপর নির্ভরশীল হবার কারণ হিসেবে রয়েছে ওরাকলের শক্ষিশালী ইন্টার্নাল সিকিউরিটি এবং বড় ডাটাবেজ হ্যান্ডেল করার ক্ষমতা। বর্তমানে প্রচলিত ওরাকলের ভার্সনগুলোর মধ্যে রয়েছে ৯, ১০ এবং ১১ ।

পাইথন (Python)

পাইথন (Python) একটি অবজেক্ট অরিয়েন্টেড (object-oriented) উচ্চস্তরের প্রোগ্রামিং ভাষা। ১৯৯১ সালে গুইডো ভ্যান রোসাম এটি প্রথম প্রকাশ করেন। পাইথন নির্মাণ করার সময় প্রোগ্রামের পঠনযোগ্যতার উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এখানে প্রোগ্রামারের পরিশ্রমকে কম্পিউটারের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পাইথনের কোর সিনট্যাক্স ও সেমান্টিক্স খুবই সংক্ষিপ্ত। ভাষাটির স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি অনেক সমৃদ্ধ। পাইথন প্রোগ্রামারদের সমাজ থেকে পাইথন দর্শন এর সূচনা হয়েছে।

চিত্রঃ ভ্যান রোজাম

পাইথন একটি বহু-প্যারাডাইম প্রোগ্রামিং ভাষা (ফাংশন-ভিত্তিক, বস্তু-সংশ্লিষ্ট ও নির্দেশমূলক)। এটি একটি পুরোপুরি চলমান প্রোগ্রামিং ভাষা যার স্বনিয়ন্ত্রিত মেমরি ব্যবস্থাপনা রয়েছে। এদিক থেকে এটি পার্ল, রুবি প্রভৃতি প্রোগ্রামিং ভাষার মত।

পাইথন ভাষার মুক্ত, কমিউনিটি ভিত্তিক উন্নয়ন মডেল রয়েছে, যার দায়িত্বে আছে পাইথন সফটওয়্যার ফাউন্ডেশন নামের একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। এই ভাষাটির বিভিন্ন অংশের বিধিবদ্ধ বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ থাকলেও পুরো ভাষাটিকে এখনো সম্পূর্ণ বিধিবদ্ধ করা হয়নি।

পাইথন প্রোগ্রামিং ভাষার নামকরণ করা হয়েছে ব্রিটিশ রম্য অনুষ্ঠান "মন্টি পাইথন ফ্লাইং সারকাসের" নামে।

৫.৩ অনুবাদক প্রোগ্রাম

যে প্রোগ্রামের মাধ্যমে উৎস বা সোর্স প্রোগ্রামে রচিত প্রোগ্রাম অবজেক্ট বা বস্তু প্রোগ্রামে রূপান্তর করা যায়- তাকে অনুবাদক প্রোগ্রাম বলে। মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ ছাড়া কোনো প্রোগ্রামই কম্পিউটার সরাসরি বুঝতে পারে না। তাই অ্যাসেম্বলিং বা উচ্চস্তরের কোনো ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে মেশিনে কার্যকর করার জন্য অন্য কোনো মিডিয়া প্রোগ্রামের আশ্রয় নিতে হয় - সেটাই হচ্ছে অনুবাদক। অনুবাদকের কাজ হচ্ছে দোভাষীর মত। অনুবাদক প্রোগ্রাম থাকার ফলে উচ্চস্তরের ভাষায় প্রোগ্রাম লিখা সম্ভব হয়েছে। অনুবাদক প্রোগ্রাম তৈরির আগে সকল প্রোগ্রামার মেশিন ভাষা দিয়ে প্রোগ্রাম লিখতেন যা ছিল অনেক ক্লান্তিকর ও সময় সাপেক্ষ।

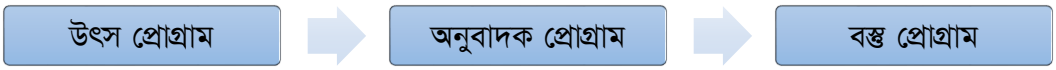

অনুবাদক প্রোগ্রামের কাজ করার পদ্ধতি

অনুবাদক প্রোগ্রামের প্রকারভেদ

অনুবাদক প্রোগ্রাম তিন ধরণের । যথা -

১. অ্যাসেম্বলার
২. কম্পাইলার
৩. ইন্টারপ্রিটার

অ্যাসেম্বলার

যে অনুবাদক প্রোগ্রামের সাহায্যে অ্যাসেম্বলি ভাষার প্রোগ্রামকে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করা হয় তাকে অ্যাসেম্বলার বলে। অ্যাসেম্বলিং প্রোগ্রামকে মেশিন প্রোগ্রামে রূপান্তরের সময় কী মেশিনের উপযোগী করে রূপান্তর করবে তা অ্যাসেম্বলারকে বলে দিতে হয় । যেমন টার্বো অ্যাসেম্বলার দিয়ে কোন প্রোগ্রামকে মেশিন কোড করতে চাইলে, কোনো মাইক্রো-প্রসেসরে সে প্রোগ্রামকে রান করানো হবে তা বলে দিতে হয় ।

ইন্টারপ্রিটার

উচ্চস্তরের ভাষায় লেখা কোনো প্রোগ্রামকে সরাসরি লাইন বাই লাইন নির্বাহের জন্য যে অনুবাদক প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয় তাকে ইন্টারপ্রিটার বলে । ইন্টারপ্রিটার উৎস প্রোগ্রামের প্রতিটি লাইন পড়ে এবং মেশিন ভাষায় অনুবাদ করে প্রসেসরকে দেয়; প্রসেসর সেটি নির্বাহ করে । একটি লাইন এক্সিকিউট শেষে ইন্টারপ্রিটার পরবর্তী লাইন অনুবাদ করে । ইন্টারপ্রিটার উৎস প্রোগ্রামের জন্য কোনো বস্তু প্রোগ্রাম তৈরি করে না বরং উৎস প্রোগ্রামকে রান করানোর জন্য প্রসেসর ও প্রোগ্রামের মধ্যে একটি মিডিয়া হিসেবে কাজ করে ।

ইন্টারপ্রিটারের সুবিধা

- মেশিন প্রোগ্রাম তৈরি না করেও ইন্টারপ্রিটার খুবই কার্যকরভাবে অনুবাদক হিসেবে ভূমিকা পালন করে ।
- ইন্টারপ্রিটার মেমোরিতে বেশি জায়গা নেয় না ।
- প্রোগ্রামের কোনো লাইনে ভুল থাকলে সে স্থানে কাজ বন্ধ করে দেয় ।
- এছাড়াও অনুবাদের পর বস্তু প্রোগ্রামকে মেমোরিতে সংরক্ষণ করে রাখতে হয় না ।
- নতুন প্রোগ্রামারদের জন্য ইন্টারপ্রিটার খুব কার্যকর ।

ইন্টারপ্রিটারের অসুবিধা

এত সুবিধা সত্তেও ইন্টারপ্রিটারের অসুবিধা হচ্ছে-

- প্রোগ্রামটি নির্বাহের ক্ষেত্রে সবসময়ই ইন্টারপ্রেটারের প্রয়োজন পড়ে ।
- এ ছাড়াও কম্পাইলারের তুলনায় প্রোগ্রাম নির্বাহ করতে ইন্টারপ্রিটারের অনেক বেশি সময় লাগে ।

কম্পাইলার

উচ্চস্তরের ভাষায় লেখা কোনো উৎস প্রোগ্রাম পুরোটা একসাথে বস্তু প্রোগ্রামে রূপান্তর করার জন্য যে অনুবাদক প্রোগ্রাম কাজ করে তাকে কম্পাইলার বলে । কম্পাইলার একটি উৎস প্রোগ্রামের পুরোটাকে মেশিনে নির্বাহের উপযোগী করে বস্তু প্রোগ্রামে রূপান্তর করে । পরবর্তীতে সে বস্তু প্রোগ্রাম পরে যতবার ইচ্ছা নির্বাহ করা যায় এবং নির্বাহকালে কম্পাইলারের প্রয়োজন হয় না । রূপান্তরকালে উৎস প্রোগ্রামে কোনো ভুল পেলে কম্পাইলার রূপান্তর স্থগিত করে প্রোগ্রামারকে ভুলের অবস্থান চিহ্নিত করে দেয় । কম্পাইলার প্রোগ্রাম রূপান্তরের পাশাপাশি উৎস প্রোগ্রামের গুণাগুণ বিচার করে বস্তু প্রোগ্রাম উন্নয়ন করতে পারে । যেহেতু কম্পাইলার পুরো উৎস প্রোগ্রামের উপর একসাথে কাজ করে সেহেতু কম্পাইলার চালানোর জন্য বেশি মেমোরির প্রয়োজন পড়ে । বর্তমানে প্রতিটি উচ্চ স্তরের ভাষার জন্য আলাদা আলাদা কম্পাইলার রয়েছে । এক ভাষার কম্পাইলার দিয়ে অন্য ভাষার প্রোগ্রাম অনুবাদ করা সম্ভব নয় ।

যেমনঃ সি/সি++ ভাষায় রচিত প্রোগ্রামের জন্য ভিজ্যুয়াল সি/সি++, বোরল্যান্ড সি/সি++ সিমানটেক সি/সি++ ইত্যাদি কম্পাইলার প্রোগ্রাম হিসেবে ব্যবহার হয় । নিচে কম্পাইলার কীভাবে কাজ করে তা দেখানো হলো:

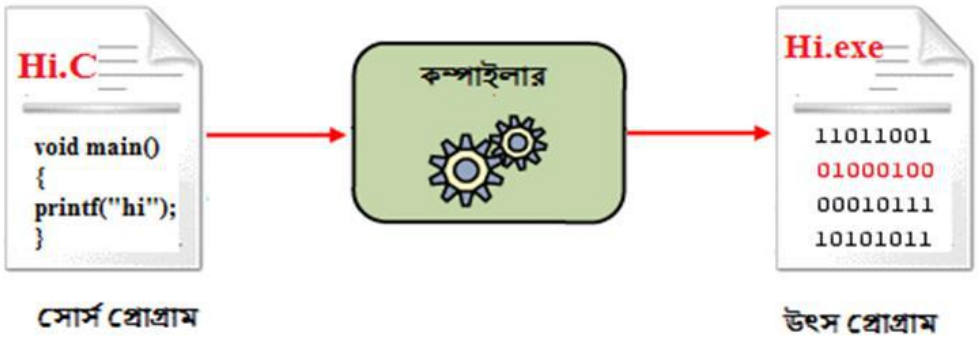

কম্পাইলারের সুবিধা

- কম্পাইলার উৎস প্রোগ্রামের পুরোটাকে একসাথে মেশিনের নির্বাহের উপযোগী করে বস্তু প্রোগ্রামে রূপান্তর করে ।
- উৎস প্রোগ্রামের ভুল কোথায় হয়েছে তা চিহ্নিত করে এর সংশোধন অনেক সহজ হয় ।
- এতে ইন্টারপ্রিটারের তুলনায় অনেক কম সময় লাগে ।

কম্পাইলারের অসুবিধা

উৎস প্রোগ্রামটিকে একেবারে বস্তু প্রোগ্রামে রূপান্তর করে এবং ভুল সনাক্ত করে । ফলে ধাপে ধাপে ভুল সনাক্তও সংশোধন করা যায় না । এতে অনেক বেশি মেমোরির প্রয়োজন হয় ।

কম্পাইলার ও ইন্টারপ্রিটারের পার্থক্য

	কম্পাইলার	ইন্টারপ্রিটার
১	উচ্চস্তরের ভাষায় লেখা কোনো উৎস প্রোগ্রামকে একেবারে পুরোটাকে বস্তু প্রোগ্রামে রূপান্তর করার জন্য যে অনুবাদ প্রোগ্রাম কাজ করে তাকে কম্পাইলার বলে ।	উচ্চস্তরের ভাষায় লেখা কোনো প্রোগ্রামকে সরাসরি লাইন বাই লাইন নির্বাহের জন্য যে অনুবাদক প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয় তাকে ইন্টারপ্রিটার বলে ।
২	কম্পাইলার একটি উৎস প্রোগ্রামের পুরোটাকে মেশিনের নির্বাহের উপযোগী করে বস্তু প্রোগ্রামে রূপান্তর করে ।	ইন্টারপ্রিটার উৎস প্রোগ্রামের প্রতিটি লাইন পড়ে এবং মেশিন ভাষায় অনুবাদ করে প্রসেসরকে দেয় ।
৩	কম্পাইলার উৎস প্রোগ্রামের জন্য বস্তু প্রোগ্রাম তৈরি করে ।	ইন্টারপ্রিটার উৎস প্রোগ্রামের জন্য কোনো বস্তু প্রোগ্রাম তৈরি না করে উৎস প্রোগ্রামকে রান করানোর জন্য প্রসেসর ও প্রোগ্রামের মধ্যে একটি মিডিয়া হিসেবে কাজ করে ।
৪	প্রোগ্রাম নির্বাহে কম সময় প্রয়োজন পড়ে ।	প্রোগ্রাম নির্বাহে বেশি সময় প্রয়োজন পড়ে ।
৫	একবার কম্পাইল করার পর পুণরায় কম্পাইল বা রূপান্তর করার প্রয়োজন হয় না ।	প্রতিবার কাজের পূর্বে পুনঃরূপান্তরের প্রয়োজন হয় ।

৫.৪ প্রোগ্রাম সংগঠন ও প্রোগ্রাম তৈরির ধাপসমূহ

প্রোগ্রাম সংগঠন (Organization of Program)

একটি প্রোগ্রাম কীভাবে সংগঠিত হয় অর্থাৎ প্রোগ্রামের গঠন রীতিই মূলত প্রোগ্রামের সংগঠন। প্রত্যেক প্রোগ্রামে সাধারণত তিনটি অংশ রয়েছে। যথা-

১. ইনপুট
২. প্রসেস এবং
৩. আউটপুট

এ অংশগুলোর পারস্পরিক সমন্বয়ে প্রোগ্রাম তৈরি হয়।

১. **ইনপুট :** কোন নির্দিষ্ট ফলাফল পাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রোগ্রামে ব্যবহারের জন্য যে সমস্ত উপাত্ত বা ডাটা (যেমন- টেক্সট, সংখ্যা, ছবি, ভিডিও বা নির্দেশ ইত্যাদি) প্রদান করা হয় তাকে ইনপুট বলে।
২. **প্রসেস :** প্রোগ্রামে প্রদত্ত উপাত্ত বা ডাটা ফলাফলে পরিণত করার প্রক্রিয়াকে প্রসেস বলে। প্রসেসের মাধ্যমেই আসলে প্রোগ্রামটি কাজ করে। প্রোগ্রামের এই ধাপটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
৩. **আউটপুট:** প্রদত্ত উপাত্ত প্রসেস শেষে যা ফলাফল আকারে পাওয়া যায় তাকে আউটপুট বলে। এটি হচ্ছে প্রোগ্রামের সার্বিক ফলাফল। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই প্রোগ্রামের সাফল্য নির্ভর করে। ফলাফল যথার্থ না পেলে প্রোগ্রাম যথার্থ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি না।

চিত্র: প্রোগ্রাম সংগঠনের বিভিন্ন অংশ

প্রোগ্রাম উন্নয়নের ধাপ (Steps of Developing a Program)

যে কোনো প্রোগ্রাম মানেই সমস্যার সমাধান। তাই সে সমস্যা যথাযথভাবে সমাধান করার জন্য প্রোগ্রাম তৈরির পূর্বে একটি প্রোগ্রামের সামগ্রিক রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়। কাজটি সুন্দরভাবে সমাধানের জন্য পরিকল্পিত ও সুশৃঙ্খলভাবে কতগুলো নির্ধারিত ধারাবাহিকতা মেনে অগ্রসর হতে হয়। এ গুলোকে প্রোগ্রাম তৈরির ধাপ বলে। প্রোগ্রাম তৈরির ধাপসমূহ নিম্নরূপঃ

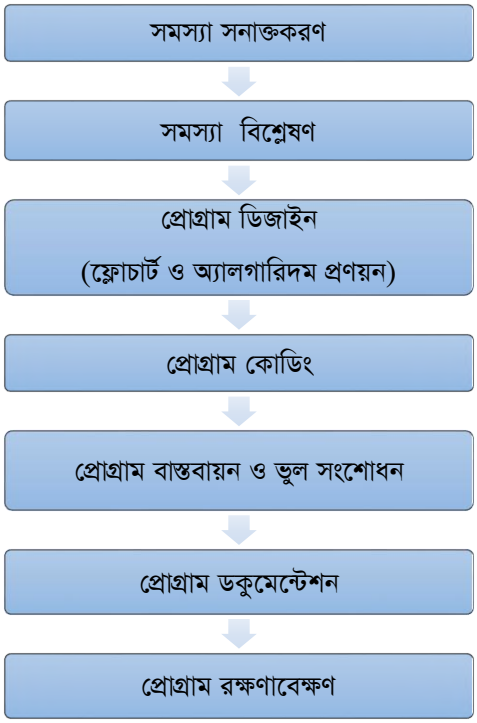

চিত্র: প্রোগ্রাম উন্নয়নের ধাপ

১. সমস্যা সনাক্তকরণঃ

প্রোগ্রামটি কী ধরণের কাজে ব্যবহৃত হবে অথাৎ কী ধরণের সমস্যা সমাধান করা হবে প্রথমেই নির্ধারণ করতে হবে। প্রোগ্রামের প্রকৃতি কেমন হবে তার একটি সুস্পষ্ট বর্ণনা থাকবে সমস্যা সনাক্তকরণ ধাপে। সঠিকভাবে সমস্যা সনাক্তকরণের মাধ্যমেই কার্যকরি প্রোগ্রাম রচনার ভিত তৈরি করা যায়।

২. সমস্যা বিশ্লেষণঃ

সনাক্তকৃত সমস্যাটি সমাধানের জন্য কী করণীয় তা নির্ধারিত হয় এ ধাপে। সমস্যার কাঠামোগত বর্ণনা, গাণিতিক মডেল, কি ধরণের আউটপুট আসবে ইত্যাদির বিস্তারিত বর্ণনা থাকবে সমস্যা বিশ্লেষণ ধাপে। এ ধাপে সমস্যাকে ছোট ছোট অংশে ভাগ এবং প্রয়োজনে গাণিতিক মডেল তৈরি করা হয়।

৩. প্রোগ্রাম ডিজাইনঃ

প্রোগ্রাম ডিজাইন ধাপটি সমস্যা সমাধানের পথ তৈরি করে দেয়। ফলে এ ধাপটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ধাপে প্রোগ্রামটি কীভাবে বিন্যস্ত হবে এবং কীভাবে এর কার্যধারা এগিয়ে যাবে তার একটি স্ট্রাকচার তৈরি করতে হয়। অর্থাৎ এ ধাপে প্রোগ্রামের ধারাবাহিক বর্ণনা বা অ্যালগরিদম এবং চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ বা ফ্লোচার্ট তৈরি করে প্রোগ্রামের সমস্যা সমাধানের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়। এ ধাপে প্রয়োজনে ছদ্মকোড বা সুডোকোড লিখে প্রোগ্রামটির সমধান কৌশল নির্ধারণ করা হয়।

৪. প্রোগ্রাম কোডিং

প্রোগ্রাম ডিজাইন অনুযায়ী অর্থাৎ ফ্লোচার্ট ও অ্যালগারিদম অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহার করে প্রোগ্রামটি লিখা হয় এ ধাপে। অর্থাৎ এ ধাপে প্রোগ্রাম কোডিং করা হয়।

৫. প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন ও ভুল সংশোধনঃ

প্রোগ্রাম লিখার পর প্রোগ্রামটি ঠিকমত কাজ করে কিনা অর্থাৎ প্রোগ্রামের কার্যকারিতা যাচাই করা হয় এ ধাপে। প্রোগ্রামের কোডিং-এ কোনো ভুল থাকলে তা সংশোধনও করে নেয়া হয় এ ধাপে। এর ফলে প্রোগ্রামটি সম্পূর্ণভাবে কাজ করার উপযোগী হয়।

৬. প্রোগ্রাম ডকুমেন্টেশনঃ

ভুল সংশোধন করার পর অর্থাৎ ত্রুটিমুক্ত করার পর প্রোগ্রামটি রান করা হয় এবং প্রোগ্রামের ডকুমেন্টেশন করা হয়। অর্থাৎ পরিপূর্ণভাবে প্রোগ্রামটি লিপিবদ্ধ বা চুড়ান্ত করা হয় এ ধাপে।

৭. প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণঃ

একেকটি প্রোগ্রামে সঠিকভাবে কাজ করার পরও এর বিভিন্ন ফিচারের উন্নয়ন করতে হয় কিংবা অতিরিক্ত ফিচার যুক্ত করতে হয়। অর্থাৎ এ ধাপে প্রোগ্রামটি নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করার মাধ্যমে এটিকে আপডেটেড রাখা হয়। প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ খুবই গুরুত্বপুর্ণ একটি ধাপ।

৫.৫ অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট

প্রোগ্রাম তৈরির গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হচ্ছে প্রোগ্রাম ডিজাইন। প্রোগ্রামার কোনো প্রোগ্রামের কোড লিখার পূর্বে প্রোগ্রামটিকে সমাধান করার জন্য এক ধরণের পরিকল্পনা করে এই ধাপে। মূলত কোডে যাওয়ার আগেই প্রোগ্রামটির ব্লুপ্রিন্ট করা হয় এই ধাপে। এ ধাপটি দুটি অংশে বিভক্ত। যথা -

(১) অ্যালগারিদম ও

(২) ফ্লোচার্ট

অ্যালগরিদমঃ

প্রোগ্রাম ডিজাইন পর্যায়ে কোনো সমস্যা সমাধানের আগে সে সমস্যাটিকে সহজে ও কম সময়ে সমাধানের উদ্দেশ্যে কিছু সুনির্দিষ্ট ধাপ অনুসরণ করে সমস্যাটিকে বিন্যস্ত করাকে অ্যালগরিদম বলে। অন্য কথায়, সমস্যা সমাধানের যুক্তিসম্মত ও পর্যায়ক্রমিক ধারা বর্ণনাকে অ্যালগরিদম বলে।

অ্যালগরিদমকে রান্নার রেসিপির সাথে তুলনা করা যায়। রেসিপিতে যেমন রান্নার উপকরণ থেকে শুরু করে রান্নার পদ্ধতি পুরোপুরি বর্ণনা থাকে তেমনি কোনো প্রোগ্রাম রচনার আগে প্রোগ্রামটিকে সম্পূর্ণরূপে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয় অ্যালগরিদমে। অ্যালগরিদমের সবগুলো ধাপকে প্রোগ্রাম ভাষায় লিখলেই সেটি প্রোগ্রামে পরিণত হয়। ফলে প্রোগ্রামারের প্রোগ্রাম তৈরি করতে অনেক সুবিধা হয়।

অ্যালগরিদম লেখার নিয়মঃ

অ্যালগরিদম লেখার ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। প্রোগ্রামের বিষয় বা সমস্যাটি নির্ধারণ করে এর শিরোনাম দিতে হয়। অ্যালগরিদমে সমস্যাটিকে বিশ্লেষণ করে তা সমাধানের পথ নির্দেশ করা হয়। সমস্যা যদি বড় হয় তবে অ্যালগরিদমে তাকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করা হয়। এছাড়া অ্যালগরিদমের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত চারটি নিয়ম মেনে চলতে হয়:

১. অ্যালগরিদম হতে হবে সহজবোধ্য।
২. অ্যালগরিদমের কোনো ধাপই দ্ব্যর্থবোধক হবে না। প্রত্যেকটি ধাপ হবে সুস্পষ্ট যাতে সহজেই প্রোগ্রামার তা বুঝতে পারে।
৩. সসীম সংখ্যক ধাপে সমস্যার সমাধান করতে হবে।
৪. অ্যালগরিদম যেন ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করার উপযোগী হয়।

অ্যালগরিদমের সুবিধা

১. প্রোগ্রাম সহজে বোঝা যায়।
২. যে কোনো ধরণের ভুল নির্ণয়ে অ্যালগরিদম সাহায্য করে।
৩. বড় প্রোগ্রামকে ধাপে ধাপে উপস্থাপনের ফলে প্রোগ্রাম লিখতে সাহায্য করে।
৪. প্রোগ্রামে কোনো পরিবর্তন করতে অ্যালগরিদম দেখে করা সম্ভব হয়।

অ্যালগরিমের অসুবিধা

১. অ্যালগরিদমের মাধ্যমে প্রোগ্রামের গতিধারা বুঝতে অসুবিধা হয়।
২. সময় বেশি লাগে।

উদাহরণঃ ৫টি সংখ্যা যোগ করার একটি অ্যালগরিদম নিম্নরূপ:

ধাপ ১: শুরু ।

ধাপ ২: ইনপুট হিসেবে A , B, C, D এবং E চলকের মানগ্রহণ কর।

ধাপ ৩: চলকগুলোর মান যোগ কর।

ধাপ ৪: ফলাফল হিসেবে S চলকের মান প্রদর্শণ কর।

ধাপ ৫: শেষ।

ফ্লোচার্টঃ

চিত্রের মাধ্যমে কোনো সমস্যা সমাধানের গতিধারা উপস্থাপন করাকে ফ্লোচার্ট বা প্রবাহ চিত্র বলে। মূলতঃ অ্যালগরিদমের চিত্ররূপকে ফ্লোচার্ট বলে। অ্যালগরিদমের মাধ্যমে বর্ণিত প্রোগ্রামটিকে আরও বোধগম্য করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আকৃতির কতগুলো জ্যামিতিক চিত্র ব্যবহার করে ফ্লোচার্ট আঁকতে হয়। ফ্লোচার্টের মাধ্যমে প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের কাজ স্পষ্ট হয়।

ফ্লোচার্ট সাধারণত দুই ধরণের। যথা -

(১) সিস্টেম ফ্লোচার্ট ও

(২) প্রোগ্রাম ফ্লোচার্ট।

সিস্টেম ফ্লোচার্টঃ

কোনো সংস্থা বা সংগঠনের সকল কাজের ধারাবাহিকতা একটি চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করলে তাকে সিস্টেম ফ্লোচার্ট বলে। এ ধরণের ফ্লোচার্টের সমস্ত কাজ কম্পিউটার ভিত্তিক নাও হতে পারে।

সিস্টেম ফ্লোচার্টে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের প্রতীক

সিস্টেম ফ্লোচার্টের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিশেষ কতগুলো প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যেমনঃ

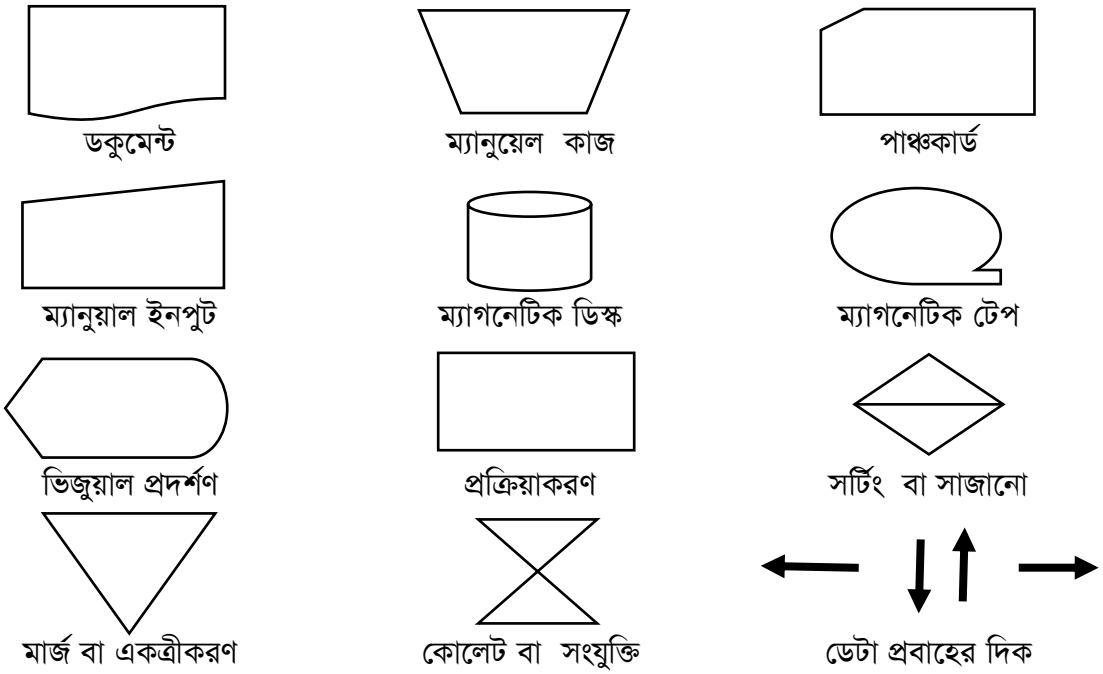

প্রোগ্রাম ফ্লোচার্ট

প্রোগ্রাম লিখার আগে প্রোগ্রাম ডিজাইন পর্যায়ে প্রোগ্রামের ধারাবাহিক কার্যাবলি চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপনকে প্রোগ্রাম ফ্লোচার্ট বলে। প্রোগ্রাম ফ্লোচার্টের সকল কার্যধারা কম্পিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রোগ্রামার সিস্টেম ফ্লোচার্ট দেখে সহজেই প্রোগ্রাম লিখতে পারেন।

প্রোগ্রাম ফ্লোচার্টে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের প্রতীক

প্রোগ্রাম ফ্লোচার্টের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিশেষ কতগুলো প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যেমন:

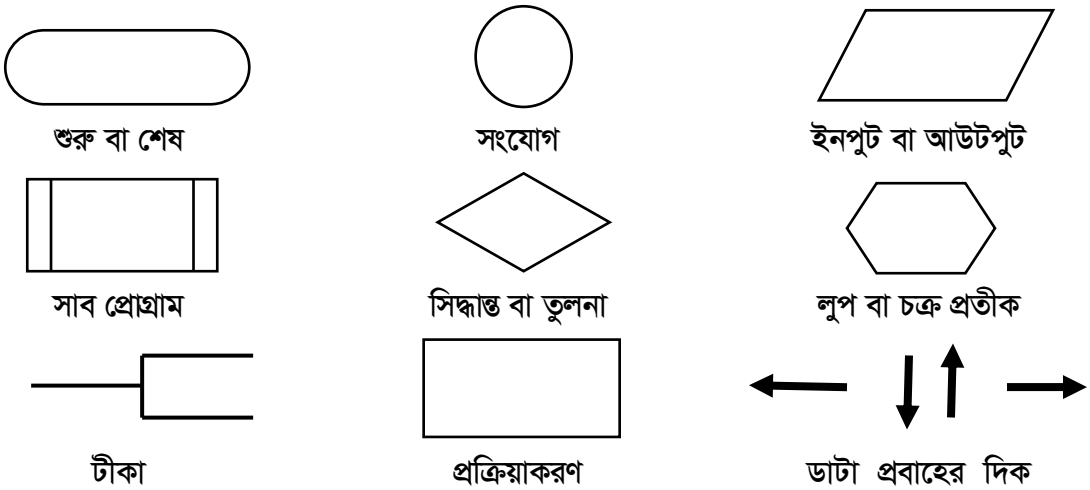

ফ্লোচার্ট লেখার নিয়মঃ

ফ্লোচার্ট লেখার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কিছু নিয়ম আছে। যথাঃ

১. প্রতিটি ফ্লোচার্টের একটি নাম দিতে হবে।

২. ফ্লোচার্টের একটি শুরু ও একটি শেষ চিহ্ন দিতে হবে।

৩. ফ্লোচার্ট অঙ্কনের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু জ্যামিতিক প্রতীক ব্যবহার করতে হবে। প্রতীক অংকনের ক্ষেত্রে আকার ভিন্ন থাকলেও আকৃতি অবিকৃত থাকতে হবে।

৪. ফ্লোচার্টের প্রবাহ নির্দেশে উপর থেকে নিচে বা বাম থেকে ডান দিকে তীর চিহ্ন দিয়ে দেখাতে হবে।

৫. প্রতীকের ভিতরের লেখা বা নির্দেশনা সহজবোধ্য ও সংক্ষিপ্তভাবে লিখতে হবে যাতে প্রোগ্রামার সহজে বুঝতে পারে। প্রয়োজনে বিস্তারিত বর্ণনার জন্য আলাদাভাবে সেটি উল্লেখ করতে হয়।

৬. জটিল সমস্যার ক্ষেত্রে ফ্লোচার্ট একাধিক পৃষ্ঠায় আকার প্রয়োজন হলে এক পৃষ্ঠা হতে অন্য পৃষ্ঠায় যাওয়ার সময় ফ্লোচার্টের পৃষ্ঠা শেষে সংযোগ চিহ্ন (বৃত্ত) দিতে হয়। আবার পরের পৃষ্ঠার শুরুতে বাকি ফ্লোচার্টটি লেখার পূর্বে আরেকটি সংযোগচিহ্ন দিতে হয়।

উদাহরণঃ ৫টি সংখ্যা যোগ করার একটি অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট নিম্নরূপঃ

ধাপ ১: শুরু।

ধাপ ২: ইনপুট হিসেবে A , B, C, D এবং E চলকের মান গ্রহণ কর।

ধাপ ৩: চলকগুলোর মান যোগ কর।

ধাপ ৪: ফলাফল হিসেবে S চলকের মান প্রদর্শণ কর।

ধাপ ৫: শেষ।

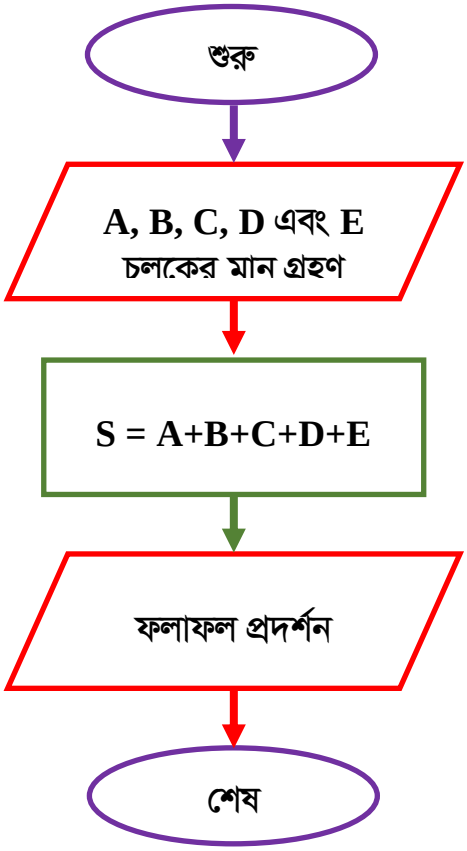

চিত্রঃ ৫টি সংখ্যা যোগের অ্যালগরিদম

অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্টের মধ্যে পার্থক্য ঃ

	অ্যালগারিদম	ফ্লোচার্ট
১	কম্পিউটারে কোন সমস্যা সমাধানের পূর্বে সমস্যাটিকে সহজে ও অল্প সময়ে সমাধানের জন্য যে সুনির্দিষ্ট কিছু ধাপে সমস্যাটিকে বিন্যস্ত করা হয় তাকে অ্যালগরিদম বলে।	চিত্রের মাধ্যমে কোনো সমস্যা সমাধানের গতিধারা উপস্থাপন করাকে ফ্লোচার্ট বা প্রবাহ চিত্র বলে।
২	অ্যালগরিদমে প্রোগ্রামের বিভিন্ন ধাপ বর্ণনা আকারে লিখতে থাকে।	ফ্লোচার্টে কতগুলো জ্যামিতিক বা সাংকেতিক প্রতীকের মাধ্যমে প্রোগ্রামের ধাপগুলো অংকন করা থাকে।
৩	অ্যালগারিদম রচনার পূর্বে সুডোকোড বা ছদ্ম প্রোগ্রাম তৈরির প্রয়োজন হতে পারে।	সাধারণত ফ্লোচার্ট রচনার জন্য কোনো সুডোকোডের প্রয়োজন হয় না।
৪	ফ্লোচার্ট লিখার পূর্বে অ্যালগরিদম বর্ণনা করতে হয়।	অ্যালগরিদম অনুসরণে ফ্লোচার্ট অংকন করা হয়।
৫	অ্যালগরিদমের মাধ্যমে কোনো সমস্যার সমাধান উল্লেখ করলে অনেক সময় তা সহজে বোধগম্য নাও হতে পারে।	অ্যালগরিদমকে সহজবোধ্য করার জন্য চিত্রের মত উপস্থাপনের প্রয়োজন পড়ে। এর জন্য ফ্লোচার্ট ব্যবহার করে প্রোগ্রামটি সমাধানের পথ সহজে বোঝা যায়।

৫.৬ প্রোগ্রাম ডিজাইন মডেল

প্রোগ্রামিংয়ের কাজটিকে সহজে ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্নভাবে প্রোগ্রাম রচনা করা হয়। প্রোগ্রামের এরূপ গঠনশৈলীকে প্রোগ্রাম ডিজাইন মডেল বলা হয়। প্রোগ্রামের বিভিন্ন চাহিদার কারণে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম ডিজাইন মডেল রয়েছে। সহজে ও পরিচ্ছন্নভাবে প্রোগ্রাম লিখার জন্য এসব মডেল ব্যবহৃত হয়।

বিভিন্ন ধরণের প্রোগ্রাম ডিজাইন মডেল

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রোগ্রামিং মডেল হচ্ছে:

১. স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং (Structured Programming)
২. অবজেক্ট ওরিয়েন্ট প্রোগ্রামিং (Object Oriented Programming)
৩. ইভেন্ট ড্রিভেন প্রোগ্রামিং (Event Driven Programming)
৪. ভিজ্যুয়াল প্রোগ্রামিং (Visual Programming)

১. স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং মডেল

স্ট্রাকচার্ড মডেলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলে পুরো সমস্যাটিকে কতগুলো অংশে বা মডিউলে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে এর সমাধান করা হয়। প্রতিটি অংশে প্রয়োজন অনুযায়ী স্টেটমেন্ট থাকে এবং প্রতিটি অংশই স্বতন্ত্রভাবে কাজ করে। স্ট্রাকচার্ড মডেল একটি টপ-ডাউন ডিজাইন মডেল। এ প্রোগ্রামিংয়ের নিয়ন্ত্রণ উপর থেকে নীচে পরিচালিত হয়। পাশাপাশি একই সাথে পরিচালিত হয় না। স্ট্রাকচার্ড মডেলে পুরো প্রোগ্রামটিকে পৃথক সাবসেকসন বা মডিউলে বিভক্ত করে লেখা হয়। এর প্রত্যেকটি সেকশন বা মডিউল ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে। তবে বিভিন্ন মডিউল একে অন্যের সাথে লুপ, কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট ইত্যাদির মাধ্যমে যুক্ত থাকে। লুপিং স্ট্রাকচার হিসেবে যেমন- "for", "repeat" এবং "while" ব্যবহৃত হয় কিন্তু "go to" স্টেটমেন্ট ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা হয়। মডিউলগুলোর মধ্যে একটি মূল মডিউল থাকে। মূল মডিউল নির্বাহযোগ্য স্টেটমেন্টের সাহায্যে অন্যান্য মডিউল নির্বাহ করার পর আবার মূল মডিউলে ফিরে আসে। এডগার ডি কস্ট্রা প্রথম বড় আকারের প্রোগ্রাম সহজে উন্নয়নের উদ্দেশ্যে স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং মডেলের ধারণা দেন। এ মডেলে একবার কোনো কোড লিখে ভিন্ন ভিন্ন মডিউলে তা একাধিকবার কাজে লাগানো যায়। ফলে সময় ও পরিশ্রম বেঁচে যায়। প্রোগ্রামের নির্দিষ্ট কাঠামো থাকায় ডিবাগিং বা প্রোগ্রামের ভুল সংশোধন এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহজ হয়। ফরট্রান, সি, প্যাস্কেল, ফক্সপ্রো ইত্যাদি প্রোগ্রামিং ভাষা এ মডেলটি সমর্থন করে।

স্ট্রাকচার প্রোগ্রামে তিন ধরণের কাঠামো ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ

ক) পর্যায়ক্রমিক কাঠামো
খ) সিদ্ধান্তমূলক কাঠামো
গ) চক্রাবর্ত কাঠামো

ক) পর্যায়ক্রমিক কাঠামো

এ কাঠামোতে প্রোগ্রামের বা মডিউলের একটির পর একটি ধারাবাহিকভাবে নির্বাহ হয়। এতে নির্দেশের ধারাবাহিকতা বা পর্যায় বিঘ্নিত হয় না। নিচের চিত্রে পর্যায়ক্রমিক কাঠামোর ধারা দেখানো হলো। নির্দেশ-১ নির্বাহ করার পর সয়ংক্রিয়ভাবে পরবর্তী নির্দেশ অর্থাৎ নির্দেশ-২ নির্বাহ হবে। শুধুমাত্র পর্যায়ক্রমিক কাঠামো দিয়ে সব ধরণের প্রোগ্রাম রচনা করা সম্ভব হয় না।

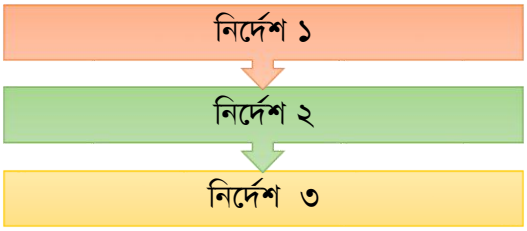

চিত্র: পর্যায়ক্রমিক কাঠামো

খ) সিদ্ধান্তমূলক কাঠামো

এ কাঠামো একটি নির্দিষ্ট শর্তের উপর নির্ভর করে কাজ করে। যদি শর্তটি সত্য হয়, তাহলে একটি স্টেটমেন্ট বা নির্দেশ নির্বাহ হয়। আর শর্তটি মিথ্যা হলে অন্য আরেকটি নির্দেশ নির্বাহ হয়। সিদ্ধান্তমূলক কোনো কাজ সম্পন্ন করার প্রয়োজনে এ কাঠামো ব্যবহার করা হয়।

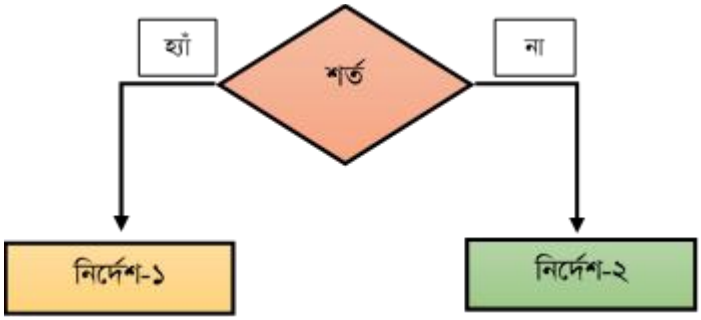

চিত্র: সিদ্ধান্তমূলক কাঠামো

গ) চক্রাবর্ত কাঠামো

চক্রাবর্ত কাঠামোকে 'লুপ' বলা হয়। এক বা একাধিক নির্দেশ বা স্টেটমেন্ট বারবার নির্বাহ করার প্রয়োজনে লুপ বা চক্রাবর্ত মডেল ব্যবহৃত হয়। লুপ ব্যবহার করার ফলে একটি নির্দেশ বারবার লিখতে হয় না। এক বা একাধিক নির্দেশকে শর্তহীনভাবে নির্দিষ্ট সংখ্যকবার বা শর্তের অধীনে অনির্দিষ্টবার নির্বাহ করা যায়। নির্দেশ-১ একবার নির্বাহ হওয়ার পর যদি শর্ত জুড়ে দেওয়া হয় তাহলে তা বারবার নির্বাহ হতে পারে।

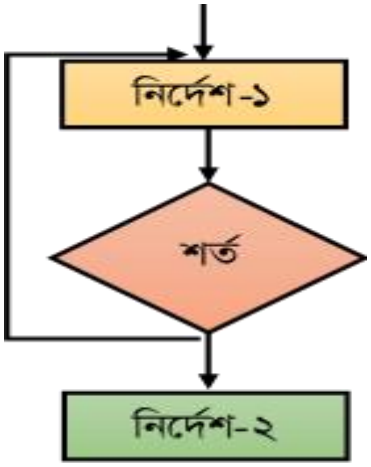

চিত্রঃ চক্রাবর্ত কাঠামো

২. অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং (OOP)

প্রোগ্রামিং মডেলগুলোর মধ্যে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং মডেল নতুন এবং খুব জনপ্রিয়। সমস্যা যত জটিল হোক না কেন অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং মডেলে সমস্যাটিকে সহজ থেকে সহজতর অংশে ভাগ করা হয়। সাধারণ প্রোগ্রামে ডাটা ও কোডকে আলাদা বলে চিহ্নিত করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রোগ্রামের বিভিন্ন চলককে ব্যবহার করে। কোনো মডিউল অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল চলকের মান ব্যবহার করতে পারে বা তার মানের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। এটি প্রতিরোধ করার জন্য কার্যকরি কোনো উপায় স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং মডেলে ছিল না। অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং মডেলে ডাটা ও সংশ্লিষ্ট কোডকে একক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ ধরণের একককে 'ক্লাস' বলা হয়। এ মডেলে এক ক্লাসের ডাটা অন্য ক্লাসের কাছে অদৃশ্য। ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল চলকের ভুল মান ব্যবহার কোনো ভাবেই সম্ভব না। এক একটি ক্লাস দ্বারা এক একটি ধরন বুঝায়। ক্লাসে কোনো ডাটা রেখে নির্বাহ করতে হলে নির্দিষ্ট ক্লাসের অবজেক্ট তৈরি করতে হয়। অবজেক্টের বিভিন্ন কোডকে নির্বাহ করানোর জন্য সংশ্লিষ্ট অবজেক্টে বিশেষ বার্তা পাঠানো হয়। কোনো প্রোগ্রাম উন্নয়নের সময় ক্লাসগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয়, যাতে তা বাস্তব সমস্যাকে সহজভাবে উপস্থাপন করতে পারে। সব ধরণের প্রোগ্রামিং ভাষা OOP মডেল সমর্থন করে না। কোনো প্রোগ্রামিং ভাষাকে পরিপূর্ণ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ভাষা হতে হলে তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

(ক) ইনহেরিটেন্স

যে ব্যবস্থায় প্রচলিত কোন ক্লাসের কোন পরিবর্তন না করে পরিবর্ধিত নতুন ক্লাস সৃষ্টি করা যায় যাতে নতুন সৃষ্ট ক্লাসে পিতৃক্লাসের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে তাকে ইনহেরিটেন্স বলে। OOP মডেলে অবশ্যই ইনহেরিটেন্স থাকতে হবে।

(খ) এনক্যাপসুলেশন

কোনো চলকের ডাটা এবং নির্দেশনা একত্রিত অবস্থায় থাকাকে এনক্যাপসুলেশন বলে। যে চলকের জন্য যে ডাটা সে চলকের বাইরে তা অদৃশ্য থাকে। ফলে প্রোগ্রামে এসব ডাটার কোনো প্রভাব পড়ে না।

(গ) পলিমরফিজম

পলিমরফিজম অর্থ বহুরূপতা। এ বৈশিষ্ট্যের জন্য কোনো মডিউলের নাম এক হলেও একাধিক ব্যবহারজনিত রূপ থাকতে পারে। কখন কোন রূপটি ব্যবহৃত হবে তা কম্পাইলার নির্ণয় করবে। এ বৈশিষ্ট্যের কারণে একই অপারেটর ভিন্ন ধরণের ডাটার ওপর প্রয়োগ করা যেতে পারে। সঠিক ডাটা নিরূপন করা কম্পাইলারের দায়িত্ব।

OOP ব্যবহারের সুবিধা

- ইনহেরিটেন্সের মাধ্যমে প্রচলিত ক্লাসকে বর্ধিত করে নতুন ক্লাস তৈরি করা যায়। ফলে কম কোডে বেশি কাজ করা যায়।
- ডাটা লুকিয়ে থাকে বলে অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন সম্ভব না। এতে ভুলের সম্ভাবনা থাকে না।
- সহজেই ছোট থেকে বড় প্রোগ্রাম উন্নয়ন করা যায়। একই কোড বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা যায়।
- প্রোগ্রামের জটিলতা সহজেই সামলানো যায়। এতে বড় বড় প্রোগ্রাম তৈরি সহজ হয়েছে।

৩. ইভেন্ট ড্রাইভেন প্রোগ্রামিং

চিত্রভিত্তিক প্রোগ্রামিংয়ের একটি প্যাটার্ন হচ্ছে 'ইভেন্ট ড্রাইভেন প্রোগ্রামিং'। ইভেন্ট হচ্ছে প্রোগ্রামে ব্যবহৃত কোনো অবজেক্টকে কার্যকরি করার এক ধরণের পদ্ধতি। এ মডেলে একাধিক ইভেন্ট সংযোজন করে মূল প্রোগ্রাম তৈরি করা হয়। এ ধরণের অবজেক্ট ও ইভেন্ট ব্যবহার করে প্রোগ্রামে নির্দিষ্ট কোনো কার্য সম্পাদন করা যায়। বর্তমানে প্রচলিত উইন্ডোজ ভিত্তিক এপ্লিকেশনগুলো ইভেন্ট ড্রাইভেন প্রোগ্রামিং পদ্ধতির ফসল।

৪. ভিজ্যুয়াল প্রোগ্রামিং

ভিজ্যুয়াল অর্থ দৃশ্যমান। গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস সমৃদ্ধ পরিবেশে অর্থাৎ চিত্রভিত্তিক প্রোগ্রামিং পরিবেশে যে প্রোগ্রামিং ভাষা কাজ করতে পারে তাকে ভিজ্যুয়াল প্রোগ্রামিং মডেল বলে। এ ধরণের প্রোগ্রামে অবজেক্টগুলো দৃশ্যমান হওয়ায় সেগুলো চোখে দেখে উইন্ডোর কাঙ্খিত অবস্থানে স্থাপন করা যায়। ফলে প্রোগ্রামিং করা সহজ হয়। ব্যবহারকারী পর্দায় দেওয়া মেন্যু বা চিত্র নির্ভর কমান্ড যেমন কম্বো বক্স (Combo Box), টেক্সট বক্স (Text Box), কন্ট্রোল বাটন (Control Button) ইত্যাদি ব্যবহার করে প্রোগ্রাম রচনা করতে পারে। এটি আসলে কোনো মডেল নয়, এটি মূলত অবজেক্ট অরিয়েন্টেড এবং ইভেন্ট ড্রাইভেন প্রোগ্রামিং এর যৌথ প্রয়াস।

যেমনঃ ভিজ্যুয়াল বেসিক, ভিজ্যুয়াল সি++ ইত্যাদি ।

৫.৭ সি প্রোগ্রাম - প্রাথমিক আলোচনা

সি প্রোগ্রামিং ভাষা

সি এক ধরণের স্ট্রাকচার বা প্রসিকিউর ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। সি একটি মধ্যম স্তরের ভাষা। আমেরিকার বিখ্যাত বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরি AT & Tএর দুজন বিখ্যাত প্রোগ্রামার ব্রিয়ান কার্নিহান এবং ডেনিস রিচি ১৯৭০ সালে সি ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি করেন। সি ল্যাঙ্গুয়েজটি মার্টিন রাইকার্ডস এর উদ্ভাবিত BCPL প্রোগ্রাম ভাষা থেকে উদ্ভব হয় বলে এর আদ্যক্ষর B এর পরের অক্ষর C কে গ্রহণ করা হয়েছে।

সি প্রোগ্রামিং ভাষার বৈশিষ্ট্যঃ

বিভিন্ন ধরণের বৈশিষ্ট্যের জন্য 'সি' আজ খুব জনপ্রিয় প্রোগ্রামিং ভাষা। কারণ 'সি'-তে উচ্চ পর্যায়ের ভাষার সুবিধাদিসহ নিম্ন পর্যায়ের ভাষার সমন্বয় ঘটানো যায়। এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো:

- সি একটি মধ্যম স্তরের ভাষা। এ ভাষায় কম্পিউটারের বিট পর্যায়ের প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে হার্ডওয়্যার নিয়ন্ত্রণ ও সিস্টেম প্রোগ্রাম রচনা করা যায়।
- সি দিয়ে সব ধরণের কাজের জন্য প্রোগ্রাম তৈরি করা যায়। তাই একে General Purpose Language বলা হয়।
- সি ল্যাংগুয়েজে মূল সমস্যাকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে প্রতিটি ভাগে প্রয়োজনীয় ভ্যারিয়েবল, ফাংশন, কন্ট্রোল স্টেটম্যান্ট ব্যবহার করা যায়। এই কারণে সি-কে স্ট্রাকচার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয়।
- সি ভাষায় অনেক লাইব্রেরি ফাংশন আছে যা ব্যবহার করে প্রোগ্রামারেরা প্রোগ্রাম লিখতে সুবিধা পায়।
- সি ভাষায় অল্প সংখ্যক কী ওয়ার্ড দিয়ে লিখা হয় এবং এর শুরু হয় main( ) ফাংশন-এর মাধ্যমে।
- সি প্রোগ্রাম দিয়ে লিখা প্রোগ্রাম বিভিন্ন মেশিনে ব্যবহার করা যায়।
- সি ভাষায় বিট পর্যায়ের প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে হার্ডওয়্যার নিয়ন্ত্রণ ও সিস্টেম প্রোগ্রাম রচনা করা যায়।
- সি ভাষা কেস সেন্সিটিভ। ফলে ইংরেজি বড় বা ছোট হাতের আইডেন্টিফায়ারগুলো ভিন্ন ভিন্ন অর্থ নির্দেশ করে। যেমন, name ও Name বা sum()ও SUM () যথাক্রমে ভিন্ন ভেরিয়েবল ও ফাংশন বুঝায়।

সি ভাষার ব্যবহার

সি ভাষায় রচিত প্রোগ্রাম অপেক্ষাকৃত কার্যকর ও বহুমুখী। তাই বিবিধ প্রোগ্রাম তৈরির উদ্দেশ্যে সি ভাষা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত অপারেটিং সিস্টেমগুলি প্রায় সবই সি ভাষা দিয়ে তৈরি। সি ভাষায় অ্যাসেম্বলি এবং উচ্চতর প্রোগ্রাম ভাষার মধ্যে এক ধরণের সমন্বয় করা যায়। এর ফলে এ ভাষাটি মধ্যম স্তরের ভাষা হিসেবে সিস্টেম প্রোগ্রাম তৈরিতেও বহুভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সি ভাষাকে কম্পিউটার ভাষার প্রাণ বলে অভিহিত করা হয়। সি ভাষা দিয়ে যেসব প্রোগ্রাম লেখা যায় তা হলো-

- অপারেটিং সিস্টেম
- সিস্টেম সফটওয়্যার
- ডেটাবেজ প্রোগ্রাম

- কম্পিউটার গেমস
- নেটওয়ার্ক ড্রাইভারস
- ভাইরাস ও এন্টিভাইরাস
- এপ্লিকেশন প্রোগ্রাম
- বিভিন্ন ধরণের অনুবাদক প্রোগ্রাম ইত্যাদি ।

সি এর সীমাবদ্ধতা

আশির দশকে মধ্য স্তরের ভাষা হিসেবে সি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল । তবে বর্তমানে প্রচলিত অনেক প্রোগ্রাম ভাষা অপেক্ষা সি এর Reliability এবং Portability-এর কিছু কমতি আছে । সি এর প্রধান সীমাবদ্ধতা হলো এটি প্লাটফর্ম নির্ভর । সি নির্দিষ্ট কিছু হার্ডওয়ার ও সফটওয়ারের গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় । তবে সি এর কম্পাইলার দ্বারা উৎপন্ন অবজেক্ট কোড পুরোপুরি মেশিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নয় । অর্থাৎ এক ধরণের মেশিন ও অপারেটিং সিস্টেম কর্তৃক অনুবাদিত প্রোগ্রাম সব ধরণের মেশিন ও অপারেটিং সিস্টেমে রান করে না । সি একটি ডস ভিত্তিক প্রোগ্রাম হওয়ায় উইন্ডোজ ভিত্তিক এপ্লিকেশন তৈরিতে সি-তে সয়ংক্রিয় অনেক সুবিধা পাওয়া যায় না । সি এর গ্রাফিক্যাল সিস্টেম কেবল স্থির চিত্র ও টেক্সট প্রদর্শনে সীমাবদ্ধ । বর্তমানে ইন্টারনেট ও ই-মেইলের যুগে সি www প্রযুক্তির সাথে তেমন সম্পর্কযুক্ত নয় । তবে সি++ আবির্ভাবের ফলে এর সীমাবদ্ধতা অনেকাংশে দূর হয়েছে ।

যদিও কিছু ক্ষেত্রে সি ভাষার সীমাবদ্ধতা আছে । তারপরেও বলা যায় - সি ইজ দ্যা বেস্ট ।

প্রোগ্রাম কম্পাইলিং (Compiling of Programs)

উচ্চস্তরের ভাষার কোনো প্রোগ্রামকে কম্পিউটারের মেশিনের বোঝার উপযোগী করাকে অর্থাৎ মেশিন ভাষায় রূপান্তরকে প্রোগ্রাম কম্পাইলিং বলা হয় । উচ্চ স্তরের ভাষা যেমন সি এর সোর্স কোডগুলোকে অবজেক্ট কোডে রূপান্তরের জন্য প্রোগ্রামটি কম্পাইলিং করতে হয় । সোর্স ফাইল কম্পাইলের সাথে সাথে সোর্স ফাইলের সাথে যুক্ত ফাইলগুলো এবং হেডার ফাইল একত্রে একটি অবজেক্ট (OBJ) ফাইল তৈরি হয় । কম্পাইলিংয়ের সময় সোর্স কোডে কোনো ধরণের ভুল থাকলে তা ধরিয়ে দেয় ।

সি ভাষার জনপ্রিয় কয়েকটি কম্পাইলার

কম্পাইলারের নাম	প্লাটফর্ম
Turbo C	Windows
Microsoft C	Windows
Boreland C	Windows
Code::Blocks	Cross-platform
ANSI C	Windows
GNU C Compiler	Windows, Unix
Xcode	Mac OS
CodeLite	Cross-platform

প্রোগ্রাম ডিবাগিং (Debugging of Programs)

Bug অর্থ পোকা আর Debugging অর্থ পোকা খোঁজা বা বাছা । অর্থাৎ প্রোগ্রামে কোনো ধরণের ভুল বা ত্রুটি খুঁজে বের করার প্রক্রিয়াকে ডিবাগিং বলা হয় । প্রোগ্রামে বিভিন্ন ধরণের ভুল হতে পারে । যেমন -

ক) ডাটা ভুল: প্রোগ্রামে কোনো ডাটাগতভুল থাকলে তাকে ডাটা ভুল বলা হয় । এতে প্রোগ্রাম যথাযথ কাজ করবে না । ডাটাভুল কম্পাইলার খুঁজে বের করতে পারে না ।

খ) সিনটেক্স ভুল: যে কোনো প্রোগ্রামিং ভাষার নির্দিষ্ট নিয়মকে সিনটেক্স বলা হয় । প্রোগ্রামার যদি সেই ব্যাকরণগত ভুল করেন তাকে সিনটেক্স ভুল বলা হয় । কম্পাইলার সিনটেক্স ভুল চিহ্নিত করতে পারে ।

গ) যুক্তিগত ভুল: প্রোগ্রামের যুক্তি সংক্রান্ত কোনো ভুলকে যুক্তিগত ভুল বলা হয় । এ ধরণের ভুলকে কম্পাইলার শনাক্ত করতে পারে না ।

সি প্রোগ্রামের গঠন (Structure of C Programs)

C প্রোগ্রাম main( ) ফাংশনসহ এক বা একাধিক udf বা ব্যবহারকারী কর্তৃক তৈরিকৃত ফাংশন দ্বারা গঠিত ।

চলুন আমরা সি প্রোগ্রামের বেসিক গঠন দেখি ।

Documentation Section
Link Section
Definition Section
Global Declaration Section
Main function section main( ) { Declaration part
Executive part
}
sub Program section sub_program( ) { Function 1 or statement 1
Function 2 or statement 2
--
Function n or statement n
}

ডকুমেন্টেশন সেকশন:

সি প্রোগ্রামের এই অংশে কোনো কমেন্ট করা হয় । এখানে প্রোগ্রামের শিরোনাম উল্লেখ করা হয় । এ ছাড়াও এখানে প্রোগ্রামার এর নাম, প্রোগ্রাম রচনার সময়কাল, প্রেগ্রামে ব্যবহৃত ভেরিয়েবল/কন্সটেন্ট/ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশনগুলোর প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাও প্রদান করা হয় । এক লাইনে কমেন্টের জন্য // ব্যবহার করা হয় । যদি একাধিক লাইন ব্যবহার করা হয় তাহলে /*myprogram ----- */ লিখতে হয় ।

লিংক সেকশন

সি প্রোগ্রামের এই অংশে প্রয়োজনীয় হেডার ফাইল যুক্ত করতে হয় । প্রোগ্রামে যে সমস্ত লাইব্রেরি ফাংশন (যেমন, printf(), scanf() ইত্যাদি) ব্যবহার করা হয়, তাদের বর্ণনা সরাসরি মূল প্রোগ্রামে থাকে না । বরং কতগুলো হেডার ফাইলে সংরক্ষিত থাকে । তাই ঐ সমস্ত লাইব্রেরি ফাংশন-এর বর্ণনা মূল প্রোগ্রামে include করার জন্য সংশ্লিষ্ট হেডার ফাইলগুলোকে এখানে যুক্ত করতে হয় । সি প্রোগ্রামের বাধ্যতামূলক হেডার ফাইল হচ্ছে: <stdio.h>

হেডার ফাইল সংযোগের নিয়ম: #include<header_file>

ডেফিনেশন সেকশন

অনেক সময় সি প্রোগ্রামে কিছু ধ্রুবক ব্যবহার করা হয় । ডেফিনেশন সেকশনে এসব ধ্রুবক ঘোষণা করতে হয় । সি প্রোগ্রামে ২ ভাবে কন্সটেন্ট ঘোষণা করা যায় । একটি হল const কি-ওয়ার্ড ব্যবহার করে আর অন্যটি হল #define প্রিপ্রসেসর ডিরেকটিভ ব্যবহার করার মাধ্যমে ।

const কিওয়ার্ড ব্যবহার করার ফর্ম্যাট নিম্নরূপ-

const datatype constantName=value;

```
const  float  pi=3.141;
```

এখানে pi নামে float ডাটা টাইপের একটি কন্সটেন্ট ঘোষণা করা হয়েছে যার মান 3.141 ।

#define কি-ওয়ার্ড ব্যবহার করার ফর্ম্যাট নিম্নরূপ-

#define constantName value

```
#define  pi  3.141
```

এখানে pi নামে একটি কন্সটেন্ট ঘোষণা করা হয়েছে যার মান 3.141 । উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে = চিহ্ন ও সেমিকোলন ; ব্যবহার করা যাবে না ।

গ্লোবাল ডিক্লারেশন সেকশন

প্রোগ্রামের সর্বত্র ব্যবহারের জন্য যে চলক যোঘণা করা হয় তাকে গ্লোবাল ভেরিয়েবল বলে । এ অংশে গ্লোবাল ভেরিয়েবলকে ঘোষণা করতে হয় ।

main( ) সেকশন

সি প্রোগ্রামে বাধ্যতামূলক অংশ হচ্ছে main( ) । মেইন সেকশনের দুটি অংশ রয়েছে । একটি হচ্ছে ঘোষণা অংশ এবং অপরটি নির্বাহ অংশ । ভেরিয়েবল, অ্যারে, পয়েন্টার, ফাইল ইত্যাদি ঘোষণা করা হয় ঘোষণা অংশে । নির্বাহ অংশে প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য কার্লি ব্রাকেটের ভিতর{ } স্টেইটমেন্ট লিখতে হয় । বিশেষ কিছু ব্যাতিক্রএছাড়া প্রতিটি স্টেইটমেন্টের পরে অবশ্যই সেমিকোলন (;) দিতে হয় । সেমিকোলনটিকে টারমিনেটর বলে ।

সাব প্রোগ্রাম সেকশন

এই অংশে এক বা একাধিক user_define_function ( ) থাকে । প্রতিটি সাব ফাংশনে আবার ঘোষণা অংশ এবং নির্বাহ অংশ রয়েছে । প্রয়োজনে main() ফাংশনের মধ্যে বা অন্য কোন ইউজার ডিফাইনড ফাংশনের মধ্যে এই সাব প্রোগ্রাম কল (call) করা যায় ।

একটি সি প্রোগ্রামের উদাহরণ: ত্রিভূজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সি প্রোগ্রাম

```
#include<stdio.h>
main()
{
    float base,height,area;
    printf("Enter base of triangle:: ");
    scanf("%f",&base);
    printf("Enter height of triangle:: ");
    scanf("%f",&height);
    area=(base*height)/2; // area=.5*base*height;
    printf("Area of triangle = %.2f",area);
}
```

প্রোগ্রামটির বিশ্লেষণ

/* Program of area of Triangle */

এটি হচ্ছে ডকুমেন্টেশন সেকশন। এ অংশে প্রোগ্রামের শিরোনাম কমেন্ট আকারে লিখা হয়েছে।

#include

যেহেতু এ প্রোগ্রামে scanf এবং printf library function ফাংশন ব্যবহার করা হয়েছে এবং এই ফাংশন দুটোর বর্ণনা stdio.h হেডার ফাইলে লেখা আছে, তাই হেডার ফাইল হিসেবে stdio.h নামের হেডার ফাইলটিকে সি ভাষার সিনট্যাক্স অনুসারে এই সেকশনে include করা হয়েছে।

main( )

এটি হচ্ছে সি প্রোগ্রামের প্রধান ফাংশন। এটি আবশ্যিক।

float base, height, area;

ফাংশনের { } এর ভিতরে প্রথমেই base, height, area নামে তিনটি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করা হয়েছে। base (দৈর্ঘ্য), height (উচ্চতা), area (ক্ষেত্রফল) হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু দৈর্ঘ্য, উচ্চতা এবং ক্ষেত্রফলের মান ভগ্নাংশ হতে পারে তাই ভেরিয়েবলের আগে কিওয়ার্ড হিসেবে float ব্যবহার করা হয়েছে।

```
scanf("%f", &base);
```

```
scanf("%f", &height);
```

এখানে scanf ব্যবহার করে ভেরিয়েবল base এবং height মান গ্রহণ করা হয়েছে। ফরমেট স্পেসিফায়ার হিসেবে %f ব্যবহার হয়েছে যেহেতু এটি ভগ্নাংশ। এরপর base, heightএর পূর্বে &ব্যবহার করে মেমোরি ঠিকানা বোঝানো হয়েছে।

```
area=(base*height)/2;
```

এ অংশে প্রক্রিয়াকরণ করে ক্ষেত্রফল বের করা হয়েছে। এখানে বিভিন্ন অপারেটর ব্যবহার করে স্টেইটমেন্টটি তৈরি করা হয়েছে।

```
printf ("Area of Triangle =%.2f", area);
```

এই অংশের সাহায্যে ক্ষেত্রফলের মান পর্দায় প্রকাশ করার জন্য printf ব্যবহার করা হয়েছে। দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত ফলাফল প্রকাশ করার জন্য ফরমেট স্পেসিফায়ার হিসেবে %.2f ব্যবহার করা হয়েছে। printf ফাংশনের পর & চিহ্নটি ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। প্রতিটি স্টেটমেন্ট এর পর সেমিকোলন (;) ব্যবহার করে স্টেইটমেন্ট এর termination বুঝানো হয়েছে।

এই প্রোগ্রামে কোনো সাব সেকশন নাই।

৫.৮ ডাটাটাইপ (Types of Data)

```
Sample Database of Student:
=====================================================================
Roll |Name| Mother |Father | Address | Class |Section | Mobile |DoB |
=====================================================================

=====================================================================
Dues| Fine|Result-CA | Result-1st Terminal | Result- Annual | Remarks
=====================================================================
```

উপরে উল্লেখিত ছকটি একটি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নমুনা ডাটাবেজ। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে রোল নম্বর, শিক্ষার্থীর নাম, মাতা/পিতার নাম, ঠিকানা, জন্ম তারিখ, যোগাযোগের মোবাইল নম্বর, শ্রেণি, শাখা, বয়স, ডিউজ (মাসিক ফিস, জরিমানা ইত্যাদি), বিষয় ভিত্তিক ফলাফল ইত্যাদি থাকতে পারে। এ ডাটাবেজটি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে তথ্যগুলোর কোনোটি পূর্ণ সংখ্যা, ভগ্নাংশ, ক্যারেক্টার, স্ট্রিং ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের তথ্য দ্বারা প্রকাশ করা হয়। সুতরাং সি প্রোগ্রামে ডাটাটাইপ হলো অনেকগুলো ডাটার এমন একটা সেট যেখানে ডাটাগুলোর কিছু নির্দিষ্ট মান, সাইজ এবং বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক। যেমন: আলোচ্য ডাটাবেজে 'মোবাইল নম্বর, রোল নম্বর'-কে পূর্ণ সংখ্যায়, 'শাখা'-কে নির্দিষ্ট অক্ষর বা ক্যারেক্টার দ্বারা, 'নাম'-কে স্ট্রিং দ্বারা এবং 'ফিস, জরিমানা, জিপিএ ইত্যাদি'-কে টাকার অংকে বা শুধু পূর্ণ সংখ্যায় বা ভগ্নাংশ দ্বারা প্রকাশ করতে হবে। উল্লেখ্য, একটি ডাটাবেজ তৈরি করতে হলে প্রোগ্রামের শুরুতে ডাটাটি কোন্ ধরণের হবে তা বলে দিতে হয় অর্থাৎ 'ডাটাটাইপ' (Data Type)ঘোষণা করতে হয়। কোনো সুনির্দিষ্ট অপারেশন সম্পাদন ও ডাটা স্টোরেজের জন্য সি প্রোগ্রামে এ জাতীয় 'ডাটাটাইপ' ব্যবহৃত হয়। ভেরিয়েবলের মান, সাইজ, ধ্রুবক (Constant), এ্যারে (Array) ইত্যাদিকে 'ডাটাটাইপ' দ্বারা নির্ধারণ করা হয়। সি প্রোগ্রামে ব্যবহৃত সাধারণত ডাটাটাইপগুলো বিভিন্ন প্রোগ্রামার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণিবিভাগ করেছেন। নিম্নে ছকের মাধ্যমে ডাটাটাইপগুলো উপস্থাপন করা হলোঃ

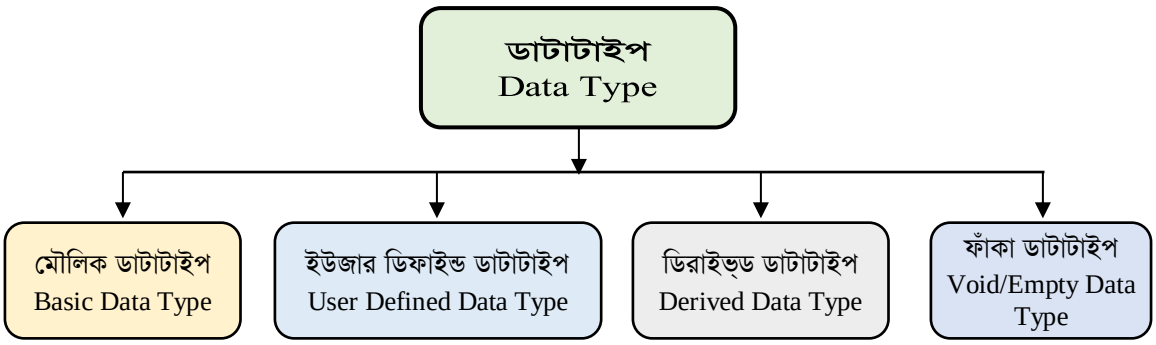

চিত্র: সি প্রোগ্রামে ব্যবহৃত ডাটাটাইপ

মৌলিক ডাটাটাইপ (Basic Data Type)

সি প্রোগ্রামে ব্যবহৃত মৌলিক ডাটাটাইপগুলো হচ্ছে: ক্যারেক্টার (char), ইন্টিজার বা পূর্ণ সংখ্যা (int), ফ্লোটিং পয়েন্ট বা ভগ্নাংশ (float)। নিম্নে এ গুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও সিনটেক্স প্রদান করা হলো:

ক্যারেক্টার (Character)

সি প্রোগ্রামে ক্যারেক্টার টাইপ ডাটা অপারেশন করার জন্য char কিওয়ার্ড ব্যবহার করে ভেরিয়েবল ঘোষণা করা হয়। মূলত: বিভিন্ন বর্ণমালার অক্ষর, সংখ্যা মান, পাংচুয়েশন মার্ক, সিম্বল বা হোয়াইট স্পেস-কে ক্যারেক্টার টাইপ ডাটা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। যেমন: 'student' ৭ টি ক্যারেক্টার দ্বারা গঠিত। আবার, 'Roll no: 100'-এ সংখ্যা ও অক্ষর মিলে ৯ টি ক্যারেক্টার থাকলেও ২ টি হোয়াইট স্পেস এবং ১ টি পাংচুয়েশন মার্কসহ (কোলন :) ১২ টি ক্যারেক্টার আছে বলে ধরে নেয়া হবে। ক্যারেক্টার টাইপ ডাটা মেমোরিতে ৮ বিট বা ১ বাইট জায়গা দখল করে। বর্তমানে অধিকাংশ কম্পিউটার ASCII ক্যারেক্টার সেট ব্যবহার করে। যেমন: A বর্ণটিকে ৬৫ কোড দিয়ে সূচিত করা হয়। একটি ক্যারেক্টার টাইপ ডাটা ৮ বিট বা ১ বাইট জায়গা দখল করে।

এর সিনটেক্স হচ্ছে:

```
char <variable name>

char ch = 'c';
```

এ ধরণের ডাটাটাইপ-এ ভেরিয়েবলের মান নির্ধারণ করার সময় মানটিকে সিঙ্গেল কোটেশন (single quotes - ' ') এর মধ্যে রাখতে হয় এবং ডাটা ইনপুট ও আউটপুট অপারেশনের সময় বিন্যাস নির্দিষ্টকারী (format specifier) হিসেবে '%c' ব্যবহার করা হয়।

পূর্ণ সংখ্যা(Integer)

সি প্রোগ্রামে পূর্ণসংখ্যা জাতীয় কোনো উপাত্ত ঘোষণার জন্য এ ডাটাটাইপ ব্যবহার করা হয়। এই ধরণের ডাটা মেমোরিতে ২ বাইট জায়গা দখল করে। এর কিওয়ার্ড হচ্ছে: 'int' । পূর্ণ সংখ্যা নিয়ে কাজ করার জন্য int কিওয়ার্ড ব্যবহার করে ভেরিয়েবল ঘোষণা করা হয়। বিভিন্ন সংখ্যা যথা: শ্রেণির শিক্ষার্থী সংখ্যা, পরিবারের সদস্য সংখ্যা ইত্যাদি এ জাতীয় ডাটাটাইপ হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

এর সিনটেক্স হচ্ছে:

```
int<variable name>
int number1;
int abc;
int xyz;
```

যেমনঃ int abc; int xyz; । এ ধরণের ডাটাটাইপ-এ ভেরিয়েবলের মান নির্ধারণ করার সময় কোন কোটেশন (quotes - ‘ ’) ব্যবহার করতে হয় না এবং ডাটা ইনপুট ও আউটপুট অপারেশনের সময় বিন্যাস নির্দিষ্টকারী (format specifier) হিসেবে '%d' বা '%i' ব্যবহার করা হয়।

ফ্লোটিং পয়েন্ট বা ভগ্নাংশ (Floating point)

ফ্লোটিং পয়েন্ট ডাটা হলো দশমিকযুক্ত সংখ্যা। সি প্রোগ্রামে ভগ্নাংশ নিয়ে কোনো অপারেশন করার জন্য ‘float' ও ‘double’ কিওয়ার্ড ব্যবহার করে ভেরিয়েবল ঘোষণা করা হয়। বিভিন্ন সংখ্যা যথা: শ্রেণির শিক্ষার্থীর বয়স, মূল্য, ফিস ইত্যাদি এ জাতীয় ডেটাটাইপ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই ধরণের ডাটা মেমোরিতে ‘float' টাইপ হলে ৪ ও ‘double’ টাইপ হলে ৮ বাইট জায়গা দখল করে। ‘float' টাইপ ডাটা হলে দশমিকের পর ৬ ঘর এবং ‘double’ টাইপ ডাটা হলে দশমিকের পর ১৪ ঘর পর্যন্ত হিসাব প্রদর্শণ করে।

এর সিনটেক্স হচ্ছে:

```
float <variable name>
double <variable name>
float price;
float PI = 3.14;
double sum;
```

স্ট্রিং (String)

স্ট্রিং টাইপ ডাটা হলো ক্যারেক্টার টাইপ ডাটার পরিবর্তিত রূপ বা সংস্করণ। সি প্রোগ্রামে একাধিক ক্যারেক্টার স্টোর করার জন্য character type array এর মাধ্যমে স্ট্রিং টাইপ এর ভেরিয়েবল ঘোষণা করা হয়। এ ক্ষেত্রেও char কিওয়ার্ড ব্যবহার করতে হয়। প্রকৃত পক্ষে ক্যারেক্টার সেট একত্রে স্ট্রিং টাইপ ডাটা তৈরি করে। যেমন:কোনো একটি বাক্য দেখাতে স্ট্রিং টাইপ ডাটা ব্যবহার করা হয়।

ইউজার ডিফাইন্ড ডাটাটাইপ (User Defined Data Type)

সি ভাষায় প্রোগ্রামার নিজের প্রয়োজনে ডাটা টাইপ তৈরি করে ব্যবহার করতে পারেন। এ গুলোকে ইউজার ডিফাইন্ড ডাটাটাইপ বলে। এ জাতীয় ডাটা টাইপ ঘোষণার জন্য `typedef` বা `enum` কি-ওয়ার্ড ব্যবহার করা হয়।

এর সিনটেক্স হচ্ছে:

```
typedef int  numbers;
numbers  num1,num2;
enum identifier [optional{ enumerator-list }];
enum month { Jan, Feb, Mar };
or
enum month { Jan = 1, Feb, Mar };
```

Enum ডাটা টাইপ এর একটি নমুনা প্রোগ্রাম:

```
#include <stdio.h>
int main()
{
   enum MONTH { Jan = 0, Feb, Mar };
   enum MONTH month = Mar;
   if(month == 0)
   printf("Value of Jan");
   else if(month == 1)
   printf("Month is Feb");
   if(month == 2)
   printf("Month is Mar");
}
```

Output:

```
Month is March
```

ডিরাইভ্ড ডাটাটাইপ (Derived Data Type)

দুই বা ততোধিক মৌলিক ডাটা টাইপ সমন্বয়ে ডিরাইভ্ড ডাটা টাইপ গঠিত হয়। (a) Pointer types, (b) Array types, (c) Structure types, (d) Union types, এবং (e) Function types ডিরাইভ্ড ডাটা এর অন্তর্গত।

ফাঁকা বা এম্পটি ডাটাটাইপ (Void Data Type)

যে সকল ডাটা কোনো মান প্রদান করে না তাকে ফাঁকা বা এম্পটি ডাটা টাইপ বলে। এম্পটি ডাটা টাইপ হিসাবে ভয়েড (Void) বা নাল (Null) ব্যবহৃত হয়।

সি প্রোগ্রামের কোয়ালিফায়ার বা টাইপ মডিফায়ার (Qualifier or Type Modifier of C)

সি প্রোগ্রামে মৌলিক ডাটাটাইপগুলোর সাথে কিছু কি-ওয়ার্ড ব্যবহৃত হয়ে বিভিন্ন মানের মেমোরি দখল করে। এগুলোতে মেমোরির পরিমাণ, ডেটার পরিসর (range) কিংবা প্রকৃতি, ধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি'র ভিত্তিতে মেমোরিকে কমানো বা বাড়ানোর মাধ্যমে পরিবর্তন করা যায়। এ জন্য কতিপয় কিওয়ার্ড ব্যবহার করা হয়। এ গুলোকে কোয়ালিফায়ার বা টাইপ মডিফায়ার বলে। সি প্রোগ্রামে signed, unsigned, short, long, double, void ইত্যাদি মডিফায়ার উল্লেখযোগ্য। কোয়ালিফায়ারগুলোকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়।

সাইজ কোয়ালিফায়ার (Size qualifiers)

সাইজ কোয়ালিফায়ার মৌলিক ডেটার আকার পরিবর্তন করে। long ও short এ দু'টি সাইজ কোয়ালিফায়ার। যেমন: long double i; এখানে double এর সাইজ ৮ বাইট। কি-ওয়ার্ড long ব্যবহার করায় i চলকটি ১০ বাইটে উন্নীত হলো। অনুরূপভাবে সাইজ কমিয়ে আনার জন্য short ব্যবহার করা যায়। long কোয়ালিফায়ার shortকোয়ালিফায়ারের দ্বিগুণ স্টোরেজ স্পেস ব্যবহার করে এবং ডেটার পরিসরকে বৃদ্ধি করে।

সাইন কোয়ালিফায়ার (Sign qualifiers)

সি প্রোগ্রামে signed, unsigned এ দু'টি সাইন কোয়ালিফায়ার। এ মডিফায়ারগুলো ডেটার পরিসর পরিবর্তন করে না। Integer এবং floating point ভেরিয়েবল ধনাত্মক ও ঋণাত্মক মান গ্রহণ করতে পারে। কোনো ভেরিয়েবল-এর ধনাত্মক মান প্রয়োজন হলে unsigned মডিফায়ার ব্যবহার করতে হবে। কারণ, unsigned মডিফায়ার মোট পরিসরকে ধনাত্মক মানে পরিবর্তন করে। আর, signed মডিফায়ার পরিসরের অর্ধেক মানকে ধনাত্মক ও বাকী অর্ধেক মানকে ঋণাত্মকে পরিবর্তন করে। যেমন: Integer ভেরিয়েবল এর সাইজ ৪ বাইট এবং এর ডাটা ব্যাপ্তি -231 থেকে 231-1 পর্যন্ত। এটিকে unsigned করা হলে এর ডাটা ব্যাপ্তি হবে 0 থেকে 231-1 পর্যন্ত। উল্লেখ্য যে সাইন কোয়ালিফায়ার int এবং char টাইপ ডেটার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

কন্সট্যান্ট বা ধ্রুবক কোয়ালিফায়ার (Constant qualifiers)

সি প্রোগ্রামে const কি-ওয়ার্ড ব্যবহার করে কোনো আইডেন্টিফায়ারকে কন্সট্যান্ট বা ধ্রুবক হিসাবে ঘোষণা করা যায়। যে সকল মানের পরিবর্তন হবে না সে গুলোকে কন্সট্যান্ট বা ধ্রুবক হিসাবে ঘোষণা করতে হয়। মাসিক ফিস, বৃত্তির হার ইত্যাদি জাতীয় রাশিকে কন্সট্যান্ট বা ধ্রুবক হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

যেমন: `const int monthly_fees = 70;`

ভোলাটাইল কোয়ালিফায়ার (Volatile qualifiers)

সি প্রোগ্রামে volatile কি-ওয়ার্ড ব্যবহার করে কোনো ভেরিয়েবলকে ভোলাটাইল কোয়ালিফায়ার হিসাবে ঘোষণা করা যায়। যখন কোনো ভেরিয়েবলের মান প্রোগ্রামের বাইরে পরিবর্তিত হয় তখন ভোলাটাইল কোয়ালিফায়ার ঘোষণা করা হয়। যেমন: কোনো ভেরিয়েবলকে ভোলাটাইল কোয়ালিফায়ার ঘোষণা করা হলে তা লুপ-এর বাইরে এক্সিকিউট হবে।

```
int volatile;
check_late_fine (void)
{
      volatile int late_fine;
      int val;
      while (late_fine == 0)
      val = late_fine;
      late_fine = 0;
      return(val);
}
```

এখানে `late_fine` ভেরিয়েবলকে `volatile` ঘোষণা করা না হলে লুপের ভিতরে কিছুই ঘটবে না এবং লুপ থেকে বেরিয়ে আসবে।

নিচের টেবিলে Storage size ও Value range সহ ডাটার ধরণ অনুযায়ী মডিফায়ার বা কোয়ালিফায়ারগুলো প্রদত্ত হলোঃ

ডাটার ধরণ	কিওয়ার্ড	স্টোরেজ সাইজ	ডাটা রেঞ্জ
Character	char	1 বাইট	- 2^7থেকে +$(2^7 - 1)$ বা- 0 থেকে +$(2^8 - 1)$
	signed char	1 বাইট	- 2^7থেকে +$(2^7 - 1)$
	unsigned char	1 বাইট	- 0 থেকে +$(2^8 - 1)$
Integer	Int signed int short int	2 বাইট	- 2^{15}থেকে +$(2^{15} - 1)$
	unsigned int unsigned short int	2 বাইট	- 0 থেকে +$(2^{16} - 1)$
	long int signed long int	4 বাইট	- 2^{31}থেকে +$(2^{31} - 1)$
	unsigned long int	4 বাইট	- 0 থেকে +$(2^{31} - 1)$
Floating point	float	4 বাইট	1.2E-38 to 3.4E+38
	double	8 বাইট	2.3E-308 to 1.7E+308
	longdouble	12বাইট	3.4E-4932 to 1.1E+4932
Enum	enum	2 বাইট	-
void	void	N/A	-

float, double, longdouble এর প্রেসিশন যথাক্রমে ৬, ১৪, ১৯ ডেসিমেল পয়েন্ট।

বিভিন্ন টাইপের ডাটার Storage size চেক করার জন্য নিচে একটি প্রোগ্রাম কোড দেওয়া হলোঃ

```
#include <stdio.h>

main()

{

   printf("\nStorage size for Integer Type Data: %d \n",
  sizeof(int));

   printf("\nStorage size for Character Type Data: %d \n",
  sizeof(char));

   printf("\nStorage size for Floating Type Data : %d \n",
  sizeof(float);

}
```

ডাটা Storage size চেক করার জন্য `sizeof` ডাটা টাইপ অপারেটর ব্যবহার করা হয়েছে।

৫.৯ ধ্রুবক (Constant), চলক (Variable), রাশিমালা (Expression), কি-ওয়ার্ড (Key word)

ধ্রুবক (Constant)

ধ্রুবক বলতে কোনো নির্দিষ্ট মান বা আইডেন্টিফায়ারকে বোঝায় যা প্রোগ্রাম নির্বাহের বেলায় কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন: মাসিক ফিস, শিক্ষার্থীর নাম ইত্যাদি।

সি প্রোগ্রামে Constant-কে প্রধানত দুইভাবে ডিক্লেয়ার করা যায়। যথা:

১. const কি-ওয়ার্ড ব্যবহার করে

২. #define প্রি-প্রসেসর ব্যবহার করে

const কি-ওয়ার্ড ব্যবহার করে Constant ডিক্লারেশন

const কি-ওয়ার্ড ব্যবহার কওে Constant ডিক্লারেশনের Syntax হচ্ছে:

const	dataType	identifier বা constatnt Name	value

অর্থাৎ, প্রথমে const লিখে ডাটা টাইপ দিতে হয়। এরপর identifier বা Constant এর নাম ও সমান চিহ্ন (=) দিয়ে মান (value) দিতে হয়। তারপর অপরিবর্তনীয় ডাটাটি দিতে হবে। শেষে সেমিকোলন (;) দিতে হয়।

যেমন:
```
const int roll_no=100;
const float temp=71.16;
const double PI = 3.14;
```

#define কি-ওয়ার্ড ব্যবহার করে Constant ডিক্লারেশন

#define কি-ওয়ার্ড ব্যবহার কওে Constant ডিক্লারেশনের Syntax হচ্ছে:

#define	identifier বা constatnt Name	value

অর্থাৎ, প্রথমে #define লিখে identifier বা constatnt Name দিতে হয়। তারপর অপরিবর্তনীয় ডাটাটি দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে ডাটা টাইপ, সমান চিহ্ন ও সেমিকোলন (;) দিতে হয় না।

যেমন:
```
#define roll_no100
#define temp71.16
#define PI 3.14
```

`#define`-কে `main` এর বাইরে, প্রোগ্রামের শুরুতে ডিক্লেয়ার করতে হয়। `#define` এর চেয়ে 'const' Keyword ব্যবহার করে Constant ডিক্লেয়ার করা উত্তম। 'const' কি-ওয়ার্ড ব্যবহার করে ডাটা টাইপকে সুনির্দিষ্ট করা হয়। কম্পিউটারের কি-বোর্ডে যতগুলো অক্ষর বা ক্যারেক্টার আছে সবগুলোই Constant হিসাবে ব্যবহার করা যায়। তবে ব্যাকশ্লেষসহ (\) কিছু ক্যারেক্টার বিশেষ কাজে ব্যবহৃত হয়। এগুলোকে Escape Sequenceও বলা হয়। নিচে এর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হলোঃ

Backslash character constant	অর্থ / কাজ
\a	Alarm (Beep, Bell)
\b	Backspace
\f	Form feed
\n	Newline (Line Feed)
\r	Carriage Return
\t	Horizontal Tab
\v	Vertical Tab
\\	Backslash
\'	Single quotation mark
\"	Double quotation mark
\?	Question mark
\N	Octal constant
\XN	Hexadecimal constant
\0	NULL

ধ্রুবকের প্রকারভেদ (Types of Constant)

সি প্রোগ্রামে সাধারণত: দুই প্রকারের Constant ব্যবহৃত হয়।

১. সংখ্যাসূচক ধ্রুবক (Numerical Constant)

২. স্ট্রিং ধ্রুবক (String Constant)

সংখ্যাসূচক ধ্রুবক (Numerical Constant)

এ প্রকারের ধ্রুবকে বিভিন্ন ধরণের সংখ্যা ব্যবহার করা হয় এবং এর মান ২১৪৭৪৮৩৬৪৮ থেকে ২৯৪৯৬৭২৯৫ এর মধ্যবর্তী যে কোনো ধনাত্মক বা ঋণাত্মক সংখ্যা হতে পারে। সংখ্যাসূচক ধ্রুবক ৩ প্রকারের। যথা:

১. ইন্টিজার কন্সট্যান্ট: ধনাত্মক বা ঋণাত্মক যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে ইন্টিজার কন্সট্যান্ট। এ প্রকারের ধ্রুবকে কোনো দশমিক সংখ্যা থাকে না। এটি ৩ ধরণের হয়। যথা:

ক. ডেসিম্যাল কন্সট্যান্ট: ১০ ভিত্তিক যে কোনো পূর্ণ সংখ্যাই হচ্ছে ডেসিম্যাল কন্সট্যান্ট। যেমন: `14,-5, 26` ইত্যাদি।

খ. অক্টাল কন্সট্যান্ট: ৮ ভিত্তিক সংখ্যাই হচ্ছে অক্টাল কন্সট্যান্ট। এ ধরণের কন্সট্যান্ট-এর পূর্বে 'শূন্য' (`0`) বসাতে হয়। যেমন: `094,-035, 026` ইত্যাদি।

গ. হেক্সাডেসিম্যাল কন্সট্যান্ট: ১৬ ভিত্তিক সংখ্যাই হচ্ছে হেক্সাডেসিম্যাল কন্সট্যান্ট। এ ধরণের কন্সট্যান্ট-এর পূর্বে 'শূন্য x' (`0x`) বসাতে হয়। যেমন: `0x14,-0x5, 0x26` ইত্যাদি।

২. ফ্লোটিং পয়েন্ট কন্সট্যান্ট: ধনাত্মক বা ঋণাত্মক যে কোনো পূর্ণ বা ভগ্নাংশবিশিষ্ট সংখ্যা হচ্ছে ফ্লোটিং পয়েন্ট কন্সট্যান্ট। এ প্রকারের ধ্রুবকে পূর্ণ সংখ্যা প্রকাশে দশমিক চিহ্নের দরকার না থাকলেও আংশিক মান প্রকাশে দশমিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যেমন: `14,-5.76, 26.9996` ইত্যাদি।

৩. এক্সপোনেন্সিয়্যাল কন্সট্যান্ট: এ প্রকারের ধ্রুবক ধনাত্মক বা ঋণাত্মক যে কোনো সংখ্যা হতে পারে। এক্সপোনেন্সিয়্যাল কন্সট্যান্ট-এ সংখ্যাগুলোকে লেখার জন্য ১০-এর সূচক বা ঘাত হিসাবে লেখা হয় এবং তা E অক্ষর দিয়ে দেখানো হয়। সংখ্যা ধনাত্মক হলে E এর পরেও ' + ' এবং ঋণাত্মক হলে E এর পরে ' − ' ব্যবহার করা হয়। যেমন: E+4, E−5, E−7.6 ইত্যাদি। উল্লেখ্য, E-5 অর্থ 10^{-5}.

স্ট্রিং ধ্রুবক (String Constant)

এ প্রকারের ধ্রুবকে বিন্যস্ত ক্যারেক্টার অর্থাৎ বর্ণ, অংক, সিম্বল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় এবং ধ্রুবকটি সিঙ্গেল বা ডাবল কোটেশন দিয়ে নির্দিষ্ট করে নেওয়া হয়। একটি স্ট্রিং ধ্রুবকে ০ থেকে ২৫৫ টি অক্ষর থাকতে পারে। যেমন: "Earth", "Student", "A" ইত্যাদি।

সি প্রোগ্রামে বিভিন্ন Constant টাইপ, সাপোর্টেড ডাটা টাইপ ও উদাহরণ নিম্নে একটি ছকে উল্লেখ করা হলোঃ

Constant টাইপ	সাপোর্টেড ডাটা টাইপ	উদাহরণ
1. Integer constants	int	71, -100
	unsigned int	100x
	long int	197,116
	long int	197,116,045,677
2. Real or Floating point constants	float	100.098765
	double	777.123456789
3. character constants	char	'A' , 'B', 'Z'
4. string constants	char	"ABCD", "Hello"
5. Octal constant	int	077 /* starts with 0 */
6. Hexadecimal constant	int	0x7f /* starts with 0x */

চলক (Variable)

সি প্রোগ্রামে ডাটা বা উপাত্ত নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ করা হয়। ডাটা সংরক্ষণের এ স্থানকে চিহ্নিত করার জন্য Variable ব্যবহার করা হয়। Variable হচ্ছে পরিবর্তনশীল ডাটা টাইপের নাম। Variable-এর মান পরিবর্তনশীল এবং প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় যে কোনো পরিবর্তনশীল মান নেওয়া যেতে পারে। সুতরাং, বলা যায় যে Variable হচ্ছে ডাটা সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত স্মৃতি স্থান এবং উক্ত স্থানের মান পরিবর্তন করা যায়। তাই, Variable-কে ডাটা স্টোরেজের Containerও বলা হয়।

প্রোগ্রামে Variable ব্যবহারের আগেই ঘোষণা করতে হয়। প্রোগ্রাম লেখার সময় Variable-এর অর্থপূর্ণ নাম প্রদান করা শ্রেয়।

চলকের প্রকারভেদ (Types of Variable)

সি প্রোগ্রামে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চলকের শ্রেণি বিভাগ করা হয়েছে।

সাধারণত: সংখ্যা ও বর্ণ বা অক্ষর ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে দুই ধরণের চলক ব্যবহার করা হয়:

১. সংখ্যাসূচক চলক (Numerical Variable)

২. স্ট্রিং চলক (String Variable)

সংখ্যাসূচক চলক (Numerical Variable)

এ প্রকারের চলকে বিভিন্ন ধরণের সংখ্যাকে স্মৃতিতে প্রেরণ করা হয়। প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় এর মান পরিবর্তিত হয়। যেমন: শিক্ষার্থীর বয়স, জিপিএ, মাসিক ফিস ইত্যাদি।

স্ট্রিং চলক (String Variable)

এ প্রকারের চলকে বিভিন্ন স্ট্রিং অর্থাৎ বিন্যস্ত ক্যারেক্টার (বর্ণ, অংক, সিম্বল ইত্যাদি) স্মৃতিতে প্রেরণ করা হয় । যেমন: শিক্ষার্থীর নাম, লিঙ্গ (ছেলে/ মেয়ে), লেটার গ্রেড ইত্যাদি ।

কোন প্রোগ্রাম বা ফাংশনের যে অংশের মধ্যে কোন ভেরিয়েবলের প্রভাব বিদ্যমান থাকে সেই অংশকে ঐ ভেরিয়েবলের স্কোপ বা ক্ষেত্র বলে । এই স্কোপ বা ক্ষেত্রের উপর ভিত্তি করে ভেরিয়েবলকে ২ ভাগে বিভক্ত করা যায় ।যথা:

১. স্থানীয় চলক (Local Variable)

২. সার্বজনীন চলক (Global Variable)

স্থানীয় চলক (Local Variable)

যে চলকের কার্যকারিতা প্রোগ্রামের একটি ফাংশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাকে স্থানীয় চলক বলে । যেমন: main ( ) ফাংশনের মধ্যে কোনো চলক ঘোষণা করা হলে তা শুধু main ( ) ফাংশনেই কাজ করবে, অন্য ফাংশনে তা কাজ করবে না । উল্লেখ্য যে, একই নামের একাধিক স্থানীয় চলক একাধিক ফাংশনে থাকতে পারে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ফাংশনে আলাদা আলাদাভাবে একই নামের স্থানীয় চলক ঘোষণা করা যায় ।

সার্বজনীন চলক (Global Variable)

যে চলকের কার্যকারিতা প্রোগ্রামের সকল ফাংশনের জন্য প্রযোজ্য, শুধু কোনো নির্দিষ্ট ফাংশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না তাকে সার্বজনীন চলক বলে । সার্বজনীন চলককে main ( ) ফাংশনের উপরে ঘোষণা করতে হয়; ফাংশনের মধ্যে ঘোষণা করা যায় না ।

চলকের নামকণের নিয়ম (Rules of declaring variable)

সি প্রোগ্রামে Variable-এর নামকরণের জন্য কিছু নিয়ম আছে । নিচে এর কয়েকটি উল্লেখ করা হলোঃ

- Alphabets (a, b, …, z, A, B, …, Z), digits (0, 1, …, 9) বা underscore (_) দিয়ে নামকরণ করা যাবে । underscore (_) দিয়ে নামকরণ শুরু করা গেলেও প্রোগ্রাম এরর ও সিস্টেম কনফ্লিক্ট এড়ানো জন্য এর ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা হয় । যেমন: height2, add1, total, radius ইত্যাদি ।
- কোনো digits দিয়ে Variable-এর নাম শুরু করা যাবে না । যেমন: 2height, 1add গ্রহণযোগ্য নয় ।
- underscore (_) ব্যতীত অন্য কোনো Special Character বা Symbol ($, #, %, &, … ইত্যাদি) দিয়ে Variable-এর নামকরণ শুরু করা যাবে না । যেমন: $height, %add গ্রহণযোগ্য নয় ।
- ভেরিয়েবলের নামের মধ্যে Blank Space বা WhiteSpace (ফাঁকা স্থান) ব্যবহার করা যাবে না । যেমন: height 2, total 5 গ্রহণযোগ্য নয় ।
- কোনো Keywords ব্যবহার করা যাবে না । যেমন: for, long, sizeof গ্রহণযোগ্য নয় ।
- সি প্রোগ্রাম case sensitive বিধায় Variable-এর নামকণের সময় তা লক্ষ্য রাখতে হবে । যেমন: Total ও TOTAL একই নয় ।
- শুধু সংখ্যা (numericalvalue) দিয়ে নামকরণ করা যাবে না । যেমন: 100, 111 গ্রহণযোগ্য নয় ।
- Variable-এর নামকরণে ৩১ ক্যারেক্টারের বেশি ব্যবহার না করাই উত্তম ।

নিচে Special Character বা Symbol-এর একটি তালিকা প্রদান করা হলো:

,	.	<	>	?	/	;	:	'	"
+	-	(	)	{	}	[	]	\	|
`	~	!	@	#	$	%	^	&	*

Variable ডিক্লারেশনের নিয়ম

Variable ডিক্লারেশনের Syntax হচ্ছে: dataType variableName;

অর্থাৎ প্রথমে ডাটা টাইপ উল্লেখ করে Variable এর একটি অর্থপূর্ণ নাম দিতে হবে এবং শেষে সেমিকোলন (;) দিতে হবে। যেমন: `int num;`

```
float radius;
char vowel;
int total;
```

Variable ইনিশিয়েলাইজেশন (initialization)

ডাটা টাইপ অনুসারে কোন চলকের মান নির্ধারণ করাকে variable initialization বলে। ভেরিয়েবলকে দুই ভাবে ইনিশিয়েলাইজ করা যায়।

নিচে উদাহরণের সাহায্যে Variable ইনিশিয়েলাইজেশন দেখানো হলোঃ

1. Static/At the time of declaration

a. Syntax : dataType variableName=value;

উদাহরণঃ `int num=71;`

b. Syntax : dataType variableName;

```
variableName=value;
```

উদাহরণঃ

```
float radius;
radius=3.68;
```

c. Syntax : dataType variableName1, variableName2=value;

variableName1=variableName2; (i.e variableName1=value)

উদাহরণঃ

```
char name1, name2='a';
name1=name2; (i.e name1='a')
```

d. Syntax : dataType variableName=Any Expression;

উদাহরণঃ `int add=3+8;`

2. Dynamic initialization/Dynamic data input

প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় মান (value) এসাইন (assign) করে ডাইনামিক ইনিশিয়েলাইজেশন করা হয়।

ডাটা ইনপুটের সিনটেক্স ও উদাহরণ:

a. Syntax : scanf("format Specifier",&varName); (single variable এর জন্য):

উদাহরণঃ

```
int x;
scanf("%d",&x);
```

b. Syntax : scanf("format Specifier", &varName); (multiple variable এর জন্য):

variable সমূহ আগে ডিক্লেয়ার করতে হয় এবং সে অনুযায়ী format Specifier নিতে হয়।

উদাহরণঃ

```
int x;
float y;
char c;
        scanf("%d %f %c",&x,&y,&c);
```

ডাটা আউটপুটের সিনটেক্স ও উদাহরণ:

a. Syntax : printf("format Specifier", varName); (single variableএর জন্য):

উদাহরণঃ

```
int 71;
     printf ("%d", x);
```

b. Syntax : printf ("format Specifier1 format Specifier2 format Specifier3", varName1, varName2, varName3); (multiple variableএর জন্য):

উদাহরণঃ

```
int x=71;
float y=16.12;
char c='F';
printf("%d %f %c",x,y,c);
```

রাশিমালা (Expressions)

সি প্রোগ্রামে ডাটা বা ভেরিয়েবল-এর গাণিতিক ও যৌক্তিক হিসাব নিকাশের জন্য কতগুলো চিহ্ন বা প্রতীক ব্যবহার করা হয়ে থাকে যেগুলোকে Operator বলে। এ ধরণের প্রতীকগুলো হচ্ছে: +, -, *, /, ++, --, <, >, >= ইত্যাদি। আর এই অপারটরগুলো যে সমস্ত ডাটা, ভেরিয়েবল বা এক্সপ্রেশনের উপর গাণিতিক ও যৌক্তিক অপারেশন সম্পাদন করে তাদেরকে অপারেন্ড বলে। অপারেন্ড বা ডাটা ব্যবহার করে বিভিন্ন কর্ম সম্পাদনের জন্য অপারেটর ব্যবহৃত হয় এবং অপারেটর, অপারেন্ড, ভেরিয়েবল, কন্সট্যান্ট ইত্যাদির অর্থবোধক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ উপস্থাপনকে প্রোগ্রামিং এর ভাষায় রাশিমালা বা এক্সপ্রেশন বলা হয়। একটি রাশিমালায় অন্তত একটি অপারেন্ড, এক বা একাধিক অপারেটর থাকবে। যেমন: x + 5 এখানে, 'x' এবং '5' অপারেন্ড এবং ' + ' অপারেটর। প্রোগ্রামিং ভাষা, ডাটাবেজ সিস্টেম, স্প্রেডশীট এপ্লিকেশন ইত্যাদিতে রাশিমালা ব্যবহৃত হয়। মানের প্রকার অনুযায়ী রাশিমালার প্রকারভেদ করা যায়। যেমন:

- বুলিয়ান রাশিমালা: TRUE বা FALSE নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- ইন্টিজার রাশিমালা: পূর্ণ সংখ্যার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন: 5, 18 ইত্যাদি।
- ফ্লোটিং পয়েন্ট রাশিমালা: বাস্তব সংখ্যার ভগ্নাশের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন: 5.49, -7.094 ইত্যাদি।
- স্ট্রিং রাশিমালা: ক্যারেক্টার স্ট্রিং-এর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন: Student, Male ইত্যাদি।

সি প্রোগ্রামে ব্যবহৃত অপারেটরসমূহ:

অপারেটর ও অপারেন্ড-এর সংযুক্তির ভিত্তিতে সি প্রোগ্রামে ব্যবহৃত অপারেটরগুলোকে তিনটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। এ গুলো নিম্নরূপ:

১. ইউনারি আরেটর (Unary Operator)
২. বাইনারি অপারেটর (BinaryOperator)
৩. কন্ডিশনাল বা টারনারি অপারেটর (Conditional or Ternary Operator)

ইউনারি অপারেটর (Unary Operator)

যে সমস্ত অপারেটর কেবলমাত্র একটি অপারেন্ড এর উপর কার্য সম্পাদন করে তাদেরকে ইউনারি অপারেটর বলে। অর্থাৎ ইউনারি অপারেটরে কেবল একটি করে অপারেন্ড বা কনস্ট্যান্ট সংযুক্ত থাকে। ইউনারি অপারেটরগুলো প্রিফিক্স বা পোস্টফিক্স নোটেশনে কাজ করে। প্রিফিক্স নোটেশনে অপারেটর অপারেন্ডের পূর্বে বসে। আর, পোস্টফিক্স নোটেশনে অপারেটর অপারেন্ডের পরে বসে।

নিম্নে বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি ইউনারি অপারেটর ও এদের ব্যবহার ছকে দেখানো হলো:

অপারেটর	প্রিফিক্স বা পোস্টফিক্স	ব্যবহার / বিবরণ	উদাহরণ
+ (ইউনারি প্লাস)	প্রিফিক্স	১ টি অপারেন্ডের ধনাত্বক মান বুঝাতে ব্যবহৃত হয়	c2=+c1; c3 = +(c1- c2);
- (ইউনারি মাইনাস)	প্রিফিক্স	১ টি অপারেন্ডের ঋনাত্বক মান বুঝাতে ব্যবহৃত হয়	c2= - c1; c3 = - (c1- c2);
+ + (ইনক্রিমেন্টাল অপারেটর-প্রি/পোস্ট)	উভয়	১ টি অপারেন্ডের মান ১ করে বাড়ানো	counter++; ++counter; A=20, B = 10 হলে A++ = 21, B++ = 11
-- (ডিক্রিমেন্টাল অপারেটর-প্রি/পোস্ট)	উভয়	১ টি অপারেন্ডের মান ১ করে কমানো	counter--; --counter; A=20, B = 10 হলে A-- = 19, B-- = 9

বাইনারি অপারেটর (Binary Operator)

যে সমস্ত অপারেটর একসাথে দুইটি অপারেন্ড এর উপর কার্য সম্পাদন করে তাদেরকে বাইনারি অপারেটর বলে। অর্থাৎ বাইনারি অপারেটরে ২ টি করে অপারেন্ড বা কনস্ট্যান্ট সংযুক্ত থাকে। সি প্রোগ্রামে ইউনারি অপারেটর অপেক্ষা বাইনারি অপারেটর আধিক ব্যবহৃত হয়। উপরে প্রদত্ত ইউনারি অপারেটরগুলো এবং টারনারি অপারেটর ছাড়া বাকী সকল অপারেটরই বাইনারি অপারেটর। বাইনারি অপারেটর ইনফিক্স (infix) নোটেশনে কাজ করে। অর্থাৎ অপারেটরগুলো দুটো অপারেন্ডের মাঝখানে ব্যবহৃত হয়।

টারনারি অপারেটর (Ternary Operator)

এ সকল অপারেটর একত্রে তিনটি অপারেন্ড নিয়ে কাজ করে। টারনারি অপারেটর ২টি হলো (' **?** ' এবং ' **:** ') যা if ... else স্টেটমেন্টের সংক্ষিপ্ত রূপ হিসাবে কাজ করে।

সি প্রোগ্রামে শর্ত সাপেক্ষে কোনো ভেরিয়েবল বা এক্সপ্রেশনের মান অন্য কোনো ভেরিয়েবল বা এক্সপ্রেশনের মান হিসাবে নির্ধারণ করার জন্য কন্ডিশনাল অপারেটর ব্যবহৃত হয়। কন্ডিশনাল অপারেটর ব্যবহারের ফরম্যাট হলো–

(Condition? true_value: false_value);

নিচের উদাহরণগুলো লক্ষ্য করি:

(Condition? True_Value: Fals_Value);

```
int school_closing_time = (day == THURSDAY) ? 4 : 2;
```

অর্থ: বৃহস্পতিবার ব্যতীত অন্যান্য দিন বিদ্যালয় ছুটির সময় ৪ টা আর বৃহস্পতিবার দিন ২ টা।

```
int a=20, b=30;
a>b ? printf("True") : printf("False");
```

অর্থ: প্রদত্ত মান অনুসারে a>b শর্তটি সত্য হলে True প্রিন্ট হবে আর মিথ্যা হলে False প্রিন্ট হবে।

প্রদত্ত কোডটিতে False প্রিন্ট হবে।

বাইনারি অপারেটর (Binary Operator)

কাজের উপর ভিত্তি করে বাইনারি অপারেটরকে আবার নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায় ।

১. গাণিতিক অপারেটর (Arithmetic Operators)

২. অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর (Assignment Operators)

৩. রিলেশনাল অপারেটর (Relational Operators)

৪. লজিক্যাল অপারেটর (Logical Operators)

৫. বিটওয়াইজ অপারেটর (Bitwise Operators)

৬. বিশেষ অপারেটর (Special Operators)

১. গাণিতিক অপারেটর (Arithmetic Operators)

সাধারণ গাণিতিক কাজে ব্যবহৃত অপারেটরগুলোকে গাণিতিক অপারেটর বলে । সি প্রোগ্রামে ব্যবহৃত গাণিতিক অপারেটরগুলোকে নিম্নোক্ত ছকে দেখানো হলো:

অপারেটর	বিবরণ / ব্যবহার	উদাহরণ (A=20, B = 10 হলে)
+ (প্লাস)	দুটি অপারেন্ড যোগ করার জন্য ।	A+B = 30, B+A =30
- (মাইনাস)	১ম অপারেন্ড থেকে ২য় অপারেন্ডকে বিয়োগ করার জন্য ।	A - B = 10, B - A = - 10
* (গুণ)	দুটি অপারেন্ড গুণ করার জন্য ।	A * B = 200, B*A = 200
/ (ভাগ)	১ম অপারেন্ডকে ২য় অপারেন্ড দ্বারা ভাগ করার জন্য । এক্ষেত্রে শুধু ভাগফল পাওয়া যাবে ।	A/B = 2, B/A = 1/2 বা0.5
% (মড্যুলাস)	অপারেন্ড দুটিকে (Integer) ভাগ করলে ভাগশেষের মান (Remainder) নির্ণয়ের জন্য ।	A % B = 0

২. অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর (Assignament Operators)

সি প্রোগ্রামে চলকের মান এ্যাসাইন করার জন্য অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর ব্যবহার করা হয় । অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর দুই ধরণের; ১. সাধারণ অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর (Simple Assignament Operator) ২. যৌগিক অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর (Compound Assignament Operator) । একমাত্র সাধারণ অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর হচ্ছে (=) । বাকীগুলো যৌগিক অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর । প্রত্যেক অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরে (=) চিহ্ন থাকে । অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরে দু'টি ভ্যালু থাকে । এ গুলো হচ্ছে L-ভ্যালু এবং R-ভ্যালু । অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর R-ভ্যালুকে কপি করে L-ভ্যালুতে রাখে ।

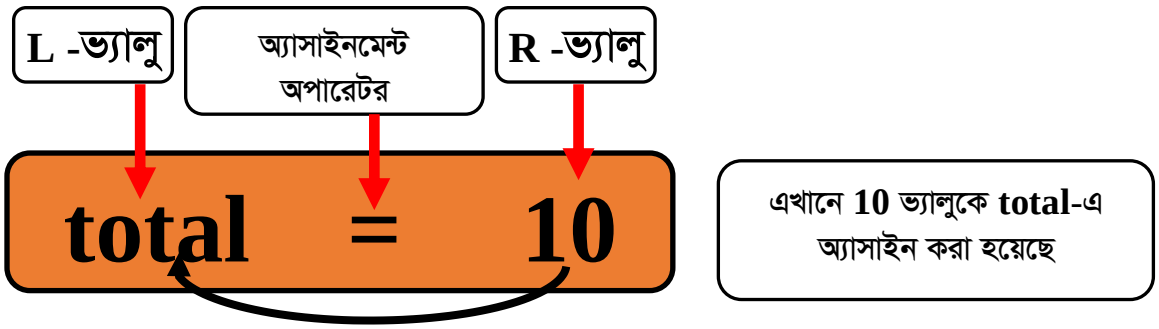

চিত্র: অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর

নিম্নের ছকে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর দেখানো হলো :

অপারেটর	বিবরণ / ব্যবহার	উদাহরণ
=	Simple assignment operator: ' = ' চিহ্নের বামে চলকের নাম ও ডানে চলকের মান লিখে এর মান এ্যাসাইন করা হয়। এটি একমাত্র সাধারণ অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর	total = 10; এর অর্থ হচ্ছে 10 কে total চলকে এ্যাসাইন করা হয়েছে অর্থাৎ total চলকের মান 10
+=	Add AND assignment operator: এটি ডান দিকের অপারেন্ডকে বাম দিকের অপারেন্ড-এর সাথে যোগ করে এবং ঐ 'যোগফলকে' বাম দিকের অপারেন্ডে এসাইন করে	total + = 10; এবং total = total + 10; একই
- =	Subtract AND assignment operator: এটি বাম দিকের অপারেন্ড থেকে ডান দিকের অপারেন্ডকে বিয়োগ করে এবং ঐ 'বিয়োগফলকে' বাম দিকের অপারেন্ডে এসাইন করে	total - = 10; এবং total = total - 10; একই
*=	Multiply AND assignment operator: এটি বাম দিকের অপারেন্ড এর সাথে ডান দিকের অপারেন্ডকে গুণ করে এবং ঐ 'গুণফলকে' বাম দিকের অপারেন্ডে এসাইন করে	total * = 10; এবং total = total * 10; একই
/=	Divide AND assignment operator: এটি বাম দিকের অপারেন্ডকে ডান দিকের অপারেন্ড দ্বারা ভাগ করে এবং ঐ 'ভাগফলকে' বাম দিকের অপারেন্ডে এসাইন করে	total / = 10; এবং total = total / 10; একই
%=	Modulus AND assignment operator: এটি বাম দিকের অপারেন্ডকে ডান দিকের অপারেন্ড দ্বারা ভাগ করে এবং প্রাপ্ত 'ভাগশেষকে' বাম দিকের অপারেন্ডে এসাইন করে	total % = 10; এবং total = total % 10; একই
<<=	Left shift AND assignment operator	total <<= 10 এবং total = total << 10 একই
>>=	Right shift AND assignment operator	total >>= 10 এবং total = total >> 10 একই
&=	Bitwise AND assignment operator	total &= 10 এবং total = total & 10 একই
^=	Bitwise exclusive OR and assignment operator	total ^= 10 এবং total = total ^ 10 একই
| =	Bitwise inclusive OR and assignment operator	total |= 10 এবং total = total | 10 একই

৩. রিলেশনাল অপারেটর (Relational Operators)

দুটি অপারেন্ড-এর মধ্যে তুলনা করার জন্য রিলেশনাল অপারেটর ব্যবহার করা হয়। এ অবস্থায় Condition টি True হলে 1 ভেল্যু রিটার্ন করে। আর Condition টি False হলে 0 ভেল্যু রিটার্ন করে।

অপারেটর	বিবরণ / ব্যবহার	উদাহরণ (A=20, B = 10 হলে)
==	দুটি অপারেন্ড সমান কিনা যাচাই করবে। অপারেন্ড দুটি সমান হলে Condition টি True হবে	(A = = B) True নহে রিটার্ন 0
!=	দুটি অপারেন্ড অসমান কিনা যাচাই করবে। অপারেন্ড দুটি অসমান হলে Condition টি True হবে	(A ! = B) True রিটার্ন 1
>	বাম অপারেন্ডটি ডান অপারেন্ড অপেক্ষা বড় হলে Condition টি True হবে	(A > B) True রিটার্ন 1
<	বাম অপারেন্ডটি ডান অপারেন্ড অপেক্ষা ছোট হলে Condition টি True হবে	(A < B) True নহে রিটার্ন 0
>=	বাম অপারেন্ডটি ডান অপারেন্ড অপেক্ষা বড় বা সমান হলে Condition টি True হবে	(A >= B) True রিটার্ন 1
<=	বাম অপারেন্ডটি ডান অপারেন্ড অপেক্ষা ছোট বা সমান হলে Condition টি True হবে	(A <= B) True নহে রিটার্ন 0

৪. লজিক্যাল অপারেটর (Logical Operators)

দুই বা ততোধিক যুক্তিমূলক এক্সপ্রেশনের মধ্যে তুলনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণমূলক কাজেলজিক্যাল অপারেটরব্যবহার করা হয়। নিচে তিনটি লজিক্যাল অপারেটর-এর বিবরণ প্রদান করা হলো।

অপারেটর	বিবরণ / ব্যবহার	উদাহরণ
&&	Logical AND: উভয় অপারেন্ড-এর মান শূন্য/False না (non-zero) হলে শর্তটি সত্য বা True; অন্যথায় False	A=5 এবং B=0 এর জন্য A&&B শর্তটি False ((A==5)&&(B==0)) শর্তটি True (A>4) && (B<0) শর্তটি False
||	Logical OR: দুটি অপারেন্ড-এর মধ্যে কমপক্ষে একটির মান শূন্য না (non-zero) হলে শর্তটি সত্য বা True হবে	A=10, B = 0, C = 7 হলে (A ||B) শর্তটি True (B ||C) শর্তটি True
!	Logical NOT: বিপরীত অর্থে অপারেন্ড এর মান ব্যবহৃত হয়। একটি শর্ত সত্য বা True হলে লজিক্যাল NOT অপারেটর সে শর্তটিকে মিথ্যা বা False ঘোষণা করবে	A=10, B = 0, C = 7 হলে ! (A && B) শর্তটি True ! (A && C) শর্তটি False

৫. বিটওয়াইজ অপারেটর (Bitwise Operators)

সি প্রোগ্রামে বাইনারি ডাটা নিয়ে যৌক্তিক কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য বিটওয়াইজ অপারেটর ব্যবহার করা হয়। হিসাব সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন, বিভিন্ন গাণিতিক অপারেশন ইত্যাদি কাজ সম্পাদনের প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করা ও বিদ্যুৎ সাশ্রয় করার জন্য বিটওয়াইজ অপারেটর ব্যবহার করা সংগত। ছয়টি বিটওয়াইজ অপারেটরের মধ্যে বিটওয়াইজ নট ইউনারি এবং বাকীগুলি বাইনারি অপারেটর। Float বা Double টাইপের ডাটার ক্ষেত্রে বিটওয়াইজ অপারেটর ব্যবহার করা যায় না; শুধু int টাইপের ডাটার ক্ষেত্রে বিটওয়াইজ অপারেটর ব্যবহার করা হয়।বিটওয়াইজ অপারেশনের পূর্বে কম্পাইলার উভয় অপারেন্ডের মান

বাইনারিতে পরিবর্তন করে অপারেশন সম্পন্ন করে। বিটওয়াইজ অপারেটরের হিসাব বুঝার জন্য ট্রুথ টেবিল দরকার। নিচের ছকে ট্রুথ টেবিল ও বিটওয়াইজ অপারেটরের বিবরণ প্রদান করা হলো:

ট্রুথ টেবিল

A	B	A & B	A | B	A ^ B
0	0	0	0	0
0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
1	1	1	1	0

বিটওয়াইজ অপারেটরের বিবরণ

অপারেটর	বিবরণ / ব্যবহার	উদাহরণ (A=21, B = 26হলে)
&	Bitwise or Binary AND: দুটি অপারেন্ড এর বিটগুলোর মধ্যে জোড়ায় জোড়ায় লজিক্যাল AND অপারেশন করে ফলাফল দেয়। এক্ষেত্রে একজোড়া বিটের কেবলমাত্র উভয়টিই 1 হলে তাদের মধ্যে লজিক্যাল AND অপারেশন এর ফলাফল 1 হবে।	(A&B) = 16, কারণ - 21 = 00010101 26 = 00011010 16 = 00010000
|	Bitwise or Binary OR: দুটি অপারেন্ড এর বিটগুলোর মধ্যে জোড়ায় জোড়ায় লজিক্যাল OR অপারেশন করে ফলাফল দেয়। এক্ষেত্রে একজোড়া বিটের যে কোন একটি 1 হলে তাদের মধ্যে লজিক্যাল OR অপারেশন এর ফলাফল 1 হবে।	(A | B) = 29, কারণ- 21 = 00010101 26 = 00011010 31 = 00011111
~	Bitwise or Binary NOT: কোন অপারেন্ড এর বিটগুলোর উপর লজিক্যাল NOT অপারেশন করে ফলাফল দেয়। এক্ষেত্রে বিট 1 এর উপর NOT অপারেশনের ফলাফল 0 এবং বিট 0 এর উপর NOT অপারেশনের ফলাফল 1 হয়।	~A = -22 বা 11101010 ~B = -27 বা 11100101
^	XOR Operator: দুটি অপারেন্ড এর বিটগুলোর মধ্যে জোড়ায় জোড়ায় লজিক্যাল XOR অপারেশন করে ফলাফল দেয়। এক্ষেত্রে প্রতি জোড়ায় বিট দুটি ভিন্ন হলেই ফলাফল 1 হয়, অন্যথায় ফলাফল 0 হয়।	(A ^ B) = 15 বা 00001111
<<	Binary Left Shift Operator: কোন অপারেন্ড এর বাইনারি বিটগুলোকে এক বা একাধিক বার বামে সরানোর জন্য এই অপারেটর ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে বাম দিকের অপারেন্ড এর বাইনারি বিটগুলো কতবার বামে সরবে তা ডানদিকের অপারেন্ডটির মান দ্বারা নির্ধারিত হয়।	A <<1 = 42 বা 00101010 A << 2 = 84 বা 01010100
>>	Binary Right Shift Operator: কোন অপারেন্ড এর বাইনারি বিটগুলোকে এক বা একাধিক বার ডানে সরানোর জন্য এই অপারেটর ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে বাম দিকের অপারেন্ড এর বাইনারি বিটগুলো কতবার ডানে সরবে তা ডানদিকের অপারেন্ডটির মান দ্বারা নির্ধারিত হয়।	A >>1 = 10 বা 00001010 A >> 2 = 5 বা 00000101

৬. বিশেষ অপারেটর (Special Operators)

সি প্রোগ্রামে বিশেষ কিছু অপারেটর ব্যবহার করা হয়। নিচে এর কয়েকটি প্রদত্ত হলো:

কমা অপারেটর (Comma Operators)

সি প্রোগ্রামে ভেরিয়েবল ঘোষণার সাথে ডাটা টাইপ ঘোষণা করতে হয়। যখন একই জাতীয় একাধিক ভেরিয়েবল ঘোষণা করা হয় তখন ভেরিয়েবলগুলোকে পর পর লিখে কমা (,) দিয়ে পৃথক করা হয়। এছাড়া Assignment Operator, Round Brace, printf statement, Switch case, for Loop ইত্যাদিতেও কমা অপারেটর ব্যবহার করা হয়।

যেমন: `int a = 5; int c = 5; int d;`

এর পরিবর্তে কমা অপারেটর দিয়ে `int a, c = 5, d;` লিখা যায়।

এছাড়া ফাংশন কল করার জন্য ( ), অ্যারে ইনডেক্স ঘোষণার জন্য [ ], পয়েন্টার-এর জন্য (*) ইত্যাদি বিশেষ অপারেটরসমূহ ব্যবহার করা হয় যা পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৫.১০ ইনপুট-আউটপুট স্টেটমেন্ট(Input-Output Statements)

সি প্রোগ্রামে কম্পিউটারকে কোনো নির্দিষ্ট কাজের জন্য আদেশ বা নির্দেশ দান যেমন: কোনো কোন প্রোগ্রামের আউটপুটকে স্ক্রিনে দেখানো, ইউজার কর্তৃক ইনপুট নেওয়া ইত্যাদির জন্য স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয়। একটি প্রোগ্রাম অনেকগুলো স্টেটমেন্ট-এর সমন্বয়ে লেখা হয়। ধ্রুবক, চলক, অপারেটর, ফাংশন, কি-ওয়ার্ড ইত্যাদি ব্যবহার করে স্টেটমেন্ট লেখা হয়। প্রোগ্রাম রচনায় কোনো এক্সপ্রেশন কিংবা ফাংশনের শেষে যখন সেমিকোলন (;) দেয়া হয়, তখন C এর ভাষায় একে সাধারণত স্টেটমেন্ট বলা হয়। স্টেটমেন্ট সাধারণত: দুই ধরণের হতে পারে। যথা: ১. সরল স্টেটমেন্ট (Simple Statement) এবং ২. যৌগিক স্টেটমেন্ট (Compound Statement)

সরল স্টেটমেন্ট (Simple Statement)

একটি মাত্র এক্সপ্রেশন কিংবা একটি মাত্র ফাংশন নিয়ে Simple Statement গঠিত হয়।

```
#include <stdio.h>
main()
{
    int x = 5;
    int y = 6;
    int sum;
    sum = x + y;
    printf ("\nx =5, y = 6");
    printf ("\n\nx + y = % d\n", sum);
}
```

উপরের উদাহরণে প্রত্যেকটি লাইন এক একটি সরল স্টেটমেন্ট। `int x = 5; int sum; sum=x+y;` এসাইনমেন্ট স্টেটমেন্টগুলো সরল স্টেটমেন্ট। আবার `return; break; continue; goto;` ইত্যাদিও সরল স্টেটমেন্ট।

যৌগিক স্টেটমেন্ট (Compound Statement)

একই ধরণের একাধিক স্টেটমেন্ট একত্রে Compound Statement গঠন করে। অর্থাৎ একাধিক সরল স্টেটমেন্ট দিয়ে গঠিত ব্লকের সাহায্যে যৌগিক স্টেটমেন্ট গঠন করা হয়। যৌগিক স্টেটমেন্ট { } ব্রাকেট দিয়ে লেখা হয়; ({) ব্রাকেটটি ব্লকের শুরু এবং (}) ব্রাকেটটি ব্লকের শেষ বুঝায়।

```
#include <stdio.h>
main()
{
    int length = 5;
    int with = 6;
    int sum;
    sum = x + y;
    printf ("\nx =5, y = 6");
    printf ("\n\nx + y = % d\n", sum);
}
```

উপরের উদাহরণে কার্লি ব্র্যাকেটের ({ }) অন্তর্ভূক্ত স্টেটমেন্টগুলো সমন্বয়ে যৌগিক স্টেটমেন্ট গঠিত হয়েছে। যৌগিক স্টেটমেন্ট দুই প্রকারের; যথা: শর্তযুক্ত (Coditional) ও লুপ (Loop)। পরবর্তীতে এ সম্পর্কিত আলোচনা আছে।

প্রোগ্রাম নির্বাহকালীন কিবোর্ড বা অন্য কোন মাধ্যমে থেকে ডাটা নিয়ে তা কোনো ভেরিয়েবলের জন্য এসাইন করাকে ভেরিয়েবলের ইনপুট অপারেশন বলে। একে ডাটা রিড (Read operation) অপারেশনও বলে। আবার ভেরিয়েবল থেকে ডাটা নিয়ে তা স্ক্রীনে প্রিন্ট করাকে ভেরিয়েবলের আউটপুট অপারেশন বলে। একে ডাটা রাইট অপারেশনও (Write operation) বলে। ভেরিয়েবলের ইনপুট ও আউটপুট অপারেশনের জন্য সি ভাষায় কিছু লাইব্রেরি ফাংশন আছে। stdio.h (standard Input/Output header file) নামের হেডার ফাইলে ঐ সমস্ত লাইব্রেরি ফাংশনগুলোর বর্ণনা লেখা থাকে। ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নেয়ার জন্য প্রোগ্রামের মাধ্যমে কম্পিউটারকে কোনো তথ্য দেয়ার জন্য ডেটা সরবরাহ করতে হয়। ডাটা ইনপুট-আউটপুট সম্পাদনের জন্য ২ ধরণের ফাংশন ব্যবহার করা হয়।

যথা: (১) অবিন্যস্ত (Unformatted) ইনপুট-আউটপুট ফাংশন ও

(২) বিন্যস্ত (Formatted) ইনপুট-আউটপুট ফাংশন।

অবিন্যস্ত (Unformatted) ইনপুট-আউটপুট ফাংশন

সি প্রোগ্রামে অবিন্যস্ত (Unformatted) ইনপুট-আউটপুট ফাংশনগুলো হচ্ছে:

a) getchar()
b) putchar()
c) gets()
d) puts()
e) getch()
f) getche()

getchar()-এর বিবরণ

এটি একটি ইনপুট ফাংশন। কিবোর্ড থেকে একটি মাত্র সিংগেল ক্যারেক্টার পড়া/গ্রহণের জন্য getchar()-ফাংশন ব্যবহৃত হয়। এর সিনটেক্স নিম্নরূপ:

Variable-name = getchar();

```
#include<stdio.h>
main()
{
    char c;
    printf("Enter a character::  ");
    c=getchar();
    putchar(c);
}
Output:
Enter a character:: College
C
```

উপরের প্রোগ্রামটি রান করার পর কিবোর্ড থেকে কোন একটি ক্যারেক্টার টাইপ করলে getchar() ফাংশন সেটিকে রিড করে c ভেরিয়েবলে এসাইন করবে কিন্তু তা কনসোলে ডিসপ্লে হবে না। আবার putchar() ফাংশনটি c ভেরিয়েবলে এসাইন হওয়া সেই ক্যারেক্টারটিকে কনসোলে প্রিন্ট করবে। যেমন: প্রোগ্রাম নির্বাহের পর কনসোলে College টাইপ করলে শুধুমাত্র C অক্ষরটি দেখা যাবে, বাকী অংশ দেখা যাবে না।

putchar()-এর বিবরণ

এটি একটি আউটপুট ফাংশন। একটি মাত্র সিংগেল ক্যারেক্টার ডিসপ্লে করার জন্য putchar()-ফাংশন ব্যবহৃত হয়। এর সিনটেক্স নিম্নরূপ:

putchar(Variable-name);

```
#include<stdio.h>
main()
{
    char c;
    printf("Enter a character::  ");
    c=getchar();
    putchar(c);
}
Output:
Enter a character:: Book
B
```

উপরের প্রোগ্রামটি রান করার পর কিবোর্ড থেকে কোন একটি ক্যারেক্টার টাইপ করলে getchar() ফাংশন সেটিকে রিড করে c ভেরিয়েবলে এসাইন করবে কিন্তু তা কনসোলে ডিসপ্লে হবে না। আবার putchar() ফাংশনটি c ভেরিয়েবলে এসাইন হওয়া সেই ক্যারেক্টারটিকে কনসোলে প্রিন্ট করবে। কিন্তু Book টাইপ করলে শুধুমাত্র B অক্ষরটিই প্রিন্ট হবে, বাকী অংশ প্রিন্ট হবে না।

gets()-এর বিবরণ

এটি একটি ইনপুট ফাংশন। কিবোর্ড থেকে একটি স্ট্রিং পড়ার জন্য gets()ফাংশন ব্যবহৃত হয়। কিবোর্ড থেকে কোন স্ট্রিং টাইপ করার পর এন্টার চাপ দিলে এ ফাংশনের মাধ্যমে স্ট্রিং-এর শেষে একটি নাল ক্যারেক্টার (\0) যুক্ত হয় এবং নির্ধারিত ভেরিয়েবলে উক্ত স্ট্রিংটি এসাইন হয়। নাল ক্যারেক্টার (\0) দ্বারা স্ট্রিং এর সমাপ্তি বুঝায়। এর সিনটেক্স নিম্নরূপ:

gets (Variable-name);

```
#include<stdio.h>
main()
{
    char m[20];
        printf("Enter a string that contain less than 20 characters : ");
    gets(m);
    puts(m);
}
Output:
Enter a string that contain less than 20 characters : ICT Course
ICT Course
```

puts()-এর বিবরণ

এটি একটি আউটপুট ফাংশন। কনসোলে কোন স্ট্রিং প্রিন্ট বা প্রদর্শনের জন্য puts() ফাংশনটি ব্যবহৃত হয়।কনসোলে টেক্সট মেসেজ যথা কোনো নির্দেশনা প্রদানের জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। এছাড়া নুতন লাইনে আউটপুট পেতে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। এর সিনটেক্স নিম্নরূপ:

puts(Variable-name);
বা
puts("Text");

```
#include<stdio.h>
main()
{
    char name[18];
    puts("Enter your name:: ");
    gets(name);
    puts("Your name is:: ");
    puts(name);
}
Output:
Enter your name:: Sakib
Your name is::
Sakib
```

লক্ষ্য করুন: কনসোলে টেক্সট মেসেজ হিসাবে নাম লিখার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং পরে আউটপুট হিসেবে নাম লাইনের নিচে প্রদর্শন করছে।

getch()-এর বিবরণ

এটি getchar() এর মত একটি ইনপুট ফাংশন যাহা কিবোর্ড থেকে একটি মাত্র সিংগেল ক্যারেক্টার পড়া/গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যে ক্যারেক্টারই ইনপুট করা হোক না কেন তা কনসোলে প্রদর্শিত হবে না। উক্ত ক্যারেক্টার প্রদর্শনের জন্য putch() বা putchar() ফাংশন ব্যবহার করতে হয়। এন্টার কী চেপে প্রোগ্রামের নির্বাহ শেষ করার জন্যও এই ফাংশনটি ব্যবহৃত হয়। এর সিনটেক্স নিম্নরূপ:

Variable-name = getch();

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
    char c;
    puts("Enter a character::  ");
    c=getch();
    puts("You Entered:: ");
    putchar(c);
    getch();
}
Output:
Enter a character:: B
You Entered:: B
```

উপরের প্রোগ্রামে একটি মাত্র সিংগেল ক্যারেক্টার পড়া/গ্রহণ করা যাবে। `getch();` লাইব্রেরি ফাংশনটি `conio.h` হেডার ফাইল-এর অন্তর্ভুক্ত বলে প্রোগ্রামের শুরুতে `#include<conio.h>` স্টেটমেন্টটি ব্যবহার করা হয়েছে।

উপরের প্রোগ্রামটি নির্বাহ করার পর কিবোর্ড থেকে B ক্যারেক্টারটি প্রেস করলে তা `c=getch();` স্টেটমেন্ট এর কারণে `c` ভেরিয়েবলের জন্য এসাইন হবে এবং সাথে সাথে `putchar(c);` স্টেটমেন্ট এর কারণে তা কনসোলে প্রিন্ট হবে। কিন্তু প্রোগ্রাম টার্মিনেশন হবে না। পরে কিবোর্ড থেকে যে কোন কী প্রেস করলে প্রোগ্রাম টার্মিনেশন হবে। প্রোগ্রামটির শেষ `getch();` স্টেটমেন্ট এর জন্যই এরূপ হয়।

getche()-এর বিবরণ

এটি getch() এর মত একটি ইনপুট ফাংশন যাহা কিবোর্ড থেকে একটি মাত্র সিংগেল ক্যারেক্টার ডাটা গ্রহণের সাথে সাথে কিবোর্ডে এন্টার চাপ দেওয়া ব্যতীত সরাসরি কনসোলে তা প্রদর্শন করবে। এর সিনটেক্স নিম্নরূপ:

Variable-name = getche();

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
    char c;
    puts("Enter a character::  ");
    c=getche();
    puts("");
    puts("You Entered:: ");
    putchar(c);
}
Output:
Enter a character:: B
You Entered::
B
```

`getche();` লাইব্রেরি ফাংশনটি `conio.h` হেডার ফাইল এর অন্তর্ভুক্ত বলে প্রোগ্রামের শুরুতে `#include<conio.h>` স্টেটমেন্টটি ব্যবহার করা হয়েছে।

বিন্যস্ত (Formatted) ইনপুট-আউটপুট ফাংশন

সি প্রোগ্রামের বিন্যস্ত (Formatted) ইনপুট-আউটপুট ফাংশনগুলো হচ্ছে:

a) printf()
b) scanf()

printf()-এর বিবরণ

এটি একটি আউটপুট ফাংশন। int, float বা char টাইপ ডাটা সম্বলিত কোনো টেক্সট মেসেজ ডিস্প্লে করার জন্য printf()-ফাংশন ব্যবহৃত হয়। এর সিনটেক্স নিম্নরূপ:

printf("control strings/format_section", Variable_1, Variable_2, ... Variable_n);

or

printf("Message line or text line");

প্রথম সিনটেক্স লক্ষ্য করলে দেখা যায় সিনটেক্স-এর দু'টি সেকশন: ফরমেট সেকশন ও এক্সপ্রেশন সেকশন। ডাটা টাইপ অনুযায়ী ফরমেট সেকশনে 'ফরমেট স্পেসিফায়ার' ব্যবহার করা হয় এবং এক্সপ্রেশন সেকশনে আর্গুমেন্ট হিসাবে আউটপুট ডাটা আইটেম দিতে হবে।

scanf()-এর বিবরণ

এটি একটি ইনপুট ফাংশন। কিবোর্ড বা অন্য কোনো ইনপুট ডিভাইস থেকে int, float বা char টাইপ ডাটা ইনপুটের জন্য scanf()-ফাংশন ব্যবহৃত হয়। ডাটা টাইপ অনুযায়ী ফরমেট সেকশনে 'ফরমেট স্পেসিফায়ার' ব্যবহার করা হয় এবং এক্সপ্রেশন সেকশনে সংশ্লিষ্ট ভেরিয়েবলের নামে আগে অ্যাড্রেস অপারেটর (&) ব্যবহার করা হয় যা ভেরিয়েবল এর জন্য গৃহীত মান মেমোরির নির্দিষ্ট লোকেশনে সংরক্ষণ করে। তবে স্ট্রিং টাইপের ডাটা ইনপুট নেয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভেরিয়েবলের নামের আগে অ্যাড্রেস অপারেটর (&) ব্যবহার না করলেও চলে। এড্রেস অপারেটর ব্যবহার না করলে গৃহীত মান মোমোরিতে ভেরিয়েবলের সঠিক লোকেশনে প্রেরিত হয় না বিধায় প্রোগ্রাম নির্বাহের পর সঠিক ফল প্রদর্শন নাও করতে পারে। ডাটা ইনপুট গ্রহণের জন্য এন্টার কি চাপতে হয়।

scanf()-এর সিনটেক্স নিম্নরূপ:

scanf("control strings", Argument_1, Argument_2, Argument_3, ... Argument_n);

or

scanf("control strings", &Variable_1, &Variable_2, &Variable_3, ... & Variable_n);

```
#include<stdio.h>
main()
{
int x;
float y;
float z;
printf("Enter an integer= ");
scanf("%d", &x);
printf("Enter a float   = ");
scanf("%f", &y);
printf("Multiplication of %d and %f is %f sq.cm.", x, y, z=x*y);
return 0;
}
Output:
Enter an integer= 7
Enter an float  = 4.5
Multiplication of 7 and 4.50000 is 31.50000
```

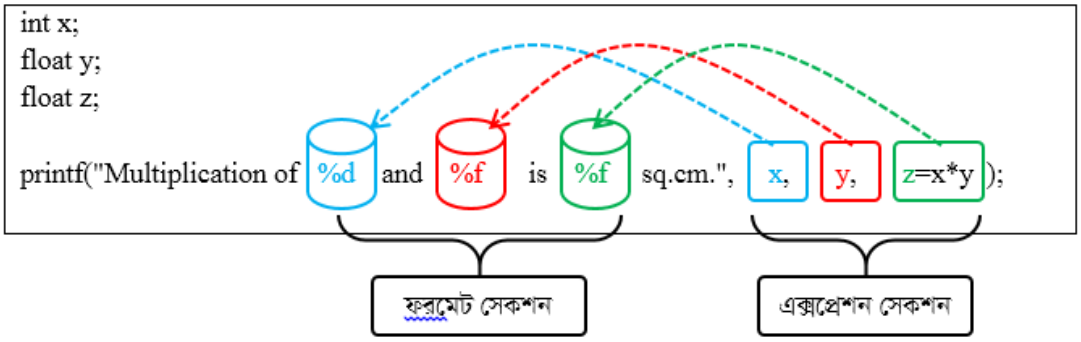

চিত্র: scanf()-এর সিনটেক্স-এর বিবরণ

gets ফাংশন এবং scanf() ফাংশনের পার্থক্য

সি প্রোগ্রামে gets ফাংশন এবং scanf() ফাংশনের মধ্যে পার্থক্য আছে। gets ফাংশনের মাধ্যমে ফাঁকা স্থানসহ একই সময়ে শুধুমাত্র একটি স্ট্রিং ইনপুট দেওয়া যায়। একই সময়ে যত ক্যারেক্টারই ইনপুট দেওয়া হোক না কেন ফাংশন তাকে একটি স্ট্রিং হিসেবে বিবেচনা করে। আর, scanf() ফাংশন একই সময়ে একাধিক স্ট্রিং ইনপুটের অনুমতি প্রদান করে। এখানে একই লাইনের প্রতিটি ফাঁকা স্থান আলাদা আলাদা ডেটা আইটেম নির্দেশ করে।

ফরম্যাট স্পেসিফায়ার (Format specifier)

সি প্রোগ্রামে ডাটা ইনপুট দিতে ও ডাটা আউটপুট পেতে Format specifier ব্যবহার করা হয়। নিচে কয়েকটি প্রয়োজনীয় Format specifier-এর একটি তালিকা প্রদান করা হলো:

ফরম্যাট স্পেসিফায়ার	বিবরণ	সমর্থিত ডাটা টাইপ
%c	একটি ক্যারেক্টার টাইপ ডাটা ইনপুট-আউটপুটের জন্য	char, unsigned char
%d বা %i	Integer টাইপ ডাটা ইনপুট-আউটপুটের জন্য	short, unsigned short int, long
%e or %E	float value-এর Scientific notation টাইপ ডাটা ইনপুট-আউটপুটের জন্য	float double
%f	Floating point টাইপ ডাটা ইনপুট-আউটপুটের জন্য	float
%l বা %ld বা %li	Signed Integer টাইপ ডাটা ইনপুট-আউটপুটের জন্য	long
%lf	ডাবল টাইপ ডাটা ইনপুট-আউটপুটের জন্য	double
%s	স্ট্রিং টাইপ ডাটা ইনপুট-আউটপুটের জন্য	char
%[^\n]	স্ট্রিং টাইপ (ফাঁকা স্পেসসহ) ডাটা ইনপুট-আউটপুটের জন্য	
%o	অক্টাল টাইপ ডাটা ইনপুট-আউটপুটের জন্য	short, unsigned short int, unsigned int, long
%x	Hexadecimal (Unsigned Integer) টাইপ ডাটা ইনপুট-আউটপুটের জন্য। যথা: a, b, c, d	short, unsigned short int, unsigned int, long
%X	Hexadecimal (Unsigned Integer) টাইপ ডাটা ইনপুট-আউটপুটের জন্য। যথা: A, B, C, D	short, unsigned short int, unsigned int, long
%g	float টাইপ মান%f অথবা %e নোটেশনে ডাটা ইনপুট-আউটপুটের জন্য	float, double
%G	float টাইপ মান%f অথবা %E নোটেশনে ডাটা ইনপুট-আউটপুটের জন্য	float, double
%hd	short integer value পড়ার জন্য	short

অনুশীলনের জন্য কয়েকটি প্রোগ্রাম কোড

ইনক্রিমেন্টাল ও ডিক্রিমেন্টাল অপারেটর অনুশীলন-এর প্রোগ্রাম কোড:

```
#include <stdio.h>
main()
{
   int a;
   int b;
   float c;
   float d;
    printf("\nEnter First Number: ");
    scanf("%d",&a);
    printf("\nEnter Second Number: ");
    scanf("%d",&b);
    printf("\nEnter Third Number: ");
    scanf("%f",&c);
    printf("\nEnter Fourth Number: ");
    scanf("%f",&d);
    printf ("\n==========================");
    printf ("\nSee your Result");
    printf ("\n==========================");
    printf("\n++a = %d \n", ++a);
    printf("\n--b = %d \n", --b);
    printf("\n++c = %2f \n", ++c);
    printf("\n--d = %2f \n", --d);
    return 0;
}
```

গাণিতিক অপারেটর অনুশীলন-এর প্রোগ্রাম কোড:

```
#include <stdio.h>
main()
{
   int a, b, sum, subt, multpl, div;
    printf("\nEnter First Number  a= ");
    scanf("%d",&a);
    printf("\nEnter Second Number b= ");
    scanf("%d",&b);
    sum=a+b;
    printf("\na + b = %d", sum);
    subt=a-b;
    printf("\na - b = %d", subt);
    multpl=a*b;
    printf("\na * b = %d", multpl);
    div=a/b;
    printf("\na / b = %d", div);
    return 0;
}
```

অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর অনুশীলন-এর প্রোগ্রাম কোড:

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a = 10, b;
    printf("If a = 10;");
    b = a;
    printf("\nExample of ( = ) operator :: b = %d", b);
    b += a; // b = b+a
    printf("\nExample of ( += ) operator:: b = %d", b);
    b -= a; // b = b-a
    printf("\nExample of ( -= ) operator:: b = %d", b);
    b *= a; // b = b*a
    printf("\nExample of ( *= ) operator:: b = %d", b);

    b /= a; // b = b/a
    printf("\nExample of ( /= ) operator:: b = %d", b);
    b %= a; // b = b%a
    printf("\nExample of Modulus operator:: b = %d", b);
    return 0;
}
```

বিটওয়াইজ অপারেটর অনুশীলন-এর প্রোগ্রাম কোড:

```
#include <stdio.h>
main() {
unsigned int a = 21;     /* 21 = 00010101 */
   unsigned int b = 25;  /* 25 = 00011001 */
   int c = 0;
   c = a & b;       /* 17 = 00010001 */
   printf("Value of Bitwise AND is:: %d\n", c );
   c = a | b;       /* 29 = 00011101 */
   printf("Value of Bitwise OR is :: %d\n", c );
   c = ~a;          /*-22 = 01101010 */
   printf("Value of Bitwise NOT for a is:: %d\n", c );
   c = ~b;          /*-26 = 01100110 */
   printf("Value of Bitwise NOT for b is:: %d\n", c );
   c = a ^ b;       /* 12 = 00001100 */
   printf("Value of XOR is:: %d\n", c );
   c = a << 1;     /* 42 = 000101010 */
   printf("Value of Left Shift a=1 is:: %d\n", c );
```

```
    c = a << 2;      /* 84 = 01010100 */
    printf("Value of Left Shift a=2 is:: %d\n", c );
    c = b << 1;      /* 50 = 00110010 */
    printf("Value of Left Shift b=1 is:: %d\n", c );
    c = b << 2;      /* 100 = 01100100 */
    printf("Value of Left Shift b=1 is:: %d\n", c );
    c = a >> 1;      /* 10 = 00001010 */
    printf("Value of Right Shift a=1 is:: %d\n", c );
    c = a >> 2;      /* 5 = 00000101 */
    printf("Value of Right Shift a=2 is:: %d\n", c );
}
```

৫.১১ কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট (Control Statement)

সি প্রোগ্রামে নির্দেশগুলো সাধারণত: সরল অনুক্রমে নির্বাহ হয় অর্থাৎ প্রোগ্রামে বর্ণিত স্টেটমেন্ট অনুযায়ী নির্দেশগুলো ধারাবাহিকভাবে নির্বাহ হয়। কিন্তু, কোনো কোনো সময় এ অনুক্রমের ব্যত্যয় ঘটিয়েও কোনো শর্ত সাপেক্ষে বা ফলাফলের ভিত্তিতে অপর কোনো স্টেটমেন্টের ভিত্তিতে প্রোগ্রাম নির্বাহ করা দরকার হয়। এ জন্য বিভিন্ন কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয়। সি প্রোগ্রামে দুই ধরণের কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয়। যথা -

১. কন্ডিশনাল কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট (Conditional Control Statement)
২. লুপ কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট (Loop Control Statement)

কন্ডিশনাল কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট (Conditional Control Statement):

সি প্রোগ্রামে নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে এক বা একাধিক স্টেটমেন্ট সম্পাদনের জন্য কন্ডিশনাল কন্টোল স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। এরূপ শর্তযুক্ত স্টেটমেন্টকে কন্ডিশনাল কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট বলে। কন্ডিশনাল কন্ট্রোলে ব্যবহৃত শর্ত সত্য বা মিথ্যা হওয়ার ভিত্তিতে ফলাফলে তারতম্য ঘটে। সি প্রোগ্রামে ৪ প্রকারের কন্ডিশনাল কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট আছে। এগুলো হচ্ছে:

১. if স্টেটমেন্ট
২. if ... ... else স্টেটমেন্ট বা ডিসিশন মেকিং স্টেটমেন্ট
৩. else if স্টেটমেন্ট বা nested if স্টেটমেন্ট
৪. switch case স্টেটমেন্ট বা সিলেকশন স্টেটমেন্ট

If স্টেটমেন্ট:

সি প্রোগ্রামে 'যদি' অর্থে if স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। শর্ত সাপেক্ষে কোনো স্টেটমেন্ট সম্পাদনের জন্য if স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয়। if স্টেটমেন্টে শর্ত হিসেবে সাধারণত এক বা একাধিক লজিক্যাল বা রিলেশনাল এক্সপ্রেশন থাকে যা if পরবর্তী প্রথম বন্ধনীর মধ্যে লেখা হয়। শর্তটি যদি সত্য হয় তবে Statement Block; এর মধ্যে থাকা স্টেটমেন্টগুলো নির্বাহ হবে। আর শর্ত মিথ্যা হলে if স্টেটমেন্ট ব্লক এর বাইরে কোন কোড/স্টেটমেন্ট থাকলে তা নির্বাহ হবে।। if স্টেটমেন্ট এর গঠন নিম্নরূপ:

Simple statement এর ক্ষেত্রে:

```
if (Condition)
{
  Statement 1;
}
```

Compound statement এর ক্ষেত্রে:

```
if (Condition)
{
Statement 1;
Statement 2;
.....
Statement n;
}
```

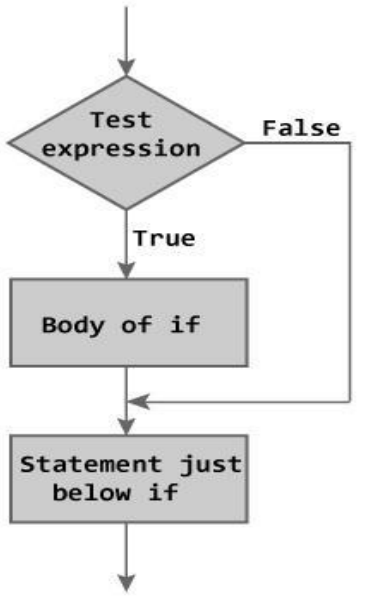

Figure: Flowchart of if Statement

Source: https://www.programiz.com

if এর পর প্রথম বন্ধনীর ভেতর কন্ডিশনটি লিখতে হয়। if (Condition) স্টেটমেন্টের শেষে কোনো সেমিকোলন থাকে না। একাধিক লজিক্যাল বা রিলেশনাল এক্সপ্রেশন থাকলে দ্বিতীয় বন্ধনীর ভেতর স্টেটমেন্টগুলো পর পর লিখতে হয়।

উদাহরণ:

```
#include<stdio.h>
main()
{
  int num=20;
  if(num<30)
  {
    printf("Value of num is less than 30.\n");
  }
  printf("Value of num is %d.",num);
}
```

Output:

```
Value of num is less than 30.
Value of num is 20.
```

উপরের প্রোগ্রামটিতে if এর পর ১ম বন্ধনীর মধ্যকার শর্তটি সত্য বলে if স্টেটমেন্ট ব্লক-এর মধ্যকার printf("Value of num is less than 30.\n"); স্টেটমেন্টটি নির্বাহ হবে। এটি নির্বাহ হওয়ার পর if স্টেটমেন্ট ব্লক-এর বাইরের printf("Value of num is %d.",num); স্টেটমেন্টটিও নির্বাহ হবে। কারন if এর পর ১ম বন্ধনীর মধ্যকার শর্তটি সত্য বা মিথ্যা হওয়ার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

কিন্তু প্রোগ্রামটির শর্ত যদি (num>30) হয় তাহলে এর আউটপুট নিম্নরূপ হবে-

Value of num is 20.

কারণ-

এক্ষেত্রে উপরের প্রোগ্রামটিতে if এর পর ১ম বন্ধনীর মধ্যকার শর্তটি মিথ্যা বলে if স্টেটমেন্ট ব্লক-এর মধ্যকার printf("Value of num is less than 30.\n"); স্টেটমেন্টটি নির্বাহ হবে না। তবে if স্টেটমেন্ট ব্লক-এর বাইরের printf("Value of num is %d.", num); স্টেটমেন্টটি নির্বাহ হবে। কারণ if এর পর ১ম বন্ধনীর মধ্যকার শর্তটি সত্য বা মিথ্যা হওয়ার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

অনুশীলন : if স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে দু'টি সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যাটি নির্ণয় করার প্রোগ্রাম লিখন।

```
#include<stdio.h>
main()
{

int num1, num2;
printf("Enter two numbers:: ");
scanf("%d %d", &num1, &num2);

if (num1>num2)
{
    printf("%d is bigger than %d", num1, num2);
}
if (num1<num2)
{
    printf("%d is bigger than %d", num2, num1);
}
}
```

Output:

```
Enter two numbers:: 12 34
34 is bigger than 12
```

If ... ... else স্টেটমেন্ট

সি প্রোগ্রামে 'অন্যথায়' অর্থে if স্টেটমেন্টসহ else স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। এটিকে ডিসিশন স্টেটমেন্টও বলা হয়।

if স্টেটমেন্ট এর গঠন নিম্নরূপ:

Simple statement এর ক্ষেত্রে:

```
if (Condition)
    {
        Statement 1;
    }
    else
    {
        Statement 2;
    }
```

Compound statement এর ক্ষেত্রে:

```
if (Condition)
    {
        Statement 1;
        ..................
        Statement n;
    }
    else
    {
        Statement e1;
        ..................
        Statement en;
    }
```

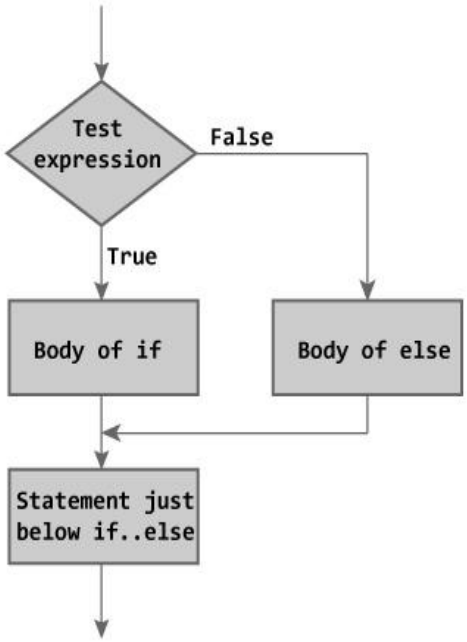

Figure: Flowchart of if...else Statement

Source: https://www.programiz.com

অনুশীলন : if ... ... else **স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে দু'টি সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যাটি নির্ণয় করার প্রোগ্রাম লিখন।**

```
#include<stdio.h>
main()
{
int num1, num2;
printf("Enter two numbers:: ");
scanf("%d %d", &num1, &num2);

if (num1>num2)
    {
        printf("%d is greater than %d", num1, num2);
    }
else
    {
        printf("%d is greater than %d", num2, num1);
    }
}
```

Output:

```
Enter two numbers:: 12 34
34 is greater than 12
```

else if স্টেটমেন্ট বা nested if স্টেটমেন্ট

সি প্রোগ্রামে "অন্যথায় যদি" অর্থে if ... else স্টেটমেন্টের সাথে else if স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণমূলক প্রোগ্রাম রচনা করা হয়। পূর্বের প্রোগ্রামগুলোতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া সহজ মানের ছিল। কিন্তু, একাধিক শর্ত যাচাই যথা একটি if বা একটি else এর ভিতর আরো এক বা একাধিক if ... else ব্লক থাকলে সে গুলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কাজে লাগানোর জন্য nested if স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। if.... else স্টেটমেন্টের if এবং else স্টেটমেন্টের মাঝে else if স্টেটমেন্ট বসে। else if স্টেটমেন্ট else এবং if এর মাঝে ফাঁকা স্থান থাকে। else if স্টেটমেন্ট এর গঠন নিম্নরূপ:

```
if (Condition1)
        {
        Statement 1;
        }
else if (Condition 2)
        {
        Statement 2;
        }
else if (Condition 3)
        {
        Statement 3;
        }
        .....................
else
        {
        Default Block;
        }
        Block N;
        .....................
```

If এবং else if এর পরে প্রথম বন্ধনীর মধ্যেশর্তসমূহ লিখা হয়। প্রোগ্রামে একাধিক সংখ্যক else if স্টেটমেন্ট থাকতে পারে। তবে if কিংবা else কিংবা if ... else সম্পর্কিত একটি মাত্রস্টেটমেন্ট সম্পাদিত হয়।

অনুশীলনঃ else if স্টেটমেন্ট বা nested if স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে তিনটি সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যা নির্ণয়ের প্রোগ্রাম

```
#include <stdio.h>
main()
{
    int n1, n2, n3;
    printf("Enter three numbers: ");
    scanf("%d %d %d", &n1, &n2, &n3);

    if( n1>=n2 && n1>=n3)
    {
        printf("%d is the largest number.", n1);
    }
    else if (n2>=n1 && n2>=n3)
    {
        printf("%d is the largest number.", n2);
    }
    else
    {
        printf("%d is the largest number.", n3);
    }
}
```

```
Output:
Enter three numbers: 12  34  26
34 is largest number
```

অনুশীলনঃ else if স্টেটমেন্ট বা nested if স্টেটমেন্টব্যবহার করে কোন সাল লিপইয়ার কি-না তা নির্ণয়ের প্রোগ্রাম

```
#include<stdio.h>
main()
{
int x;
printf("\nEnter a year: ");
scanf("%d", &x);
if (x%400==0)
    printf("\n%d is a Leap year!", x);
else if ((x%100 !=0) && (x%4==0))
    printf("\n%d is a Leap year!", x);
else
    printf("\n%d is not a Leap year.", x);
}
```

switch স্টেটমেন্ট

একাধিক স্টেটমেন্ট থেকে কোনো নির্দিষ্ট স্টেটমেন্ট সম্পাদনের জন্য switch স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয় । মূলত বেশি সংখ্যক else if স্টেটমেন্ট ব্যবহারের পরিবর্তে switch স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয় । সাধারণত: বেশ কিছু সংখ্যক else ... if স্টেটমেন্ট ব্যবহার না করে এর পরিবর্তে switch স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে কাজ করা হয় । switch স্টেটমেন্ট-এর সাথে অতিরিক্ত case, break ও default স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হতে পারে । else if স্টেটমেন্ট কোনো কন্ডিশনাল কিংবা রিলেশনাল এক্সপ্রেশনের ওপর ভিত্তি করে উপযুক্ত স্টেটমেন্ট নির্বাচন করা হয় । কিন্তু switch স্টেটমেন্টে সাধারণত কোনো বৈধ ভেরিয়েবলের মানের ভিত্তিতে উপযুক্ত স্টেটমেন্ট নির্বাচন করা হয় । switchস্টেটমেন্ট-এর গঠন নিম্নরূপ:

```
Data Type Index variable;
switch (expression)
{
Case value1:
        Block 1: or statement1;
          Break;
Case value2:
        Block 2: or statement2;
          Break;
Case value3:
        Block 3: or statement3;
          Break;
.....
.....
case valueN:
        Block N: or statementN;
          Break;
default:
        default Block or statement;

}
```

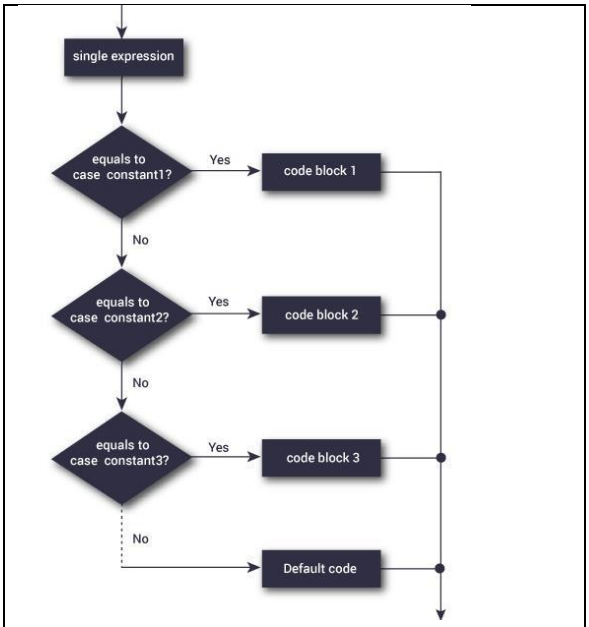

Source: https://www.programiz.com

Switch স্টেটমেন্ট-এর গঠন লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এখানে চারটি কিওয়ার্ড ব্যবহৃত হয়:

1. switch 2. case 3. break 4. default

switch

ifস্টেটমেন্ট-এর মত switch এর পরে প্রথম বন্ধনীর '( )' মধ্যে expression লিখতে হয়। এ expression সাধারণত পূর্ণ সংখ্যা বা ক্যারেক্টার টাইপের একটা ভেরিয়েবল হয়ে থাকে।

case

switch এর অন্তর্গত expression এর মান তুলনা করা হয় case এর সাথে যুক্ত মানের সঙ্গে। যে মানের সঙ্গে মিলবে বা সত্য হবে। সেই case সংশ্লিষ্ট statement(s) এক্সিকিউট বা সম্পাদিত হবে।

break

case label এর সাথে সংশ্লিষ্ট simple বা compound স্টেটমেন্টের শেষে break statementটি ব্যবহার করা হয়। ফলে কম্পিউটার বুঝতে পারে উপরিউক্ত caselabel টির কাজ শেষ। তবে default case এর সাথে break statement টি ব্যবহার করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই, তবে ব্যবহার করা ভালো।

default

if else স্টেটমেন্ট এ যে কাজে else কে ব্যবহার করা হয়েছে সেই একই কাজে switch স্টেটমেন্ট এ default ব্যবহার করা হয়। উল্লেখ্য যে, default এর পর কোলন (:) ব্যবহার করতে হয়।

অনুশীলন: switch statement ব্যবহার করে সপ্তাহের দিবস বের করার প্রোগ্রাম:

```
#include<stdio.h>
int main( )
    {
     int day;
     printf("\nEnter serial number of the day:");
     scanf("%d",&day);
     switch(day)
        {
          case 1:
                  printf("1st day of week is Saturday");
                  break;
          case 2:
                  printf("2nd day of week is Sunday");
                  break;
          case 3:
                  printf("3rd day of week is Monday");
                  break;
          case 4:
                  printf("4th day of week is Tuesday");
                  break;
          case 5:
                  printf("5th day of week is Wednesday");
                  break;
          case 6:
                  printf("6th day of week is Thursday");
                  break;
          case 7:
                  printf("7th day of week is Friday");
                  break;
          default:
                  printf("Choice is NOT valid");
        }
     }
```

অনুশীলন: switch statement ব্যবহার করে একটি শব্দের বিভিন্ন বর্ণের অবস্থান বের করার প্রোগ্রাম:

```
#include<stdio.h>
int main()
    {
int x=1;
printf("\nEnter position of letter DESH:");
scanf("%d",&x);
switch(x)
    {
        case 1:
            printf( "1st letter is D" );
            break;
        case 2:
            printf( "2nd letter is E" );
            break;
        case 3:
            printf( "3rd letter is S" );
            break;
            case 4:
            printf( "4th letter is H" );
            break;
        default:
            printf("Invalid Choice");
    }
}
```

অনুশীলন : switch statement ব্যবহার করে এমসিকিউ প্রশ্ন তৈরির প্রোগ্রাম:

```
#include<stdio.h>
main ()
{
char userInput;
printf("\nWhich one is the Capital City of Bangladesh?\n");
printf("\na)Chittagong\n");
printf("b)Khulna\n");
printf("c)Dhaka\n");
printf("d)Comilla\n");
printf("\nWrite a or b or c or d :  ");
scanf("%c", &userInput);
switch (userInput)
{
case 'a':
{
printf("\nTry again!\n");
break;
}
```

```
case 'b':
{
printf("\nTry again!\n");
break;
}
case 'c':
{
printf("\nCorrect Answer!\n");
break;
}
case 'd':
{
printf("\nTry again!\n");
break;
}
default:
printf("\nInvalid choice\n");
break;
}
return 0;
}
```

নোট : case value হিসাবে ক্যারেক্টার দিলে উক্ত ক্যারেক্টারে সিংগেল কোটেশন দিতে হয় । যেমন: 'c', 'd' ইত্যাদি ।

৫.১২ লুপ স্টেটমেন্ট (Loop Statement)

সাধারণত: প্রোগ্রামে স্টেটমেন্টসমূহ পর্যায়ক্রমে একবার করে নির্বাহ হয় । কোনো ফাংশনের বা স্টেটমেন্ট ব্লকের প্রথম স্টেটমেন্ট নির্বাহ শেষ হলে দ্বিতীয়টি নির্বাহ হবে; দ্বিতীয়টির পর পরেরটি নির্বাহ হবে । এভাবে চলতে থাকে । কোনো কোনো সময় অবস্থার প্রেক্ষিতে কোনো প্রোগ্রামের একটি স্টেটমেন্ট বা একাধিক স্টেটমেন্টসমূহ (কোড ব্লক) বার বার নির্বাহ করতে হয় অর্থাৎ প্রোগ্রামের কোনো অংশ বিশেষ নির্দিষ্ট সংখ্যক বার কোনো শর্তে না পৌঁছা পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করে নির্বাহ করতে হয় । সি প্রোগ্রামে এভাবে প্রোগ্রামের কোনো অংশ নির্বাহের সময় শর্ত সাপেক্ষে বার বার প্রক্রিয়াকরণ করাকে চক্রাবর্ত বা লুপ বলে ।

সি প্রোগ্রামে লুপ দুই প্রকার । যথা :

১. শর্তযুক্ত লুপ (Conditional Loop)

২. শর্তবিহীন লুপ (Unconditional Loop)

১. শর্তযুক্ত লুপ (Conditional Loop)

যে লুপ নির্বাহের জন্য শর্ত আরোপ করা হয় অর্থাৎ কোন শর্ত সত্য বা মিথ্যা হওয়া সাপেক্ষে প্রোগ্রামের কোনো নির্দিষ্ট অংশ বার বার প্রক্রিয়াকরণ করা হয় তাকে শর্তযুক্ত লুপ বলে । নিম্নে শর্তযুক্ত লুপের একটি উদাহরণ দেওয়া হলো:

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
 int x;
 for(x=1; x<=10; x++)
 {
   printf("\nHello world!\n");
}
 getch();
}
```

নোট: উপরের প্রোগ্রামটি নির্বাহ করলে x এর মান ১ থেকে শুরু করে প্রতিবার ১ করে বৃদ্ধি পাবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত x<=10 শর্তটি সত্য হবে ততক্ষণ Hello world! টেক্সটটি কনসোলে প্রিন্ট হতে থাকবে। এক্ষেত্রে এটি মোট ১০ বার প্রিন্ট হবে।

২. শর্তবিহীন লুপ (Unconditional Loop)

যে লুপ নির্বাহের জন্য শর্ত আরোপ করা প্রয়োজন হয় না তাকে শর্তবিহীন লুপ বলে। নিম্নে শর্তবিহীন লুপের একটি উদাহরণ দেওয়া হলো:

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>

main()
{

 for(; ; )
 {
   printf("\nHello world!\n");
}
 getch();
}
```

উল্লেখ্য যে, লুপ নির্বাহের জন্য শর্ত আরোপ না করায় প্রোগ্রামটি অবিরত চলতে থাকবে।

উপরের উদাহরণগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায়, প্রোগ্রামে লুপ স্টেটমেন্টসমূহ সাধারণত দুইটি অংশে বিভক্ত থাকে: টেস্ট কন্ডিশন ও লুপ বডি। টেস্ট কন্ডিশন অংশে প্রোগ্রাম নির্বাহের জন্য শর্ত আরোপ করা থাকে। লুপ বডির নির্বাহ শুরুর আগেই টেস্ট কন্ডিশন পরীক্ষা করা হয়। এ ক্ষেত্রে কন্ডিশন সত্য না হলে লুপ বডি'র স্টেটমেন্টসমূহ নির্বাহ হয় না।

সি প্রোগ্রামের লুপ স্টেটমেন্টসমূহ

সি প্রোগ্রামের লুপ নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নোল্লিখিত স্টেটমেন্টসমূহ ব্যবহৃত হয়:

১. for লুপ স্টেটমেন্ট (for Loop Statement)
২. while লুপ স্টেটমেন্ট (while Loop Statement)
৩. do … while লুপ স্টেটমেন্ট (do … while Loop Statement)
৪. continue স্টেটমেন্ট (continueStatement)
৫. break স্টেটমেন্ট (breakStatement)
৬. goto স্টেটমেন্ট (gotoStatement)

লুপ স্টেটমেন্টের টেস্ট কন্ডিশন ও লুপ বডি'র অবস্থানের ভিত্তিতে লুপ স্টেটমেন্টসমূহ দুই প্রকার। যথা-

১. এন্ট্রি কন্ট্রোল লুপ (Entry Control Loop)
২. এক্সিট কন্ট্রোল লুপ (Exit Control Loop)

এন্ট্রি কন্ট্রোল লুপ (Entry Control Loop)

এটি কন্ট্রোল লুপে লুপ বডির নির্বাহ শুরুর আগেই টেস্ট কন্ডিশন যাচাই করা হয়। কন্ডিশন সত্য না হলে লুপ বডি সম্পাদিত হয় না। এন্ট্রি কন্ট্রোল লুপ নির্বাহের জন্য প্রধানত দুইটি স্টেটমেন্টের ব্যবহার করা হয়: (১) for স্টেটমেন্ট (২) while স্টেটমেন্ট।

এক্সিট কন্ট্রোল লুপ (Exit Control Loop)

এটি কন্ট্রোল লুপে প্রথমে একবার লুপ নির্বাহ হয়। তারপর টেস্ট কন্ডিশন যাচাই করা হয়। কন্ডিশন সত্য হলে লুপ বডি সম্পাদিত হয়। এক্সিট কন্ট্রোল লুপের জন্য do-while স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয়।

for লুপ স্টেটমেন্ট

সি প্রোগ্রামে কোনো স্টেটমেন্ট নির্দিষ্ট সংখ্যকবার সম্পাদন করতে for loop স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয় । লুপ কতবার নির্বাহ করা হবে তা জানা থাকলেই কেবলমাত্র for loop ব্যবহার করা যায় । এ জন্য কাউন্টার ভেরিয়েবল ব্যবহার করা হয় । for লুপ স্টেটমেন্ট-এর গঠন নিম্নরূপ:

```
Counter variable declaration;
for (Counter variable initialization;
condition / variable range; decrement
/ increment)
{
Statement (s)
}
```

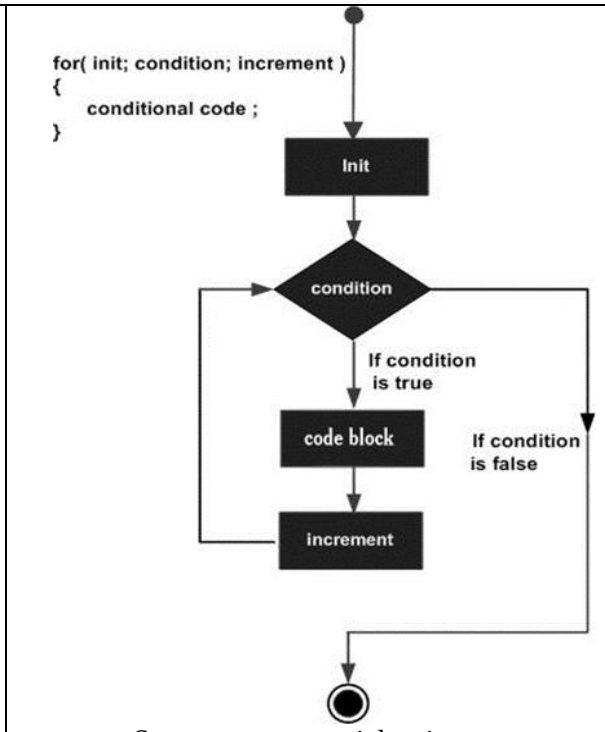

Source: www.tutorialspoint.com

Counter variable Declaration অংশে উপযুক্ত ডেটা টাইপসহ কাউন্টার ভেরিয়েবল ঘোষণা করা হয় । Counter variable initialization অংশে কাউন্টার ভেরিয়েবলের প্রারম্ভিক মান বা শুরুর মান দিতে হয়, condition / variable range অংশে কাউন্টার ভেরিয়েবলের চূড়ান্ত মান বা চূড়ান্ত মান নির্ধারণের শর্ত দেয়া হয় এবং decrement/increment অংশে প্রতিবার আবর্তনে কাউন্টার ভেরিয়েবলের হ্রাস/বৃদ্ধির মান নির্ধারণ করা হয় যেন কাউন্টার ভেরিয়েবল চূড়ান্ত মানে না পৌছা পর্যন্ত কিংবা শর্ত সত্য থাকা পর্যন্ত লুপের সাথে সংশ্লিষ্ট স্টেটমেন্ট সম্পাদিত হতে থাকে । Counter variable initialization কেবলমাত্র প্রথমবার নির্বাহ হয় । এর পর condition / variable range নির্বাহ হয় । এটি false (0) হলে for লুপের সমাপ্তি ঘটে । কিন্তু condition / variable range যদি True হয় তবে for লুপের কোড ব্লক নির্বাহ হয় এবং decrement/increment-এর ভ্যালু আপডেট হতে থাকে । condition / variable range মিথ্যা না হওয়া পর্যন্ত এটি চলতে থাকে ।

অনুশীলন: for loop ব্যবহার করে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত পূর্ণ সংখ্যা আউটপুট নেওয়ার জন্য সি প্রোগ্রাম।

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
 int x;
 for(x=1; x<=10; x++)
 {
   printf("\n %d\n",x);
}
 getch();
}
```

অনুশীলন: for loop ব্যবহার করে I loveBangladesh বাক্যটি ১০ বার প্রিন্ট করার প্রোগ্রাম।

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>


main()
{
 int x;
 for(x=1; x<=10; x++)
 {
printf("\n I love Bangladesh.\n");
}
 getch();
}
```

while স্টেটমেন্ট

সি প্রোগ্রামে কোনো স্টেটমেন্ট দুই বা ততোধিকবার শর্ত সাপেক্ষে সম্পাদনের জন্য whileloop ব্যবহার করা হয়। for loop-এর বিকল্প হিসেবেও while loop ব্যবহার করা হয়। for loop-এর মতো এ ক্ষেত্রেও কাউন্টার ভেরিয়েবল ব্যবহার করে while loop স্টেটমেন্ট-এর আবর্তন সংখ্যা গণনা করা হয়। while loop স্টেটমেন্ট-এর গঠন নিম্নরূপ:

```
Counter variable declaration;
Counter variable initialization;
while (condition / variable range)
{
Statement (s)
decrement / increment;
}
```

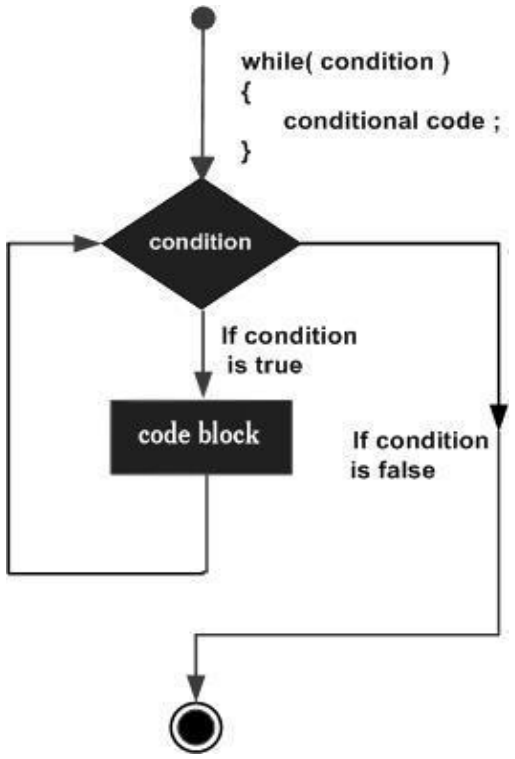

Source: www.tutorialspoint.com

Counter variable declaration অংশে উপযুক্ত ডেটা টাইপসহ কাউন্টার ভেরিয়েবল ঘোষণা করা হয়। এরপর Counter variable initialization; অংশে কাউন্টার ভেরিয়েবলের প্রারম্ভিক মান বা শুরুর মান দিয়ে সেমিকোলন (;) দিতে হয়। condition / variable range অংশে কাউন্টার ভেরিয়েবলের চূড়ান্ত মান বা চূড়ান্ত মান নির্ধারণের শর্ত দেয়া হয়। কার্লি ব্রাকেটের মধ্যে স্টেটমেন্ট দিয়ে decrement/increment অংশে প্রতিবার আবর্তনে কাউন্টার ভেরিয়েবলের হ্রাস/বৃদ্ধির মান নির্ধারণ করে সেমিকোলন (;) দিতে হয়। কাউন্টার ভেরিয়েবল চূড়ান্ত মানে না পৌঁছা পর্যন্ত কিংবা শর্ত সত্য থাকা পর্যন্ত লুপের সাথে সংশ্লিষ্ট স্টেটমেন্ট সম্পাদিত হতে থাকে।

অনুশীলন: while loop ব্যবহার করে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত পূর্ণ সংখ্যা আউটপুট নেওয়ার জন্য সি প্রোগ্রাম।

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>


main()
{
 int x;
 x=1;
 while( x<=10)
 {
   printf("\t %d\t",x);
   x++;
 }
getch();
}
```

Output:

```
1    2    3    4    5
6    7    8    9    10
```

অনুশীলন: while loop ব্যবহার করে I loveBangladesh বাক্যটি ১০ বার প্রিন্ট করার প্রোগ্রাম।

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>

main()
{
 int x;
 x=1;
 while(x<=10)
 {
printf("\n Line %d: ", x);
   printf("\I love Bangladesh.\n");
   x++;
 }
 getch();
}
```

```
Output:
Line 1: I love Bangladesh.
Line 2: I love Bangladesh.
Line 3: I love Bangladesh.
Line 4: I love Bangladesh.
Line 5: I love Bangladesh.
Line 6: I love Bangladesh.
Line 7: I love Bangladesh.
Line 8: I love Bangladesh.
Line 9: I love Bangladesh.
Line 10: I love Bangladesh.
```

do ... while স্টেটমেন্ট

সি প্রোগ্রামে কোনো স্টেটমেন্ট দুই বা ততোধিকবার শর্ত সাপেক্ষে সম্পাদনের জন্য do…while ব্যবহার করা হয়। এটিও পূর্ববর্তী লুপসমূহের মত ব্যবহার করা হয়। for loop-এর মতো এ ক্ষেত্রেও কাউন্টার ভেরিয়েবল ব্যবহার করে আবর্তন সংখ্যা গণনা করা হয়। do…while স্টেটমেন্ট-এর গঠন নিম্নরূপ :

```
Counter variable declaration;
Counter variable initialization;
do
        {
        Statement (s)
        decrement / increment;
        }
while (condition / variable range);
```

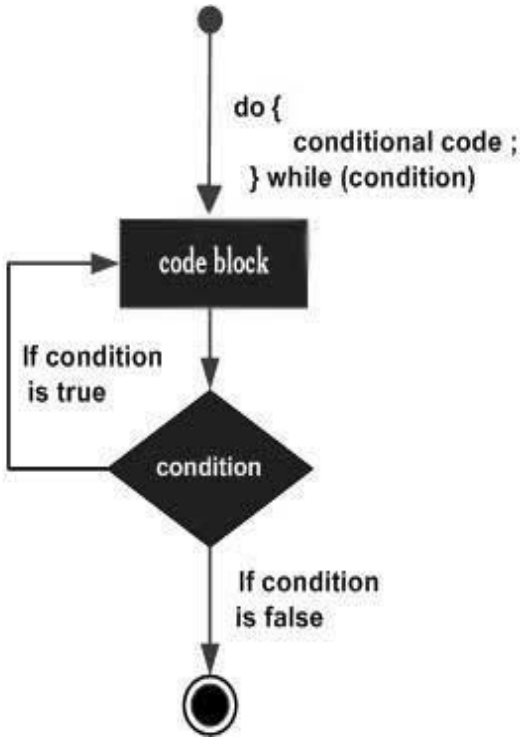

Source: www.tutorialspoint.com

Counter variable declaration অংশে উপযুক্ত ডেটা টাইপসহ কাউন্টার ভেরিয়েবল ঘোষণা করে Counter variable initializationঅংশে কাউন্টার ভেরিয়েবলের প্রারম্ভিক মান বা শুরুর মান দিয়ে সেমিকোলন (;) দিতে হয়। তারপর, do লুপ

দিয়ে কার্লি ব্রাকেটের মধ্যে স্টেটমেন্ট দিয়ে decrement/increment অংশে প্রতিবার আবর্তনে কাউন্টার ভেরিয়েবলের হ্রাস/বৃদ্ধির মান নির্ধারণ করে সেমিকোলন (;) দিতে হয়। এরপর, while লুপ-এ কন্ডিশন হিসেবেcondition / variable range প্রদান করে সেমিকোলন (;) দিতে হয়।

অনুশীলন: do ... while ব্যবহার করে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত পূর্ণ সংখ্যা আউটপুট নেওয়ার জন্য সি প্রোগ্রাম।

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>

main()
{
 int x;
 x=1;
 do
 {
   printf("\t %d\t",x);
   x++;
 } while( x<=10);
getch();
}
```

Output:

```
1    2    3    4    5
6    7    8    9    10
```

অনুশীলন: do ... while ব্যবহার করে I loveBangladesh বাক্যটি ১০ বার প্রিন্ট করার প্রোগ্রাম।

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>

main()
{
 int x;
 x=1;
 do
 {
   printf("\n Line %d: ", x);
   printf("\I love Bangladesh.\n");
   x++;
 }
 while(x<=10);
 getch();
}
```

```
Output:
Line 1: I love Bangladesh.
Line 2: I love Bangladesh.
Line 3: I love Bangladesh.
Line 4: I love Bangladesh.
Line 5: I love Bangladesh.
Line 6: I love Bangladesh.
Line 7: I love Bangladesh.
Line 8: I love Bangladesh.
Line 9: I love Bangladesh.
Line 10: I love Bangladesh.
```

নেস্টেড লুপ (Nested Loop)

এছাড়াও একটি লুপের ভিতরে আর একটি লুপ চালনা করেও লুপ সৃস্টি করা যায়। এ জাতীয় লুপকে নেস্টেড লুপ বলে। যে কোনো প্রকারের লুপের ভিতর অন্য যে কোনো লুপ দিয়ে নেস্টেড লুপ তৈরি করা যাবে। নিচে নেস্টেড লুপ-এর গঠন প্রদান করা হলো :

nested for loop গঠনের সিনটেক্স

```
Counter variable declaration for outer loop;
Counter variable declaration for inner loop;
for (counter variable initialization for outer loop; condition/variable range; decrement/increment)
{
   for (counter variable initialization for inner loop; condition/variable range; decrement/increment)
   {
     statement(s);
   }
  statement(s);
}
```

nested while loop গঠনের সিনটেক্স

```
Counter variable declaration for outer loop;
Counter variable declaration for inner loop;
counter variable initialization for outer loop;
counter variable initialization for inner loop;
while (condition of outer loop)
{
     while (condition inner loop)
     {
        statement(s);
        increment/decrement;
     }
  statement(s);
  increment/decrement;
}
```

nested do … while loop গঠনের সিনটেক্স

```
Counter variable declaration for outer loop;
Counter variable declaration for inner loop;
counter variable initialization for outer loop;
counter variable initialization for inner loop;
do
{
    statement(s);
    do
    {
       statement(s);
     }
     while (condition for inner loop);
}
while (condition for outer loop);
```

অনুশীলন: nested for loop ব্যবহার করে ২ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা বের করার প্রোগ্রাম।

```
#include<stdio.h>
main()
{
int i, j;
    for(i = 2; i<10; i++)
    {
        for(j = 2; j <= (i/j); j++)
        if(!(i%j))
        break; // if factor found, not prime
        if(j > (i/j))
        printf("\n%d is prime", i);
    }
    return 0;
}
```

Output:

```
2 is prime
3 is prime
5 is prime
7 is prime
```

continue স্টেটমেন্ট :

সি প্রোগ্রামে continue নামে একটি বিল্ট-ইন স্টেটমেন্ট আছে যা প্রোগ্রামের সাধারণ ধারাকে পরিবর্তন করে। যখন কোনো একটি এক্সপ্রেশন ফল্‌স না হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হয় তখন continue স্টেটমেন্ট কিছু স্টেটমেন্টকে এড়িয়ে গিয়ে প্রোগ্রাম টারমিনেট করে বা পরবর্তী ধাপে নিয়ে যায়। এছাড়া switch স্টেটমেন্ট থেকে বের হতেও continue স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ শর্তযুক্ত বা শর্তহীনভাবে কোনো স্টেটমেন্ট কিছু স্টেটমেন্ট এড়িয়ে গিয়ে বা লুপের ভিতরে কোনো স্টেটমেন্ট পুনরাবৃত্তি করার জন্য continue স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। এ ক্ষেত্রে, কোনো লুপে স্টেটমেন্ট অংশের যেখানে continue পাওয়া যাবে সেখান থেকে পরবর্তী ইনস্ট্রাকশনগুলো এক্সিকিউট হবে না এবং স্টেটমেন্ট অংশ আবার প্রথম থেকে কাজ শুরু করবে অর্থাৎ continue স্টেটমেন্ট প্রোগ্রাম পয়েন্টারকে পূর্ববর্তী স্টেটমেন্ট বা লুপে স্থানান্তর করে। নিম্নে continue স্টেটমেন্টে-এর গঠন দেখানো হলো:

continue;

if, else if, for, while ইত্যাদি'র সাথে continue স্টেটমেন্ট কাজ করে। শর্তবিহীন continue স্টেটম্যান্ট অসীম লুপের সৃষ্টি করে। এ জন্য সাধারণত if, else...if স্টেটমেন্টের সাথে সম্পর্কিত শর্ত সাপেক্ষে কোনো লুপের পুনরাবৃত্তি করার জন্য continue ব্যবহৃত হয়। সে ক্ষেত্রে শর্তের মান সত্য হলে continue স্টেটমেন্ট উপক্ষো করে পরবর্তী স্টেমেন্ট নির্বাহ করে।

```
while (condition / variable range)
{
        if (condition)
        {
                Continue;
        }
}
```

```
for (initialization of value; condition / variable range; decrement / increment)
{
        if (condition)
        {
                Continue;
        }
}
```

নিম্নে প্রবাহ চিত্রে continue স্টেটমেন্টে দেখানো হলো:

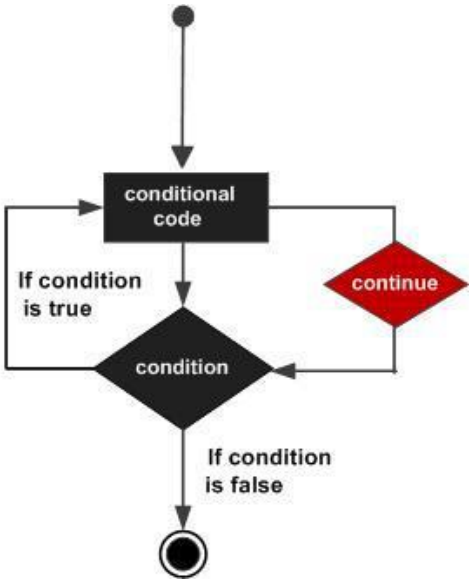

Source: www.tutorialspoint.com

অনুশীলন: continue স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত পূর্ণ সংখ্যা আউটপুট নেওয়ার প্রোগ্রামকে নিদিষ্ট সংখ্যাকে (৬) বাদ দিয়ে আউটপুট নেওয়া।

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
    int i=1;
    for (i=1; i<=10; i++)
    {
        if(i==6)
        {
          continue;
        }
       printf("\nNumber %d:",i);
       printf(" %d\n",i);
    }
getch();
}
```

```
Output:
Number 1: 1
Number 2: 2
Number 3: 3
Number 4: 4
Number 5: 5
Number 7: 7
Number 8: 8
Number 9: 9
Number 10: 10
```

নোট:এখানে `Number 6: 6` নেই।

ব্যাখ্যা:

এখানে `Number 6: 6` নেই। প্রোগ্রামটি রান করলে ১ থেকে ৫ পর্যন্ত প্রতিটি সংখ্যা প্রিন্ট হওয়ার পর ৬ সংখ্যাটি প্রিন্ট হবে না। কারন if(i==6) শর্তের অধীনে continue; স্টেটমেন্ট এর কারনে ঐ শর্ত যখন সত্য হবে তখন কম্পাইলার continue; স্টেটমেন্ট এর পরের স্টেটমেন্টগুলো নির্বাহ না করেই পুনরায় লুপ শুরু করবে। ফলে ৬ প্রিন্ট না হয়ে আবার ৭ থেকে প্রিন্ট হওয়া শুরু হয়ে ১০ এ এসে শেষ হবে।

break স্টেটমেন্ট

কোনো লুপের নির্বাহ লুপ শেষ হবার আগেই শেষ করে দেওয়া বা লুপ থেকে বের হয়ে আসার জন্য অর্থাৎ লুপের সাধারণ চলমান অবস্থা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য break স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। break স্টেটমেন্ট continue স্টেটমেন্টের বিপরীত প্রক্রিয়ায় কাজ করে। break স্টেটমেন্টের গঠন হচ্ছে:

break;

continue স্টেটমেন্টের মত break স্টেটমেন্টের জন্যও সাধারণত if, else, if, for, while ইত্যাদি স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। সি প্রোগ্রাম break স্টেটমেন্টের সাক্ষাৎ পাওয়া মাত্রই ব্রেক স্টেটমেন্ট for, while এবং do...while লুপকে তাৎক্ষনিক বন্ধ করে ফেলে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত স্টেটমেন্টগুলোতে break স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়।

```
while (condition / variable range)
{
        if (condition)
        {
                continue;
        }
}
for (initialization of value; condition / variable range; decrement / increment)
{
        if (condition)
        {
                continue;
        }
}
```

নিম্নে প্রবাহ চিত্রে break স্টেটমেন্ট দেখানো হলো:

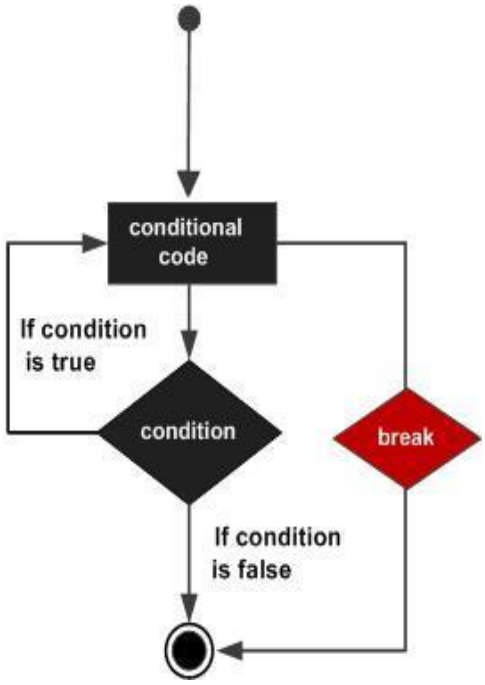

Source: www.tutorialspoint.com

অনুশীলন: break স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত পূর্ণ সংখ্যা আউটপুট নেওয়ার প্রোগ্রামকে ৮ পর্যন্ত চালিয়ে বন্ধ করে দেওয়া।

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>

int main()
{
int i=1;
   for (i=1; i<=10; i++)
   {
printf("\nNumber %d: ",i);
   printf("\ %d\n",i);
if(i==8)
{
  break;
}
    }
getch();
}
```

```
Output:
Number 1: 1
Number 2: 2
Number 3: 3
Number 4: 4
Number 5: 5
Number 6: 6
Number 7: 7
Number 8: 8
```

ব্যাখ্যা:

প্রোগ্রামটি রান করলে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যা প্রিন্ট হওয়ার কথা। কিন্তু if(i==8) শর্তের অধীনে break; স্টেটমেন্ট এর কারণে ঐ শর্ত সত্য হওয়ার কারণে ১ থেকে ৮ পর্যন্ত প্রিন্ট হওয়ার পর কম্পাইলার ঐ লুপের কাজ স্থগিত করে লুপ থেকে বের হয়ে আসবে। তাই ৯ ও ১০ আর প্রিন্ট হবে না।

goto স্টেটমেন্ট

সি প্রোগ্রামে goto স্টেটমেন্ট জাম্প স্টেটমেন্ট হিসেবে পরিচিত। প্রোগ্রামের স্বাভাবিক ধারা ভেঙ্গে এক অংশ থেকে অন্য অংশে যেতে goto স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ প্রোগ্রামের কোনো একটি অংশের কাজ বন্ধ রেখে অন্য একটি অংশে কাজ করার জন্য goto স্টেটমেন্ট কার্যকরী। এ ক্ষেত্রে শর্তযুক্ত বা শর্তহীনভাবে এক স্টেটমেন্ট থেকে উপরে বা নিচে অপর কোনো স্টেটমেন্টে গমণ করার জন্য goto স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয়। continue স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে কেবল উপরের দিকে জাম্প করা যায় কিন্তু goto ব্যবহার করে প্রোগ্রামের সামনে কিংবা পিছনে যে কোনো স্থানে জাম্প করা যায়। নেস্টেট লুপ থেকে ব্রেক নিতে চাইলেও goto স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা সুবিধাজনক।

goto স্টেটমেন্টের গঠন নিম্নরূপ:

goto label_name;

… … …

… … …

label_name:

statements

ভেরিয়েবলের ডিক্লারেশনের নিয়ম অনুসরণ করে goto স্টেটমেন্ট-এর পর লেভেল নেম দিতে হয়। এখানে লেভেল একটি আইডেন্টিফায়ার। এরপর প্রোগ্রামের প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন নামে একাধিক লেভেল স্টেটমেন্ট উপরে বা নিচে ব্যবহার করা যায়। এ সকল লেভেল নেম-এর পর কোলন (:) দিতে হয়। goto স্টেটমেন্ট if, else if, for while ইত্যাদি ছাড়াও সরাসরি কাজ করতে পারে। তবে সাধারণত goto স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে if, else if স্টেটমেন্টের সাথে সম্পর্কিত শর্ত সাপেক্ষে প্রোগ্রামের অপর কোনো স্থানে জাম্প করা যায়। সে ক্ষেত্রে শর্তের মান সত্য হলে goto স্টেটমেন্ট কার্যকরী হয়। ফলে প্রোগ্রামের নিয়ন্ত্রণ তার বর্তমান অবস্থান থেকে label_name: চিহ্নিত স্থানে জাম্প করে। অন্যথায় কম্পাইলার goto স্টেটমেন্ট উপেক্ষা করে পরবর্তী স্টেটমেন্ট সম্পাদন করে। তবে প্রোগ্রামে goto স্টেটমেন্ট-এর ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা হয়। কারণ এটি ব্যবহারের ফলে প্রোগ্রামের প্রকৃত প্রবাহ বুঝা জটিল হয়।

Goto স্টেটমেন্টের গঠন:	নিম্নে প্রবাহ চিত্রে goto স্টেটমেন্টে দেখানো হলো:
goto label_name; … … … … … … label_name: statements	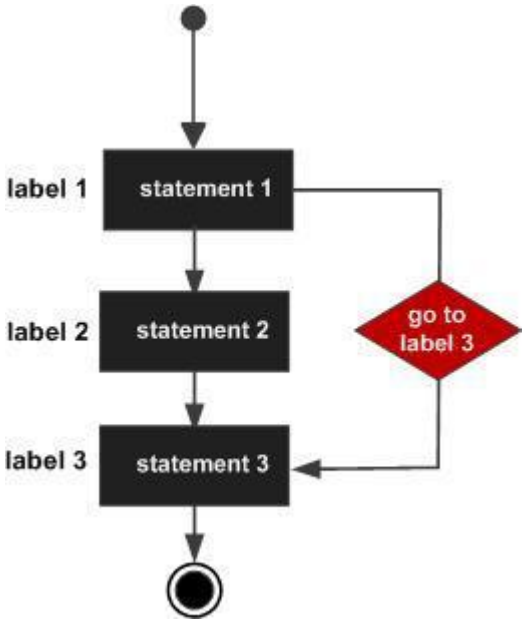 Source: www.tutorialspoint.com

অনুশীলন: goto স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে ২১ থেকে ৩০ পর্যন্ত পূর্ণ সংখ্যা আউটপুট নেওয়ার প্রোগ্রামে ২৫ কে বাদ দিয়ে বাকীগুলো প্রিন্ট নেওয়ার প্রোগ্রাম।

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main ()
{
   int x = 21;
   printf("\nvalue of \'x\' 21 to 30\n");
   printf("\======================");
   printf("\nSKIP value  \'25\'\n");
   printf("\======================");
   SKIP:do
   {
      if( x == 25)
      {
         x = x + 1;
         goto SKIP;
      }
      printf("\n%d\n", x);
      x++;
   }
   while( x<=30 );
   getch();
   return 0;
}
```

```
Output
value of 'x' 21 to 30
======================
SKIP value '25'
======================
value of x: 21
value of x: 22
value of x: 23
value of x: 24
value of x: 26
value of x: 27
value of x: 28
value of x: 29
value of x: 30
```

ব্যাখ্যা:

এখানে 25 নেই। প্রোগ্রামটি রান করলে ২১ থেকে ৩০ পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যা প্রিন্ট হওয়ার কথা। কিন্তু if(i==25) শর্তের অধীনে goto; স্টেটমেন্ট এর কারণে ঐ শর্ত সত্য হওয়ায় ২১ থেকে ২৪ পর্যন্ত প্রিন্ট হওয়ার পর কম্পাইলার ২৫ প্রিন্ট করার পরিবর্তে SKIP: চিহ্নিত লেবেল এর স্থানে জাম্প করবে এবং এর পর থেকে পুণরায় কাজ শুরু করবে।

অনুশীলন: goto স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে দু'টি সংখ্যার ল.সা.গু. নির্ণয়ের প্রোগ্রাম।

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>


main ()
{
    int a, b, L_num;
    printf("\nEnter two integers:  ");
    scanf("%d %d",&a,&b);

    L_num=(a>b)?a:b;   //Conditional ternary operator
(?)

    next:
    if((L_num%a==0)&&(L_num%b==0))
{
printf("\nLCM of %d and %d is = %d", a, b, L_num);
        }
    else
{
L_num=L_num+1;
goto next;
}
    getch();
}
```

৫.১৩ অ্যারে ও ফাংশন (Array and Function)

৫.১৩.১ অ্যারে

মনে করুন আপনি বিদ্যালয়ের গণিত বিষয়ের শিক্ষক এবং বিভিন্ন ক্লাসের ১০০০ শিক্ষার্থীর পরীক্ষার নম্বর সংরক্ষণ করতে হবে। এ জন্য যে প্রোগ্রাম রচনা করবেন তার জন্য উক্ত সংখ্যক ডাটার জন্য সম সংখ্যক ভেরিয়েবল ঘোষণা করতে হবে। এ সকল ডাটা নিয়ে আরো কাজ যথা: গড় নির্ণয়, সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন নম্বর নির্ণয় ইত্যাদি অপারেশন সম্পন্ন করতে ১০০০ ভেরিয়েবল ঘোষণা করা সত্যিই পরিশ্রমসাধ্য, সময় সাপেক্ষ ও বিরক্তিকর। Array ব্যবহার করে এ ধরণের সমজাতীয় ডাটাকে একটি বিশেষ ধরণের ভেরিয়েবলের মাধ্যমে একসঙ্গে একই টাইপের নির্দিষ্ট সংখ্যক ভ্যালু সংরক্ষণ করা যায়। এ ভাবে বিশেষ ধরণের ভেরিয়েবলের মাধ্যমে একই টাইপের নির্দিষ্ট সংখ্যক ভ্যালু সংরক্ষণ করে রাখতে চাইলে সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবলের পরিবর্তে Array ভ্যারিয়েবল তৈরি করে সহজে সংরক্ষণ করা যাবে। অর্থাৎ একটি সাধারণ ভেরিয়েবল ঘোষণা করে এর আওতায় মেমোরিতে পরপর সংরক্ষিত একই টাইপের কতগুলো ডাটার সমষ্টিকে অ্যারে বলে। অন্য কথায়, একই ডাটা টাইপের কতগুলো ভেরিয়েবলের সেটকে Array বলা হয়।

Array ডিক্লারেশনের সাধারণ সিনট্যাক্স হলো:

dataType arrayName [arraySize];

সিনট্যাক্স অনুযায়ী arrayName হিসেবে ভেরিয়েবল ঘোষণার নিয়ম অনুযায়ী একটি ভেরিয়েবলের নাম দিতে হয় এবং সে অনুযায়ী ডাটা টাইপ উল্লেখ করতে হয়। অ্যারে'র ডাটা টাইপের অধীনে অন্য টাইপের ডাটা রাখা যায় না। arrayName-এর পর তৃতীয় বন্ধনী '[ ]' এর মধ্যে পূর্ণ সংখ্যায় অ্যারে'র সাইজ উল্লেখ করতে হয়। এ সংখ্যাটিকে অ্যারে'র ইনডেক্স (Index) বলে এবং তা অ্যারে'র ভেরিয়েবলে সর্বোচ্চ কয়টি ডাটা সংরক্ষণ বরা যাবে তা নির্দেশ করে। প্রতিটি পৃথক পৃথক ভেরিয়েবলকে উপাদান (Element) বলে। যেমন:

```
char name [20];
int roll[1000];
int marks[25];
float fees[20];
```

স্টেটমেন্টগুলোর ব্যাখ্যা:

char name [20]; অর্থাৎ, name নামক ভেরিয়েবলের অধীনে character টাইপের ২০ টি ডাটা সংরক্ষণ করা যাবে।

int roll[1000]; অর্থাৎ, roll নামক ভেরিয়েবলের অধীনে integer টাইপের ১০০০ টি ডাটা সংরক্ষণ করা যাবে।

int marks[25]; অর্থাৎ, marks নামক ভেরিয়েবলের অধীনে integer টাইপের ২৫ টি ডাটা সংরক্ষণ করা যাবে।

float fees[20]; অর্থাৎ, fees নামক ভেরিয়েবলের অধীনে floating point টাইপের ২৫ টি ডাটা সংরক্ষণ করা যাবে।

অ্যারে একটি ডিরাইভড ডেটা টাইপ। সাধারণ ভেরিয়েবল ঘোষণার মত ব্যবহারের পূর্বে ডেটা টাইপসমূহ অ্যারে ভেরিয়েবল ঘোষণার প্রয়োজন হয়।

Array-এর উপাদানকে এক্সেস করার নিয়ম

ইনডেক্স (index) ব্যবহার করে Array এর উপাদানকে এক্সেস করা হয়।

ধরুন, উপরের উদাহরণে roll অ্যারেটি ডিক্লেয়ার করা হয়েছে। এখন roll এর উপাদানসমূহকে এক্সেস করার জন্য প্রথম উপাদানের ক্ষেত্রে roll [0], দ্বিতীয় উপাদানের ক্ষেত্রে roll [1] লিখতে হবে এবং এভাবে চলতে থাকবে।

← Array Size →

	roll [0]	roll [1]	roll [2]	roll [3]	roll [4]
Index →	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**

Array এর ইনডেক্সিং 1 এর পরিবর্তে 0 দিয়ে শুরু হয়। প্রদত্ত উদাহরণে array-এর প্রথম উপাদানটি হলোঃ roll [0]

Array এর সাইজ যদি n হয় তাহলে এর শেষ উপাদানকে এক্সেস করার জন্য (n-1) ইনডেক্স ব্যবহার করা হয়। উপরের উদাহরণে array এর সাইজ 5 বিধায় এর শেষ উপাদানকে roll [4] এর মাধ্যমে এক্সেস করা হয়েছে।

আবার, fees [0] এর এড্রেস 5000 দ্বারা শুরু হলে fees [1] এর এড্রেস হবে 5004 এবং fees [2] এর এড্রেস হবে 5008, কারণ ফ্লোট ভ্যারিয়েবলের সাইজ 4(চার) বাইট। তাই এই অ্যারে-এর প্রতিটি উপাদান মেমোরিতে 4(চার) বাইট করে যায়গা দখল করবে।

Array ভেরিয়েবলের উপাদানের মান নির্ধারণ

Array ভেরিয়েবলের উপাদানের মান নির্ধারণের জন্য তিনটি পদ্ধতি আছে। যথা:

১. Array ডিক্লারেশনের সময়

২. Array ডিক্লারেশনের পরে

৩. প্রোগ্রাম নির্বাহের সময়

ডিক্লারেশনের সময় Array উপাদানের মান নির্ধারণ

অ্যারে ডিক্লারেশনের সময় ভেরিয়েবলের নাম লিখে সে অনুযায়ী ডাটা টাইপ দিতে হয় এবং ভেরিয়েবলের নামের পরে তৃতীয় বন্ধনীর ভিতওে (‘ ’), ‘[ ]’ পূর্ণ সংখ্যায় উপাদানের সাইজ উল্লেখ করতে হয়। এরপর সমান চিহ্নের পর কার্লি ব্রাকেট ’ { } ’ দিয়ে প্রত্যেক অ্যারে’র উপাদানের জন্য আলাদা আলাদা মান দিতে হয় এবং মানগুলো পৃথক করার জন্য কমা ’ , ’ দিতে হয়। এর সিনটেক্স নিম্নরূপ:

dataType arrayName [N] = { value_1, value_2, value_3, … … , value_n };

উদাহরণ :

এক মাত্রিক অ্যারে-এর ক্ষেত্রে:

int c[2] = {{1, 3};

int c[3] = {1, 3, 0};

int c[5] = {1, 3, 0, -1, 5};

অনুশীলন: নিচের উদাহরণ ব্যবহার করে roll অ্যারেতে ৫টি উপাদান নিয়ে তা প্রিন্ট করে দেখানোর প্রোগ্রাম।

int roll [5] = {7, 10, 14, 14, 20};

```
#include<stdio.h>
main()
{
    int roll [] = {7, 10, 14, 15, 20};
    printf("\n%d", roll [0]);
    printf("\t%d", roll [1]);
    printf("\t%d", roll [2]);
    printf("\t%d", roll [3]);
    printf("\t%d", roll [4]);
}
```

স্টেটমেন্টে `roll []` অ্যারে এর সাইজ উল্লেখ না করার ব্যাখ্যা:

অ্যারে ডিক্লেয়ার করার সময় অ্যারে এর সাইজ উল্লেখ না করলে ঐ অ্যারেতে যে কোন সংখ্যক ডাটা রাখা রাখা যায় ।

অনুশীলন: নিচের উদাহরণ ব্যবহার করে place অ্যারেতে DHAKAশব্দটি প্রিন্ট করে দেখানোর প্রোগ্রাম।

char place [5] = { 'D', 'H', 'A', 'K', 'A',};

```
#include<stdio.h>
main()
{
    char name [] = "DHAKA";
    printf("\n%c\n", name [0]);
    printf("\n%c\n", name [1]);
    printf("\n%c\n", name [2]);
    printf("\n%c\n", name [3]);
    printf("\n%c\n", name [4]);
}
```

ডিক্লারেশনের পরে Array উপাদানের মান নির্ধারণ

অ্যারে ডিক্লারেশনের পরে ভেরিয়েবলের নাম লিখে সে অনুযায়ী ডাটা টাইপ দিয়ে ভেরিয়েবলের নামের পরে তৃতীয় বন্ধনীর ভিতরে '[ ]' পূর্ণ সংখ্যায় উপাদানের সাইজ উল্লেখ করে সেমিকোলন ' ; ' দিতে হয় । এর পর পরই অ্যারে ভেরিয়েবলের নাম দিয়ে তৃতীয় বন্ধনীর ভিতরে '[ ]' পূর্ণ সংখ্যায় অ্যারে ইনডেক্স লিখে সমান চিহ্নের পরে ডাটা টাইপ অনুযায়ী প্রত্যেক অ্যারে'র উপাদানের জন্য আলাদা আলাদা মান দিয়ে সেমিকোলন ' ; ' দিতে হয় । এর সিনটেক্স নিম্নরূপ:

dataType arrayName [N];
arrayName [0] = value_1;
arrayName [1] = value_2;
arrayName [2] = value_3;
… …… …… …… …… …
arrayName [N – 1] = value_N;

অনুশীলন: নিচের উদাহরণ ব্যবহার করে roll অ্যারেতে ৫টি উপাদান নিয়ে তা প্রিন্ট করে দেখানোর প্রোগ্রাম।

int roll [5];
roll [0] = 7;
roll [1] = 10;
roll [2] = 14;
roll [3] = 14;
roll [4] = 20;

```
#include<stdio.h>
main()
{
    int roll [5];
    roll [0] =  7;
    roll [1] = 10;
    roll [2] = 14;
    roll [3] = 15;
    roll [4] = 20;
    printf("\n%d", roll [0]);
    printf("\t%d", roll [1]);
    printf("\t%d", roll [2]);
    printf("\t%d", roll [3]);
    printf("\t%d", roll [4]);
}
```

প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় Array উপাদানের মান নির্ধারণ

প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় Array উপাদানের মান নির্ধারণ করার জন্য format Specifier **ব্যবহার করতে হয়।**

এর সিনটেক্স নিম্নরূপ:

dataType arrayName [N];

scanf ("formatSpecifier", &arrayName [0]);

scanf ("formatSpecifier", &arrayName [1]);

scanf ("formatSpecifier", &arrayName [2]);

… …… …… …… …… …

scanf ("formatSpecifier", &arrayName [N – 1]);

Array-এর প্রকারভেদ:

কোন একটি অ্যারের নির্দিষ্ট কোন উপাদান সনাক্ত করার জন্য যত সংখ্যক সাবস্ক্রিপ্ট এর প্রয়োজন হয় সেই সংখ্যাকে উক্ত অ্যারে-এর মাত্রা (Dimentional of array) বলে। মনে করি int roll[20]; অ্যারের 20 টি উপাদানের যে কোনো একটি শনাক্ত করতে হবে। এ জন্য 0 থেকে 19 এর মধ্যবর্তী কেবল একটি সংখ্যা প্রয়োজন হবে। এই অ্যারেতে একটি সাবস্ক্রিপ্ট দিয়ে অ্যারেটিকে শনাক্ত করা যায় বিধায় এটি একটি এক মাত্রিক অ্যারে। একমাত্রিক অ্যারের উপাদানগুলো টেবিলে কেবল একটি একক সারি বা কলাম আকারে উপস্থাপন করা যায়। এ জন্য মাত্রা ভেদে অ্যারেকে বিভাজন করা হয়েছে।

মাত্রা ভেদে অ্যারে প্রধানত তিন প্রকার। যথা:

১। একমাত্রিক অ্যারে (One dimentional array)

২। দ্বিমাত্রিক অ্যারে (Twoe dimentional array) ও

৩। বহুমাত্রিক অ্যারে (Multi dimentional array)

একমাত্রিক অ্যারে (One dimentional array)

যদি কোন অ্যারের ডাটাগুলোকে শুধুমাত্র একটি কলাম বা একটিমাত্র সারিতে সাজানো হয় এবং একটি মাত্র সাবস্ক্রিপ্ট দ্বারা প্রকাশিত হয় তখন তাকে একমাত্রিক অ্যারে বলা হয় । একমাত্রিক অ্যারের গঠন নিম্নরূপ:

dataType arrayName [arraySize];

একটি মাত্র কলামে সাজানো

year[0]	1
year[1]	9
year[2]	5
year[3]	2

একটি মাত্র সারিতে সাজানো

year[0]	year[1]	year[2]	year[3]
1	9	5	2

অনুশীলন: একটি একমাত্রিক অ্যারেতে ১০ টি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে প্রথম ৪টি সংখ্যার যোগফল ও গড় নির্ণেয়ের প্রোগ্রাম ।

```
#include <stdio.h>
main()
{
    int marks[10],i,j,num,sum=0;
    float average;

    for(i=0; i<10; i++)
    {
printf("\nEnter Marks %d:: ",i+1);
       scanf("\n%d",&num);
       marks[i]=num;
    }
    for(j=0; j<4; j++)
    {
        sum = sum+marks[j];
    }
    average = sum/4;
    printf("\nSum of 1st four Marks= %d\n",sum);
    printf("\nAverage of 1st four Marks= %.2f\n",average);
}
```

দ্বিমাত্রিক অ্যারে (Two dimentional array)

যদি কোন অ্যারের ডাটাগুলোকে একাধিক কলাম ও সারিতে সাজানো হয় এবং দুটি সাবস্ক্রিপ্ট দ্বারা প্রকাশিত হয় তখন তাকে দ্বিমাত্রিক অ্যারে বলা হয় । দ্বিমাত্রিক অ্যারের গঠন নিম্নরূপ:

dataType arrayName [rowSize] [columnSize];

দ্বিমাত্রিক অ্যারেকে টেবিল হিসাবে বিবেচনা করলে নিচের অ্যারেটি একটি ৩ × ৪ দ্বিমাত্রিক অ্যারের নমুনা ।

	Column 0	**Column 1**	**Column 2**	**Column 3**
Row 0	**a[0][0]**	**a[0][1]**	**a[0][2]**	**a[0][3]**
Row 1	**a[1][0]**	**a[1][1]**	**a[1][2]**	**a[1][3]**
Row 2	**a[2][0]**	**a[2][1]**	**a[2][2]**	**a[2][3]**

অনুশীলন: ইউজার ইনপুট দিয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক সারি ও কলাম বিশিষ্ট একটি দ্বিমাত্রিক অ্যারে তৈরির প্রোগ্রাম ।

```
#include <stdio.h>
#define maxRow      5
#define maxColumn   5
main()
{
    int arrayElement[maxRow][maxColumn];
    int i, j, R, C;

    printf("\nEnter number of Rows    : ");
    scanf("%d",&R);
    printf("\nEnter number of Columns : ");
    scanf("%d",&C);

    printf("\nEnter Array Elements: \n");
    for(i=0;i< R;i++)
    {
        for(j=0;j< C;j++)
        {
            printf("Entered element of [%d,%d] : ",i+1,j+1);
            scanf("%d",&arrayElement[i][j]);
        }
    }
    printf("\nIt is an %d by %d Two dimensional Array! \n", R, C);
    printf("\nThe 2 dimensional Array Elements are:\n");
    for(i=0;i< R;i++)
    {
        for(j=0;j< C;j++)
        {
            printf("%d\t",arrayElement[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

Output:

```
It is an -?- by -?- Two dimensional Array!
The 2 dimensional Array Elements are:
-?- -?- -?- -?-
-?- -?- -?- -?-
-?- -?- -?- -?-
```

বহুমাত্রিক অ্যারে (Multi dimentional array)

কোনো অ্যারেতে ডাটাগুলোকে দুই বা ততোধিক কলাম ও সারিতে সাজানো ছাড়াও আরো এক বা একাধিক মাত্রা থাকতে পারে। যেমন: একটি আয়তাকার বস্তুর আয়তন নির্ণয়ের জন্য এর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক অ্যারে ব্যবহার করা হবে। বহুমাত্রিক অ্যারের গঠন নিম্নরূপ:

dataType arrayName [size 1] [size 2] ... ... [size N];

```
#include<stdio.h>
main()
{
    int i, j, k, arr[2][3][2];
    int x=1;

    printf("Enter 12 values : ");

    for(i = 0; i < 2; ++i)
{
for (j = 0; j < 3; ++j)
{
for(k = 0; k < 2; ++k )
                {
                    scanf("%d", &arr[i][j][k]);
                }
}
}
    for(i=0;i<2;i++)
{
            for(j=0;j<3;j++)
            {
                for(k=0;k<2;k++)
                {
                arr[i][j][k] = x;
                printf("%d\t",arr[i][j][k]);
                x++;
                }
                printf("\n");
            }
            printf("\n");
}
    return 0;
}
```

নোট: ***x***-এর ইনিশিয়্যালাইজেশন 0 হলে 11 টি ইলিমেন্ট স্টোর করবে।

৫.১৩.২ ফাংশন

প্রোগ্রামিং এর ভাষায় ফাংশন হলো একটি নির্দিষ্ট ধরনের কাজ করে এমন কতগুলো ইন্সট্রাকশনের সমষ্টি। প্রকৃত অর্থে ফাংশন হলো ব্লক অব কোড (block of code) যা কোনো নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করে। যে সকল রাশির মান অন্য কোনো চল রাশির উপর নির্ভরশীল তা'ই ফাংশন। আমরা কোনো কিছু মনিটরে প্রিন্ট করে দেখাতে চাইলে সি প্রোগ্রামে printf( ) ফাংশনটি ব্যবহার করি। আবার কোনো রাশির মান ইনপুট নিতে চাইলে scanf( ) ফাংশনটি ব্যবহার করি। এখানে printf( ), scanf( ) ইত্যাদি এক একটি ফাংশন। এই ফাংশনগুলো সি প্রোগ্রামের লাইব্রেরিতে দেওয়া থাকে। কোনো প্রোগ্রামে একটি বর্গ বা বৃত্ত আঁকতে

হলে কাজটি সহজে করার জন্য বর্গ ফাংশন বা বৃত্ত ফাংশন ব্যবহার করা হয় । এ রকম কোনো নির্দিষ্ট কাজের জন্য একটি ফাংশন লিখতে হলে সে'টি সি প্রোগ্রামের লাইব্রেরি থেকে করা যায় । এখানে বড় বড় সমস্যাগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে প্রোগ্রাম ডেভেলপ করা সহজ হয় । আবার প্রোগ্রামার নিজে এ রকম ফাংশন তৈরি করে প্রোগ্রাম রচনা করতে পারেন ।

সি প্রোগ্রামে ফাংশন দুই প্রকার । যথা:

১. লাইব্রেরি ফাংশন ও ২. ইউজার ডিফাইনড ফাংশন ।

লাইব্রেরি ফাংশন

সি প্রোগ্রামের কম্পাইলারে কতগুলো বিল্ট-ইন ফাংশন আছে যেগুলোকে লাইব্রেরি ফাংশন বলে । সি প্রোগ্রামিং-এ লাইব্রেরি ফাংশন হলো পূর্ব নির্ধারিত ফাংশন বা সি এর নিজস্ব ফাংশন যা দ্বারা গাণিতিক হিসাব-নিকাশ, ইনপুট-আউটপুট প্রোসেসিং, স্ট্রিং হ্যান্ডলিং ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করা যায় ।

এগুলো তাদের নিজস্ব ফরমেট অনুযায়ী main( ) ফাংশনের ভিতরে ব্যবহার করা হয়ে থাকে । বিভিন্ন ধরণের গাণিতিক বা যৌক্তিক কাজের জন্য এ সকল লাইব্রেরি ফাংশন ব্যবহার করা হয় । printf( ), scanf( ), getchar( ), putchar( ), sqrt( ), sin( ), tan( ) ইত্যাদি এক একটি লাইব্রেরি ফাংশন ।

এই ফাংশনগুলো হেডার ফাইলে ডিফাইন্ড করা থাকে । কোনো নির্দিষ্ট কাজে লাইব্রেরি ফাংশন ব্যবহার করার জন্য উক্ত ফাংশনটির ব্যবহার বিধি ও ফরম্যাট জানা থাকতে হবে । লাইব্রেরি ফাংশনগুলোর বিস্তারিত বিবরণ হেডার ফাইলে লেখা থাকে । ঐ সব হেডার ফাইলকে যখন কোনো প্রোগ্রামে সংযুক্ত করা হয় তখন এই ফাংশনগুলোর সোর্স কোড ঐ প্রোগ্রামেই থাকার মত আচরণ করে । যেমন: printf() হলো লাইব্রেরি ফাংশন যা কম্পিউটারের মনিটরে বা স্ক্রিনে আউটপুট পাঠায় । এই ফাংশনটি "stdio.h" হেডার ফাইলে ডিফাইন্ড করা থাকে । "stdio.h" হেডার ফাইলটি Standard Input/Output function সমূহ প্রোগ্রামে ব্যবহারের জন্য দরকার পড়ে । আবার math.h হেডার ফাইলটি Mathematics function সমূহ ব্যবহারের জন্য দরকার পড়ে যা বিভিন্ন গাণিতিক কাজ সম্পাদনে ব্যবহৃত হয় । নিম্নে কয়েকটি হেডার ফাইল ও তৎ সম্পর্কিত লাইব্রেরি ফাংশনের বিবরণ প্রদত্ত হলো ।

হেডার ফাইল	লাইব্রেরি ফাংশন ও এর বিবরণ
stdio.h	printf( ) ঃ ফাংশনটি character, string, float, integer, octal and hexadecimal value আউটপুট হিসেবে স্ক্রিনে দেখানোর জন্য ব্যবহৃত হয় ।
	scanf( ) ঃ ফাংশনটি কিবোর্ড থেকে character, string, numeric data গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত হয় ।
math.h	round ( ) ঃ দশমিক ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে দশমিকের পর ৫ থেকে ৯ থাকলে পরবর্তী ডিজিটের রূপান্তর হবে ।
	sin ( ) ঃ ত্রিকোণমিতিক sin ভেল্যু ক্যালকুলেট করবে । অনুরূপ অন্যান্য ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের মান ক্যালকুলেট করা যাবে ।
	sinh ( ) ঃ ত্রিকোণমিতিক sin হাইপাপরবুলিক ভেল্যু ক্যালকুলেট করবে । অনুরূপ অন্যান্য ত্রিকোণমিতিক হাইপাপরবুলিক অনুপাতের মান ক্যালকুলেট করা যাবে ।
	sqrt ( ) ঃ বর্গমূলের মান ক্যালকুলেট করবে ।
	pow ( ) ঃ কোন নম্বরের পাওয়ার মান ক্যালকুলেট করবে ।
	log ( ) ঃ ন্যাচারেল log-এর মান ক্যালকুলেট করবে ।

ইউজার ডিফাইনড ফাংশন

সি প্রোগ্রামিং-এ ইউজার কর্তৃক ফাংশন ডিফাইনের সুযোগ আছে । এই ফাংশনগুলো ইউজার কর্তৃক ডিফাইন্ড করা হয় বলে এগুলোকে ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন বলা হয় । প্রোগ্রামের প্রয়োজন ও এর জটিলতার উপর ভিত্তি করে ইউজার নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে ইচ্ছামত ফাংশন ডিফাইন্ড করতে পারেন । ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন-এর সিনটেক্স হচ্ছে:

```
#include <stdio.h>
   return_type function_name(parameter list)
   {
    Function body;
   }
   int main()
  {
    ... .. ...
    ... .. ...
    Function call;
    ... .. ...
    ... .. ...
}
```

ফাংশনের উপাদান:

সি প্রোগ্রামিং-এ লাইব্রেরি ফাংশন বা ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশনের ৪ টি উপাদান রয়েছে। এগুলো হচ্ছেঃ

(ক) ফাংশন বর্ণনা (Function Definition)
(খ) ফাংশন কল (Function Call)
(গ) ফাংশনের প্রোটোটাইপ (Function Prototype)
(ঘ) ফাংশনের রিটার্ন টাইপ ও রিটার্ন স্টেটমেন্ট (Function's Return Type and Return Statement)।

নিচে দু'টি সংখ্যার যোগফল বের করার একটি নমুনা প্রোগ্রাম দেয়া হলো। উপাদানগুলো বোঝার জন্য প্রোগ্রামটি লক্ষ্য করি।

```
#include <stdio.h>
int addNumbers(int a, int b);          /*function prototype*/
int main()
{
    int num1,num2,sum;
    printf("Enter two numbers: ");
    scanf("%d %d",&num1,&numum2);
    sum = addNumbers(num1, n2);         /*function call*/
    printf("sum = %d",sum);
    return 0;
}
int addNumbers(int a,int b)          /*function definition*/
{                                    /* called function*/
    int result;
    result = a+b;
    return result;                   /*return statement*/
}
```

ফাংশন বর্ণনা (Function Definition)

ফাংশন বর্ণনার মাধ্যমে কোন প্রোগ্রাম কি কি এক্সিকিউট করবে তা উল্লেখ করে দিতে হয়। এটিকে ফাংশন বডিও বলে। নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য ফাংশন ডেফিনিশন কিছু কোডের ব্লক নিয়ে গঠিত হয়। ইউজার-ডিফাইন্ড ফাংশন-এর কতকগুলো স্টেটমেন্ট নিয়ে ফাংশন বডি গঠিত হয়। উদাহরণে দু'টি সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করে ফলায়ল প্রদর্শন করতে হবে। অর্থাৎ যোগফলটি'র মান ফেরত পাঠানো হবে বা রিটার্ন দেওয়া হবে। এটিই হবে ফাংশনের রিটার্ন ভ্যালু। রিটার্ন ভ্যালুর ডাটা টাইপ এবং return_type একই হতে হয়। সমগ্র বিষয়টি ফাংশন বডিতে উল্লেখ করা থাকে। ইউজার-ডিফাইন্ড ফাংশনের বর্ণনা

main() ফাংশনের উপরে কিংবা নিচে থাকে - ভেতরে থাকে না। ফাংশনকে যখন কল করা হয় তখন প্রোগ্রামের নিয়ন্ত্রণ ফাংশন ডেফিনিশনে স্থানান্তরিত হয়। কম্পাইলার ফাংশন বডিতে অবস্থিত কোডসমূহ এক্সিকিউশন করা শুরু করে।

ফাংশন বডি'র সিনটেক্স নিম্নরূপঃ

```
returnType functionName(parameter list)
{
    //ফাংশনের বডি  (Function body)
}
```

ফাংশন কল (Function Call)

কল করার মাধ্যমে প্রোগ্রামের নিয়ন্ত্রণ ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশনের কাছে স্থানান্তরিত হয়। ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন লিখার সময় এর একটি নির্দিষ্ট নাম দিতে হয়। এই ফাংশন নেম ধরেই ফাংশনটিকে প্রোগ্রামের বিভিন্ন যায়গায় কল করা হয়। ফাংশন নেম পছন্দমত দেওয়া যায়। তবে বোধগম্যভাবে দিলে তা সহজে পড়ে বোঝা যায়। যেমন: দু'টি সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করার ফাংশনটির নাম আমরা addNumbers () বা sum () দিতে পারি আবার abcd() দিতে পারি।

ফাংশন কলের সিনটেক্স নিম্নরূপঃ

```
functionName(argument1, argument2, ...);
```

উপরের উদাহরণে `main()` ফাংশনের মধ্য থেকে `addNumbers(num1, num2);` স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে ফাংশনকে কল করা হয়েছে।

ফাংশনের প্রোটোটাইপ (Function Prototype)

একটি ফাংশনের প্রোটোটাইপ হচ্ছে কেবল একটি ফাংশনের ঘোষণা যা ফাংশনের নাম, প্যারামিটার এবং রিটার্ন টাইপ নির্দিষ্ট করে; কিন্তু এর কোন ফাংশন বড়ি থাকে না। ফাংশনের প্রোটোটাইপ কম্পাইলারকে প্রোগ্রামে ফাংশনটির পরবর্তী ব্যবহার সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে।

ফাংশনের প্রোটোটাইপের সিনটেক্স নিম্নরূপঃ

```
returnType functionName(type1 argument1, type2 argument2,...);
```

প্রদত্ত উদাহরণে `int addNumbers(int a, int b);` ফাংশনের প্রোটোটাইপ যা কম্পাইলারকে ফাংশনটির পরবর্তী ব্যবহার সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্য প্রদান করেঃ

- ফাংশনের নাম হচ্ছে: `addNumbers( )`
- ফাংশনের রিটার্ন টাইপ হচ্ছে: ইন্টিজার (`int`)
- প্যারামিটার হচ্ছে: ইন্টিজার টাইপের (`int`) দু'টি আগুমেন্ট ফাংশনে পাস (passed) করা হচ্ছে।

তবে, মনে রাখতে হবে যে ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশনকে মেইন ফাংশনের (`main()`) পূর্বে ডিফাইন করা হলে ফাংশনের প্রোটোটাইপ ঘোষণার প্রয়োজন হয় না।

ফাংশনের রিটার্ন টাইপ ও রিটার্ন স্টেটমেন্ট (Function's Return Type and Return Statement)

রিটার্ন টাইপ হলো ফাংশন কি ধরনের ভ্যালু ফেরত দিবে তা উল্লেখ করা অর্থাৎ ডাটা টাইপ। এটি সি প্রোগ্রামে ডিফাইন করা যে কোনো ডাটা টাইপ হতে পারে। তবে, সব ফাংশন ভ্যালু রিটার্ন করে না। যদি কোনো ফাংশন কোনো ভ্যালু রিটার্ন না করে তাহলে তার রিটার্ন টাইপ void হবে। return স্টেটমেন্ট ফাংশন এক্সিকিউশের সমাপ্তি ঘটায় এবং কল করা ফাংশনের কাছে ভ্যালু ফেরত পাঠায়। রিটার্ন স্টেটমেন্টের পরে প্রোগ্রামের কন্ট্রোল কলিং (calling) ফাংশনের কাছে স্থানান্তরিত হয়।

ফাংশনের মধ্য দিয়ে আর্গুমেন্ট অতিক্রম করানো

প্রোগ্রামিং এ আর্গুমেন্ট দ্বারা ভ্যারিয়েবলকে বুঝায় যা ফাংশনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। পূর্ববর্তী উদাহরণে ফাংশন কলের সময় num1 এবং num2 ভ্যারিয়েবল দুটি ফাংশনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে।

ফাংশন ডেফিনিশনের প্যারামিটার a এবং b অতিক্রান্ত আর্গুমেন্ট দু'টি গ্রহণ করে। এই আর্গুমেন্ট সমূহকে ফাংশনের ফরমাল (formal) প্যারামিটারও বলা হয়।

```
#include <stdio.h>
int addNumbers(int a, int b);
int main()
{
    … … … … … … … …… … … … … … …
    … … … … … … … …… … … … … … …
    sum = addNumbers(num1, n2);
    … … … … … … … …… … … … … … …
    … … … … … … … …… … … … … … …
}
int addNumbers(int a,int b)
{
```

ফাংশনের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত আর্গুমেন্ট এবং ফরমাল প্যারামিটারকে অবশ্যই এক হতে হবে নতুবা কম্পাইলার এরর (error) নিক্ষেপ করবে।

যদি num1 ইন্টেজার টাইপের হয় তাহলে a কে অবশ্যই ইন্টেজার টাইপের হতে হবে। যদি num2 ডাবল টাইপের হয় তাহলে b ভ্যারিয়েবলকে অবশ্যই ফড়ঁনষব টাইপের হতে হবে। ফাংশনের মধ্য দিয়ে আর্গুমেন্ট অতিক্রম করানো ছাড়াও ফাংশনকে কল করা যায়।

Return স্টেটমেন্ট

return স্টেটমেন্ট ফাংশন এক্সিকিউশের সমাপ্তি ঘটায় এবং কল করা ফাংশনের কাছে ভ্যালু ফেরত পাঠায়। রিটার্ন স্টেটমেন্টের পরে প্রোগ্রামের কন্ট্রোল কলিং (calling) ফাংশনের কাছে স্থানান্তরিত হয়।

উপরের উদাহরণে result ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু main() ফাংশনের multiplication ভ্যারিয়েবলের এর কাছে ফেরত পাঠায়।

```
#include <stdio.h>
int addNumbers(int a, int b);
int main()
{
    … … … … … … … …… … … … … … …
    … … … … … … … …… … … … … … …
    sum = addNumbers(num1, n2);
    … … … … … … … …… … … … … … …
    … … … … … … … …… … … … … … …
}
int addNumbers(int a,int b)
{
    … … … … … … … …… … … … … … …
    … … … … … … … …… … … … … … …
return result;
}
```

result = a+b

ফাংশন থেকে রিটার্নকৃত ভ্যালুর টাইপ এবং ফাংশন প্রোটোটাইপ ও ফাংশন ডেফিনিশনের রিটার্ন টাইপ অবশ্যই একই হতে হবে।

রিটার্ন স্টেটমেন্টের সিনট্যাক্স

```
return (expression);
```

নিচে অনুশীলনের জন্য আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করার একটি নমুনা প্রোগ্রাম প্রদত্ত হলো ।

```
#include<stdio.h>
int area_rect(int length, int width)
{
int area;
area = length*width;
return area;
}
int main(void)
{
int length, width, area;
printf("\nEnter length & width of rectangle= \n");
scanf("%d", &length);
scanf("%d", &width);
area = area_rect(length, width);
printf("\nArea of rectangle = %d",area);
return 0;
}
```

প্রশ্নাবলি

- প্রোগ্রামিং ভাষা কত প্রকার ও কি কি?
- এসেম্বলি ভাষার সুবিধা কী?
- জাভা কেন এত জনপ্রিয়?
- সি+ কে সি ভাষার সুপারসেট বলা হয় কেন?
- অনুবাদক প্রোগ্রাম কী?
- অনুবাদক প্রোগ্রাম কত প্রকার ও কি কি?
- অ্যাসেম্বলার কখন ব্যবহার করতে হয়?
- কোডিং কাকে বলে?
- এলগরিদম কাকে বলে?
- ফ্লোচার্ট কীভাবে লিখতে হয়?
- অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামের দুটি উদাহরণ দিন ।

চিন্তামূলক প্রশ্ন

- মেশিন ভাষা ও অ্যাসেম্বলি ভাষার পার্থক্য বর্ণনা করুন ।
- প্রোগ্রাম রচনার জন্য মেশিন ভাষার চেয়ে অ্যাসেম্বলি ভাষা কেন সুবিধাজনক- ব্যাখ্যা করুন ।
- উচ্চতর ভাষায় প্রোগ্রাম রচনা কেন সুবিধাজনক-ব্যাখ্যা করুন ।
- কম্পাইলার ও ইন্টারপ্রিটার এর পার্থক্য বর্ণনা করুন ।
- অনুবাদক প্রোগ্রাম হিসেবে ইন্টারপ্রিটার ও কম্পাইলার ব্যবহারের তুলনামূলক আলোচনা করুন ।
- প্রোগ্রাম তৈরির ধাপগুলো বর্ণনা করুন ।
- এলগরিদম ও ফ্লোচার্টের পার্থক্য বর্ণনা করুন ।
- তিনটি সংখ্যার যোগ ও গড় নির্ণয়ের এলগরিদম ও ফ্লোচার্ট অংকন করুন ।
- ১+২+৩+... ... ... +n ধারাটির এলগারিদম ও ফ্লোচার্ট অংকন করুন ।

- বর্তমানে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম কেন এত জনপ্রিয়- ব্যাখ্যা করুন।
- চক্রাবর্ত বা লুপ মডেলের সুবিধা ব্যাখ্যা করুন।
- সি প্রোগ্রামের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন।
- ৩টি সংখ্যার যোগফল এবং গড় নির্ণয়ের জন্য সি ভাষায় একটি প্রোগ্রাম রচনা করুন।
- প্রত্যেক প্রকার লুপ স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে সি ভাষায় একটি করে প্রোগ্রাম রচনা করুন।
- প্রত্যেক প্রকার অ্যারে ব্যবহার করে সি ভাষায় একটি করে প্রোগ্রাম রচনা করুন।

তথ্যসূত্র

আসাদুজ্জামান, এ জেড এম., রানা, মোঃ মাসুদ., ইসলাম, মোহাম্মদ আরিফুল. (২০১৭). *তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি.* অক্ষরপত্র: ঢাকা।

ইসলাম, মোহাম্মদ আনিসুল. (২০১৬). *তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি.* হাসান বুক হাউস: ঢাকা।

নিটন, মোঃ কামরুজ্জামান. (২০১২). *সবার জন্য সি প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ.* জ্ঞানকোষ প্রকাশনী: ঢাকা।

হোসেন, মোহাম্মদ মোক্তার. (২০১২). *সি প্রোগ্রামিং. সিস্টেক.* পাবলিকেশন্স: ঢাকা।

রহমান, মুজিবুর. (২০১৪). *তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি.* ভয়েজার পাবলিকেশন্স: ঢাকা।

Deitel, H. M., Deitel, P. J. (2006). *C: How to program.* New Delhi: Prentice-Hall of India Private Limited.

Learn C Programming. Retreived November 12, 2017, from www.tutorialspoint.com.

Burgess, Mark. (1999). *C Programming Tutorial*. Faculty of Engineering, Oslo College. Retreived November 12, 2017, from http://markburgess.org/CTutorial/C-Tut-4.02.pdf.

C Programming. Retreived February 18, 2018, from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/C_Programming.pdf.

Horton, I. (2004). *Beginning C* (Third Edition ed.). CA: Apress.

Kamthane, A. N. (2010). *C Programming: Test Your Skills.* Delhi: Dorling Kindersley (India) Pvt. Ltd., Licensees of Pearson Education in South Asia.

Schildt, Herbert. (1997). *Teach yourself C.* CA: McGraw-Hill.

ইউনিট ৬ : ইন্টারনেট ও এর ব্যবহার

আলোচিত বিষয়বস্তুসমূহ:

৬.১ ইন্টারনেট পরিচিতি, শিক্ষায় ইন্টারনেটের ব্যবহার

৬.২ শিক্ষা ও দৈনন্দিন জীবনে ইন্টারনেটের ব্যবহার

ইউনিট ৬

ইন্টারনেট ও এর ব্যবহার

বৈশ্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থা এখন অনেক উন্নত হয়ে গেছে আর এই সবই কৃতিত্ব তার, যার নাম হলো ইন্টারনেট। গত ২০ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে মোটামুটি ২১০টি আলাদা দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে এর বিস্তার। এমনকি পৃথিবীর অনেক দরিদ্রতর দেশও সংযুক্ত হয়ে পড়েছে এই জালে।

বেশিরভাগ মানুষই মনে করেন যে, ইন্টারনেট শব্দটির মানে হচ্ছে অনলাইনে চলে যাওয়া। কিন্তু সত্য কথা বলতে এটি একটি সাধারণ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ছাড়া আর কিছুই নয়। মনে করুন একটি রাস্তার কথা যা পুরো পৃথিবী জুড়ে পেঁচিয়ে রয়েছে। যেমন করে রাস্তা দিয়ে ট্র্যাফিক বয়ে গিয়ে তার গন্তব্যে পৌঁছে। ঠিক তেমনি বিভিন্ন কম্পিউটার দিয়ে ডাটা বয়ে গিয়ে তার গন্তব্যে পৌঁছে। আর এটাই হলো ইন্টারনেট এর মূল ভিত্তি। ইন্টারনেট হলো আসলে এক একটি আলাদা কম্পিউটারের একসাথে সংযুক্ত হয়ে থাকার একটি সিস্টেম (আপনার ঘরের কম্পিউটার, অফিসের কম্পিউটার, স্কুল-কলেজের কম্পিউটার)।

একটি কম্পিউটারের সাথে আরেকটি কম্পিউটারের সংযোগ করা থাকে বিভিন্ন উপায়ে। কোনো কম্পিউটার সংযুক্ত থাকে পুরাতন কপার ক্যাবল দ্বারা; আবার কোনোগুলো ফাইবার-অপটিক ক্যাবল (যা আলোর স্পন্দনের মধ্যে ডাটা সেন্ড করে) দ্বারা। আবার কোনো কম্পিউটার বেতার কানেকশানে যুক্ত থাকে (বেতার কানেকশান মানে আমরা যাকে ওয়্যারলেস বুঝি, এটি রেডিও তরঙ্গের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করে) এবং কোনো কম্পিউটার স্যাটেলাইটের সাথে সংযুক্ত থাকে। আর এইভাবেই আমরা উপভোগ করতে পারি ইন্সট্যান্ট ম্যাসেজ সুবিধা, ইমেইল সেবা, অথবা ডাউনলোড করি এমপিথ্রি মিউজিক ফাইলস। বর্তমান সময়ে শিক্ষায় ইন্টারনেটের ব্যবহার বিশেষ গুরুত্ব নিয়ে বিবেচনা করা হয়। এই অধ্যায়ে শিক্ষায় ইন্টারনেটের ব্যবহারের কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হলো।

৬.১ ইন্টারনেট পরিচিতি, শিক্ষায় ইন্টারনেটের ব্যবহার

ওয়েবে কোন কিছু অনুসন্ধান করার জন্য সার্স ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়। সার্চ ইঞ্জিন হল এক ধরণের সফটওয়্যার সিস্টেম যা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবে-এর অন্তর্ভুক্ত সাইটগুলো থেকে তথ্য খুঁজে বের করতে সাহায্য করে। কোন ঠিকানা না জেনেই সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে অনেক সহজে প্রয়োজনীয় তথ্য বা ওয়েবসাইট খুঁজে পাওয়া যায়। এ কারণে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী এবং ওয়েব ডেভেলপারদের কাছে সমভাবে সার্চ ইঞ্জিনের গুরুত্ব অপরিসীম। এ রকম কতগুলো সার্স ইঞ্জিন হলোঃ Google, Yahoo, Bing ইত্যাদি কোনো কিছু সার্স করলে সার্স রেজাল্ট হিসেবে ৩ টি অংশ দেখাবে: প্রথমে বিষয়বস্তুর Title, এর নিচে ওয়েব সাইটটির Link ও শেষে বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু বর্ণনা Text আকারে থাকে।

৬.১.১ Google-এ যে কোনো তথ্য খোঁজার কৌশল

১. তথ্য খোঁজার জন্য Desktop environment-এ কোনো ব্রাউজার যেমন- Internet Explorer, Mozila Firefox, Google Chrome ইত্যাদি সিলেক্ট করুন। একটি ওয়েব ব্রাউজারের সাহায্যে যে কোনো ওয়েব সাইটে যাওয়া যায়।

২. Internet Explorer-এর উপর ডাবল ক্লিক করুন। এর পর Address Bar-এ (www.google.com) টাইপ করে Enter key প্রেস করুন।

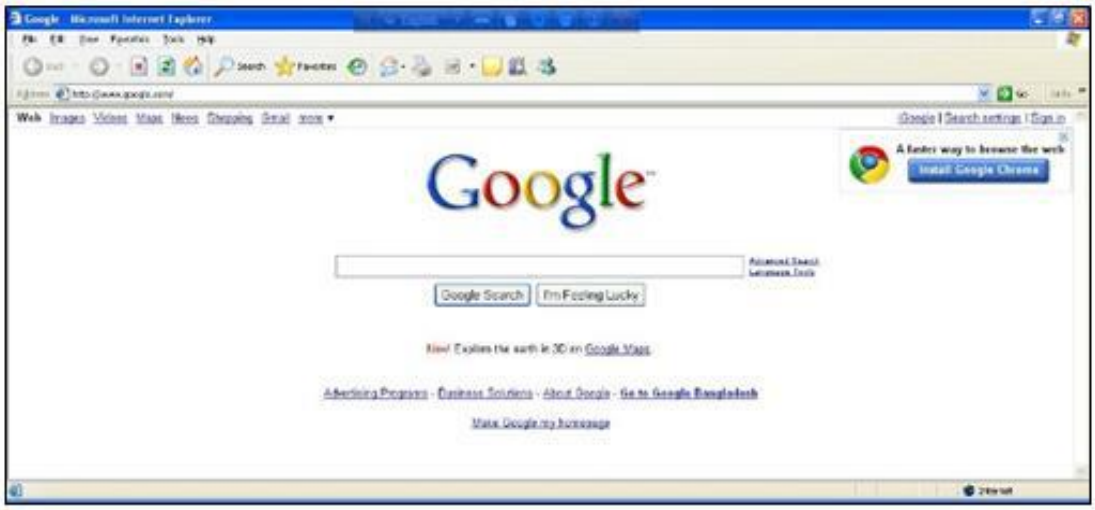

৩. একটু পরে Google-এর ওয়েব পেজটি দৃশ্যমান হবে। এটি (Google) একটি Search Engine যার সাহায্যে কোনো তথ্য সহজে খুঁজে বের করা যায়।

৪. Search করার জন্য Search Box-এ যে কোনো বিষয়, যেমন-Cell টাইপ করে Search লেখা বাটনে মাউস পয়েন্টার দিয়ে ক্লিক করুন। একটু পরে Link সহ অনেকগুলো ওয়েব সাইটের Address চলে আসবে। এগুলোর যে কোনোটির উপরে মাউস পয়েন্টার দিয়ে ক্লিক করলে কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের তথ্য পাওয়া যাবে।

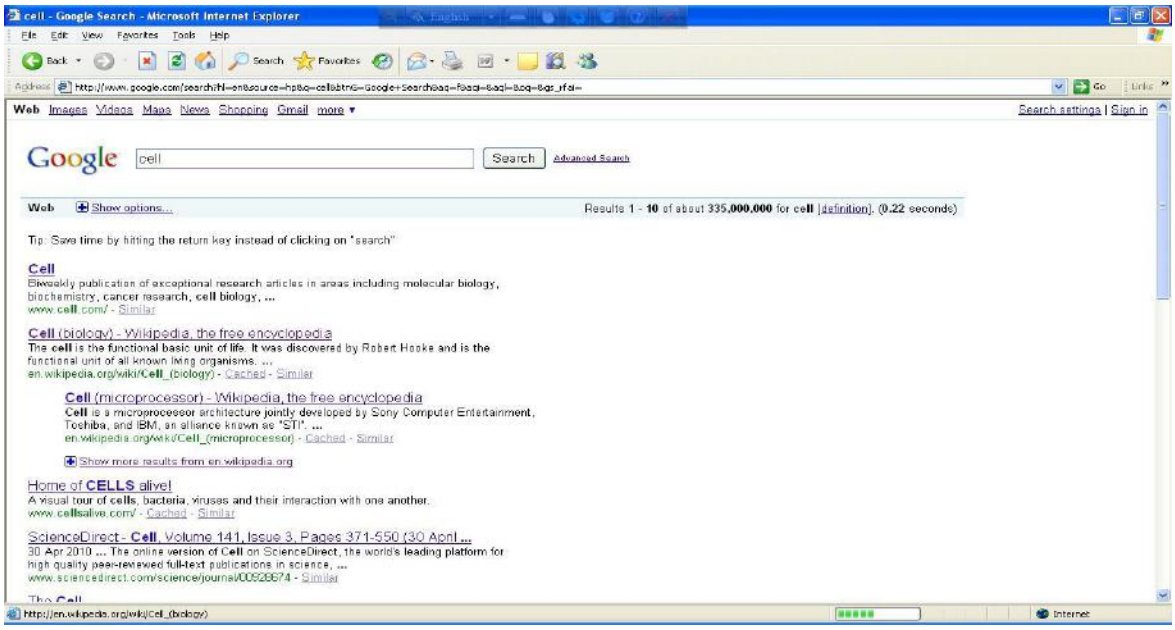

৫. সার্স ইঞ্জিনে আইটেম বা ক্যাটাগরি অনুযায়ী সার্স করার সুযোগ আছে। সার্স বক্সে সার্সের বিষয়বস্তু লিখে সার্স করার পর যে ক্যাটাগরির কন্টেন্ট দেখতে চাই সে ক্যাটাগরির ট্যাবে গিয়ে নির্দিষ্ট কন্টেন্ট দেখা যায়। যেমনঃ 'কোষ বিভাজন'-এর ছবি দেখার জন্য 'ইমেজ' ট্যাব নির্দিষ্ট করতে হবে। কিন্তু এ সম্পর্কিত ভিডিও দেখার জন্য 'ভিডিও' ট্যাবে যেতে হবে।

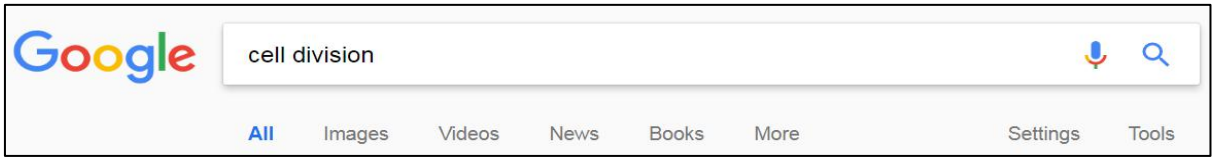

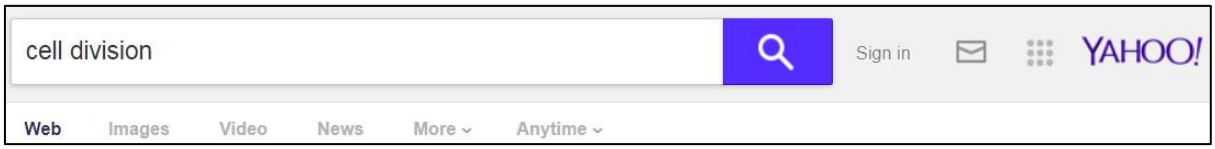

৬. সার্সের বিষয়বস্তু খোঁজার জন্য Keywords Thesauri, Subject Headings, Phrase Lists ইত্যাদি লিখে সার্স করা হয়। তবে একাধিক শব্দ বা Phrase লিখার ক্ষেত্রে কোটেশন (“ ”) ব্যবহার করলে সার্স সুনির্দিষ্ট হয়। নিম্নে সুনির্দিষ্ট অনুসন্ধানের জন্য কতিপয় সার্স কৌশল উল্লেখ করা হলোঃ

- একেবারে সঠিক শব্দ সংক্রান্ত বিষয়বস্তু খোঁজার জন্য “ + ” অপারেটর ব্যবহার করা হয়। যেমনঃ সাইট সার্স করার জন্য +Mitosis লিখে সার্স দিলে শুধু মাইটোসিস সংক্রান্ত বিষয়বস্তু সার্স রেজাল্টে দেখাবে।
- “ + ” অপারেটর "THE", "A", "OF", "OR", "AND"-এর বিকল্প হিসেবেও ব্যবহার করা হয়।
- কোন টার্ম বাদ দিয়ে অনুসন্ধানের জন্য “ - ” অপারেটর ব্যবহার করা হয়।
- কোন টাইটেল সার্স করার জন্য intitle: এর পর অনুসন্ধানের টাইটেল লিখে সার্স করা হয়। যেমনঃ intitle: "official website UNICEF"সার্স করলে ইউনিসেফের অফিসিয়্যাল ওয়েব সাইট প্রথমেই দেখাবে।
- সমজাতীয় বা পরস্পর সম্পর্কিত কোন বিষয়বস্তু খোঁজার জন্য related: লিখে সম্পর্কিত কি-ওয়ার্ড দিয়ে সার্স করলে বিষয়বস্তুটির কাছাকাছি রেজাল্ট দেখাবে।
- সার্স ওয়ার্ডের পরে ‘ = ’ চিহ্ন দিয়ে সার্সকে সুনির্দিষ্ট করা যায়। যেমনঃ Flag লিখে সার্স দিলে বিভিন্ন রঙের পতাকার ছবি দেখাবে। শব্দটির পরে ‘ = ’ চিহ্ন দিয়ে Red & Green লিখে সার্স দিলে শুধু লাল ও সবুজ রঙের পতাকার ছবি দেখাবে।
- নির্দিষ্ট তারিখের আগে বা পরে কোন পরিমার্জিত (Modified) ডকুমেন্ট দেখার জন্য বিষয়বস্তুর পরে before/after: লিখে YYYY/MM/DD format-এ তারিখ দিতে হয়। যেমনঃ Mitosis before/after: 2016/01/01. এ কৌশল ব্যবহার করে যে কোন সময়ের আপডেটেড বা ক্লাসিক্যাল বিষয়বস্তু খোঁজার সুযোগ আছে।
- কোন সোস্যাল মিডিয়ার সাইট সার্স করতে হলে নির্দিষ্ট শব্দের আগে @ ব্যবহার করে সার্স করলে (যেমনঃ @facebook) লিখে অনুসন্ধান সুনির্দিষ্ট হয়।
- কোন কিছুর মূল্য জানার জন্য বস্তু বা আইটেম শব্দটির আগে ডলার চিহ্ন (“$”) ব্যবহার করতে হবে। যেমনঃ $ hp laptop.

Boolean logic-এর ব্যবহার:

ওয়েব সার্সে AND, OR, NOT ইত্যাদি Boolean Logic ব্যবহার করা হয়। কোন নির্দিষ্ট শব্দ বা একাধিক শব্দ বা Phrase-কে কোটেশন (“ ”) মার্কের ভিতরে লিখে এর মধ্যে Boolean Logic ব্যবহার করলে সার্স অনেক সুনির্দিষ্ট হয়।

- “Cell division” AND “Mitosis” লিখে সার্স করলে কোষ বিভাজনের অন্যান্য বিষয়বস্তুর পরিবর্তে শুধুমাত্র “Cell division” ও “Mitosis” শব্দ দু’টি আছে এমন ‘মাইটোসিস কোষ বিভাজন’ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়বস্তু ফিল্টার করে প্রদর্শন করবে।
- “Cell division” OR “Mitosis” লিখে সার্স করলে “Cell division” ও “Mitosis” শব্দ দু’টির যে কোনটির একটি আছে এমন ‘মাইটোসিস কোষ বিভাজন’ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়বস্তু প্রদর্শন করবে। অর্থাৎ সার্সের বিষয়বস্তু বর্ধিত হবে কিন্তু সুনির্দিষ্ট থাকবে।

- "Cell division" NOT "Mitosis" লিখে সার্স করলে কোষ বিভাজনের অন্যান্য বিষয়বস্তুর পরিবর্তে শুধুমাত্র "Cell division"ও "Mitosis" শব্দ দু'টির কোন একটি না থাকলে তা বাদ দিয়ে অর্থাৎ ফিল্টার করে সার্স রেজাল্ট প্রদর্শন করবে। এ ধরণের সার্স বিষয়বস্তুকে অনেক বেশী সুনির্দিষ্ট করে সময় ও শ্রম বাঁচায়।

Proximity বা নৈকট্য-এর ব্যবহার:

ওয়েব সার্সে W, SAME, NEAR ইত্যাদি Proximity অপারেটর ব্যবহার করে সার্স আইটেমকে সুনির্দিষ্ট করা যায়।

- একেবারে সুনির্দিষ্ট অনুসন্ধানের জন্য সার্স ওয়ার্ড বা Phrase-এর মাঝে W-এর পর বিভিন্ন Connector লিখে সার্স দিতে হয়। W-এর পর /s Connector ব্যবহার করলে একই বাক্যে, /para Connector ব্যবহার করলে একই প্যারায়, /word Connector ব্যবহার করলে নির্দিষ্ট শব্দ (যেমন: "Camera" w/Canon "price") সুনির্দিষ্ট হয়।
- "Cell division" SAME "Mitosis" লিখে সার্স করলে ডাটাবেজের কোন আর্টিকেলের একই বাক্যে "Cell division" এবং "Mitosis" শব্দ দু'টি আছে এমন আর্টিকেল অনুসন্ধান করবে।
- NEAR Proximity অপারেটর বা /N অপারেটর ব্যবহার করে সার্স করলে ডাটাবেজের "Mitosis" সংক্রান্ত আর্টিকেল থেকে "Cell division" এর বিষয়বস্তু অনুসন্ধান করবে।

Truncation বা ছাঁটাই ও Wildcards ব্যবহার করে সার্স কৌশল

Truncation হচ্ছে ডাটাবেসে ব্যবহৃত একটি অনুসন্ধান কৌশল যা একটি শব্দের শেষে একটি প্রতীক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। এ কৌশলে ওয়েব সার্সের জন্য Asterisk (*), Question mark (?), Pound/Hatch symbol (#), Dollar sign ($) ব্যবহার করা হয়। আর, Wildcards হচ্ছে ডাটাবেস অনুসন্ধানে ব্যবহৃত প্রতীক যা একটি শব্দ বা শব্দের মধ্যে একটি অক্ষরকে প্রতিনিধিত্ব করে। তবে বিভিন্ন ডাটাবেজ বিভিন্ন প্রতীক ব্যবহার করে থাকে। সে জন্য নির্দিষ্ট ডাটাবেজের 'Help', 'Search Tips' ইত্যাদির সাহায্য নেয়া যেতে পারে। উভয় কৌশলই কিছু পৃথক কৌশল ব্যতীত প্রায় সমার্থক।

নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে কন্টেন্ট খোঁজা

কোনো একটি নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে নির্দিষ্ট শব্দ বা উক্ত শব্দের কন্টেন্ট খুঁজতে প্রথমে যে শব্দটি খোঁজতে চাই সেটি লিখে তারপর site:লিখতে হয়। অত:পর যে সাইট থেকে খোঁজতে চাই সে সাইটের নাম দিতে হয়। যেমনঃ Mitosis site: www.sciencedirect.com লিখে সার্স দিলে sciencedirect সাইট থেকে মাইটোসিস সংক্রান্ত বিষয়বস্তু দেখাবে।

নির্দিষ্ট ফরমেটের ফাইল খোঁজা

কোনো নির্দিষ্ট ফরমেটের ফাইল খোঁজার জন্য নির্দিষ্ট শব্দের শেষে উক্ত ধরণের ফাইলের এক্সটেনশন (Extension) লিখতে হয়। যেমনঃ Mitosis সংক্রান্ত পাওয়ার পয়েন্টের ফাইলের জন্য Mitosis pdf লিখলে সহজে এ সক্রান্ত ফাইলসমূহ পাওয়া যাবে।

নির্দিষ্ট শব্দের অর্থ খোঁজা

কোন শব্দের অর্থ খোঁজার জন্য সার্স বারে শব্দটি লিখে এর অর্থ বা প্রতিশব্দ দেখা যাবে। গুগল ট্রান্সলেটর, মাইক্রোসফট ট্রান্সলেটর বা অনুরূপ ট্রান্সলেটর সাইট ব্যবহার করেও শব্দের অর্থ জানা যাবে। কোনো বাক্যের অনুবাদ করার জন্যও এর ব্যবহার করা যাবে। আবার কোনো শব্দের আগে Define যোগ করেও এর অর্থ জানা যাবে। যেমনঃ Define Mitosisলিখে সার্স দিলে Mitosis সংক্রান্ত তথ্য প্রদর্শিত হবে।

৬.১.২ Google-এ যে কোনো ছবি খোঁজার কৌশল

১. Google-এর ওয়েবপেজটি স্ক্রিনে আসলে ছবি খোঁজার জন্য পেজের উপরের দিকে বাম কোনায় Images লেখার উপরে মাউস দিয়ে ক্লিক করুন বা এন্টার দিন। এর পর Search Box-এ Cell টাইপ করে Search Images লেখা বাটনে মাউস পয়েন্টার দিয়ে ক্লিক করুন। একটু পরে Link সহ অনেকগুলো ছবি চলে আসবে। এগুলোর যে কোনোটির উপরে মাউস পয়েন্টার দিয়ে ক্লিক করলেই কাঙ্ক্ষিত ছবিটি পাওয়া যাবে।

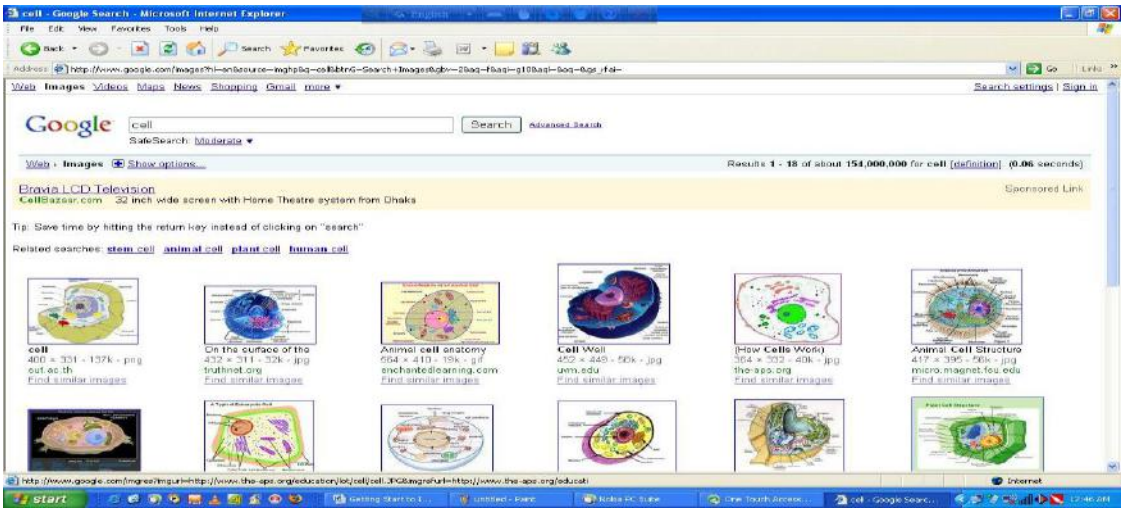

২. অনেক সময় কোনো একটি বিষয়বস্তুর জন্য নির্দিষ্ট ছবি পেতে সমস্যা হয়। এক্ষেত্রে কী-ওয়ার্ড যত বেশি নির্দিষ্ট করা হয় কাঙ্খিত ছবি পাওয়ার সম্ভাবনা ততো বেশি বেড়ে যায়। যেমন, দুষণের কোনো ছবি পেতে চাইলে Search Box-এ Pollution টাইপ করলে বিভিন্ন রকমের দুষণের ছবি আসবে।

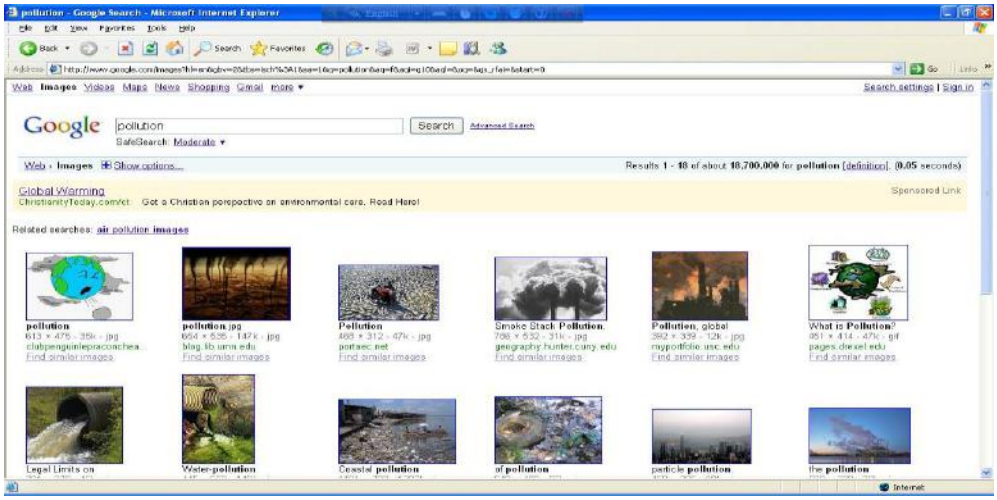

৩. কিন্তু শুধু পানি দুষণের কোনো ছবি পেতে চাইলে Search Box-এ Water Pollution টাইপ করে দিলে পানি দুষণের বিভিন্ন ছবি আসবে।

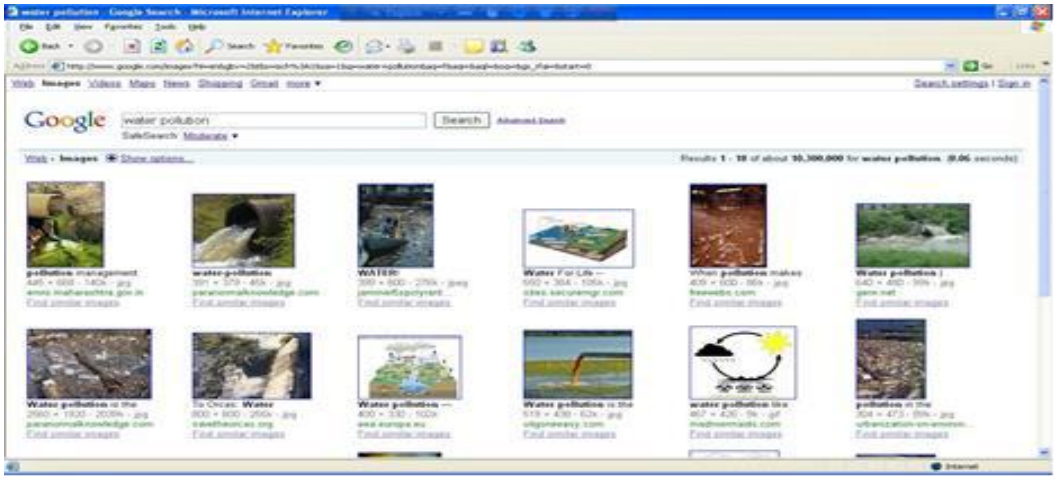

৬.১.৩ বাংলায় সার্চ করার কৌশল

১. Search Box-এ বাংলায় (ইউনিকোডে) কোনো শব্দ লিখে সার্চ করলেও বাংলায় লেখা বিভিন্ন ধরনের তথ্য বা ছবি পাওয়া যাবে। যেমন: 'পরিবেশ দুষণ' বাংলায় লিখে সার্চ করলে ছবি বা তথ্য পাওয়া যাবে।

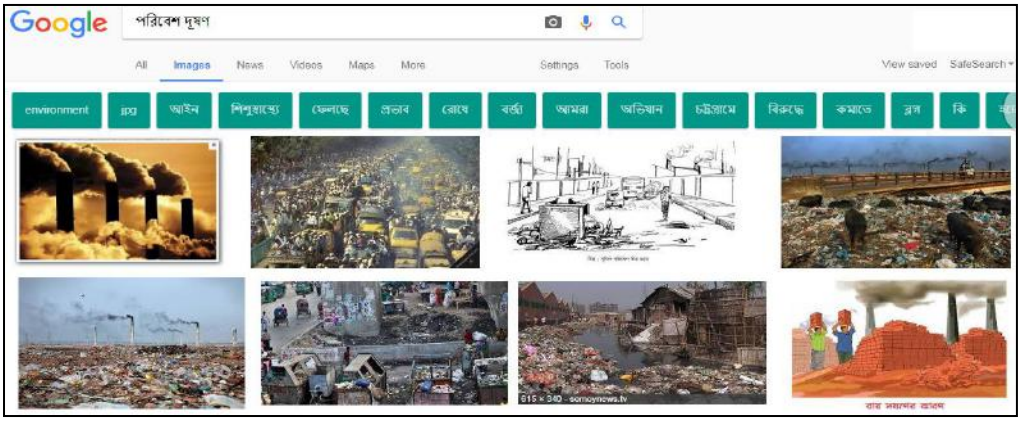

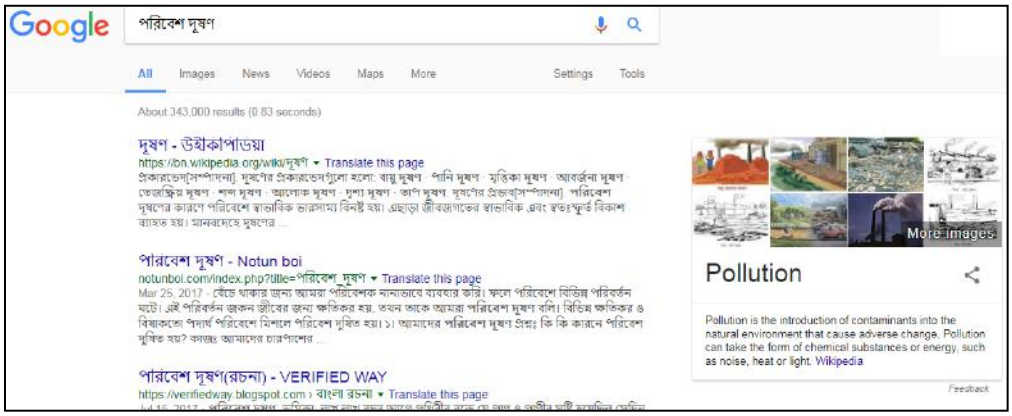

২. যে কোন ছবি বা তথ্য খোঁজার সময় যদি 'বাংলাদেশ' সাথে লিখে দেওয়া হয় তাহলে বাংলাদেশের ছবি বা তথ্য পাওয়া যাবে।

৬.১.৪ ছবি কম্পিউটারে Save করা:

১. নির্দিষ্ট ছবি নির্বাচন করার পর সেটির উপর ক্লিক করলে অন্য একটি পেজে ছবিটি বড় আকারে চলে আসতে পারে। না আসলে ছোট আকারের ছবিটির উপরে অথবা See full size image লেখার উপরে ক্লিক করলে ছবি বড় হবে।

২. এরপর ছবিটি বড় আকারে চলে আসলে কম্পিউটারে Save করার জন্য মাউসের ডান দিকের বাটনে ক্লিক করুন। কিছু অপশন দেখতে পাবেন। এখান থেকে Save picture as বা Save image as-এ ক্লিক করে ছবি সেভ করা যায়।

৩. ক্লিক করার পর নির্দিষ্ট স্থানে Save করার জন্য Location/Drive নির্বাচন করুন।

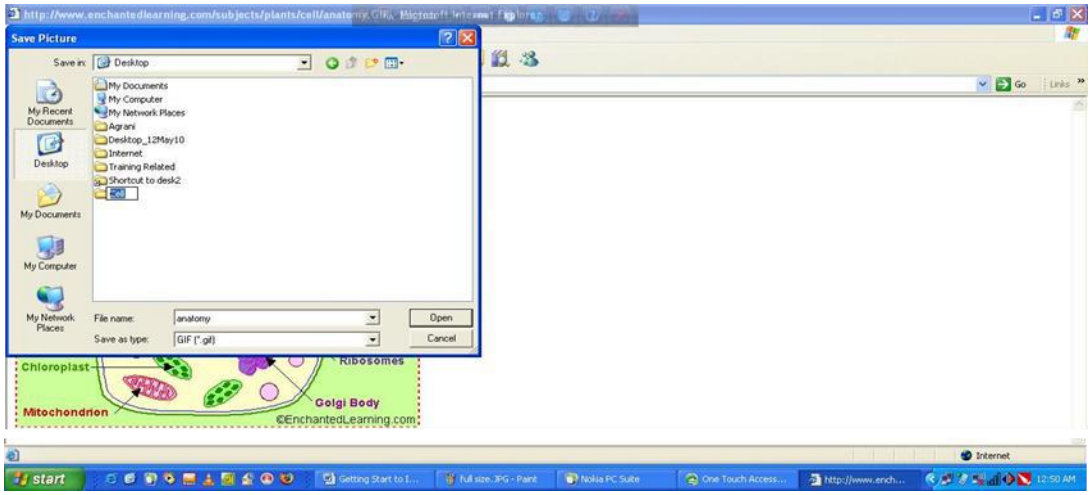

৪. অন্য কোনো শিক্ষা বিষয়ক ওয়েব সাইট (www.pppst.com, www.skoool.co.uk, www.brainpop.com, www.bookbox.com, etc) থেকেও প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপকরণ (Content) সংগ্রহ করা যায়।

৬.২ শিক্ষা ও দৈনন্দিন জীবনে ইন্টারনেটের ব্যবহার

১. আধুনিক জীবন যাপনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে করেছে উন্নত, জীবন যাত্রাকে করছে সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময়। ইন্টারনেটের ব্যবহার আমাদের জীবনে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। প্রতিনিয়ত দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে এর ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রেও ইন্টারনেটের ব্যবহার আজ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। শিক্ষার জন্য কাগজে ছাপা বই একটি অত্যাবশকীয় উপকরণ। বর্তমানে কাগজে ছাপা বইয়ের পাশাপাশি ইন্টারনেটে ই-বুক আকারে প্রকাশিত হচ্ছে। যেগুলো একটি নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট থেকে যে কোনো মুহূর্তে ডাউনলোড করে বা অন-লাইনে পড়া যায়। পাঠ্য বইয়ের কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয় বুঝতে না পারলে ইন্টারনেটের সাহায্য নেওয়া যায়।

২. ইন্টারনেটের কারণে শিক্ষার্থীদের এখন শুধু ক্লাসরুম কিংবা স্কুলের শিক্ষকদের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকতে হচ্ছে না। আজকাল অসংখ্য চমকপ্রদ কোর্স ইন্টারনেটে দেওয়া হয় এবং যে কেউ কোর্সগুলো করতে পারে। বিজ্ঞান শিক্ষায় আমাদের নানা ধরনের পরীক্ষা বা এক্সপেরিমেন্ট করতে হয়। নানা সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক সময় সেগুলো করা যায় না। কিন্তু ইন্টারনেটের কল্যাণে এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো আমারা দেখতে পারি।

৩. দেশি-বিদেশি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য ইন্টারনেট থেকে এখন সহজেই পাওয়া যায়। শিক্ষা ব্যবস্থায় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির কাজগুলো এখন ইন্টারনেটের মাধ্যমে খুব দ্রুত ও সহজে সম্পন্ন হচ্ছে। বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল এখন মোবাইল ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের হাতে চলে আসছে।

৪. কোনো বিষয়ে কারো কোনো তথ্য জানার ইচ্ছা হলে ইন্টারনেটে সার্চ করলে সে তথ্যগুলো খুব সহজেই পাওয়া যায়। শিক্ষা ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের দিন দিন ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন মানুষ যে কোনো মুহূর্তে ইন্টারনেটের কারণে লাখ লাখ বই পড়তে পারছে। শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, ইচ্ছা করলে যে কেউ শুধু একটি বই নয়, আস্ত একটি লাইব্রেরি তার পকেটে রেখে দিতে পারবে।

৫. দৈনন্দিন জীবনে ইন্টারনেটের ব্যবহারের কোনো শেষ নেই। সাধারণত আমরা দিনটা শুরু করি খবরের কাগজ পড়ে। আজ আর শুধু কাগজে ছাপা খবরের কাগজই নয়, ইচ্ছা হলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইন খবরের কাগজে দিনের খবরা খবর পড়া যায়। খবরের কাগজের পাশাপাশি আমরা রেডিও বা টেলিভিশনে খবর শুনতাম, দেখতাম; এখন সেটিও ইন্টারনেট নির্ভর হয়ে গেছে। ঘর থেকে বের হয়ে পথ-ঘাটের তথ্য আমরা ইন্টারনেট থেকে পেয়ে যাই। গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম বা জিপিএস আমাদের অবস্থানটি নিখুঁতভাবে বলে দিতে পারে। তাই কোনো ঠিকানা ইন্টারনেটের সাহায্যে খুব সহজে পাওয়া যায়। বর্তমানে নতুন সব গাড়িতেই পথ দেখানোর জন্য জিপিএস লাগানো থাকে। এখন কর্মক্ষেত্রে কম-বেশি সবাই ইন্টারনেটের ওপর নির্ভরশীল। অফিশিয়াল কাজে ইমেইল আদান-প্রদান নিত্য নৈমিত্তিক কাজ। ইন্টারনেটে আজকাল দেশ-বিদেশে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সামনাসামনি দেখে কথা বলার প্রচলন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৬. জীবনকে আনন্দময় করার জন্য বিনোদনের একটি ভূমিকা থাকে। ইন্টারনেট বিনোদনের ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা রাখছে। এখন ঘরে বসেই অনেক লেখকের বই, ই-বুক হিসেবে ইন্টারনেট থেকে পড়া যায়। শুধু বই নয়, খেলা, গান, চলচ্চিত্রসহ অনেক বিনোদনের উপাদান এখন ইন্টারনেটের কারণে অনেক বেশি সহজলভ্য হয়েছে।

৭. আমরা যদি জনপ্রিয়তার দিক থেকে বিবেচনা করি, তবে দৈনন্দিন জীবনে ইন্টারনেটের ব্যবহার হয় সামাজিক নেটওয়ার্কে। সেখানে একজন অন্যজনের সঙ্গে ভাব বিনিময় করে, ছবি, ভিডিও বিনিময় করে, কথাবার্তা বলে কিংবা বিশেষ কোনো একটি বিষয়কে আলোচনায় নিয়ে আসে।

৮. তথ্য প্রযুক্তির উন্নতির ফলে বিশ্বের যেসব দেশ এগিয়ে আছে, তারা সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট যোগাযোগ ছাড়া একটি মুহূর্তও চলতে পারে না এবং আমরাও খুব দ্রুত সেই পথে এগিয়ে যাচ্ছি।

৯. ইন্টারনেটে বিভিন্ন তথ্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গবেষণা, পরিবহন, বাণিজ্য থেকে শুরু করে সরকার, সরকার পদ্ধতি ও রাজনৈতিক হালচালের প্রায় সব ধরনের তথ্য সেখানে রয়েছে।

১০. দৈনন্দিন জীবনে নানা সমস্যা সমাধানের প্রথম হাতিয়ার হচ্ছে তথ্য। ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহের পর সেটি ব্যবহার করে অনেক সমস্যার সমাধান করা যায়। বিশ্বের জনপ্রিয় তথ্য খোঁজার সাইট বা সার্চ ইঞ্জিন হলো গুগল (www.google.com)। এতে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় তথ্য খুঁজে বের করা যায়। বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তিবিদরাও 'পিপীলিকা' (www.pipilika.com) নামে একটি বাংলা সার্চ ইঞ্জিন তৈরি করেছেন। শিক্ষা সংক্রান্ত প্রায় সব ধরনের সহায়ক তথ্য ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীদের নানা সমস্যা সমাধানের জন্য ইন্টারনেটে অনেক ওয়েবসাইট রয়েছে। www.wolframalpha.com নামে একটি বিশেষ ওয়েবসাইট আছে, যেখানে বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক কাজ করার ব্যবস্থা রয়েছে এবং বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যারও সমাধান পাওয়া যায়।

১১. এছাড়া দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানে সহায়তা করার জন্য ইন্টারনেটভিত্তিক অনেক সহায়তা কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। মোবাইল কোম্পানিগুলোর ইন্টারনেট সাপোর্ট সেন্টারগুলো গ্রাহকদের মোবাইল ফোন সংক্রান্ত সমস্যাবলির সমাধান দিয়ে থাকে। আবার অনেক ইমেইলভিত্তিক সেবা কেন্দ্র বিশ্বজুড়ে পরিচালিত হয়। এসব সেবাকেন্দ্র থেকে ইমেইলের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়।

১২. সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যম যেমন- ব্লগ, ফেসবুকের মাধ্যমে সমমনা সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকা যায় । এর ফলে অনেক স্থানীয় সমস্যার সমাধান হয়ে থাকে ।

১৩. এরূপ নানাভাবে ইন্টারনেট তথা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে থাকে ।

১৪. ইমেইলের মাধ্যমে আমরা কোনো লেখা বা ছবি অন্য যে কোনো ইমেইল ঠিকানায় ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পাঠাতে পারি । যাদের ইমেইল ঠিকানা থাকে তাদের প্রত্যেকের একটি করে মেইল বক্স থাকে । কোনো ইমেইল ঠিকানা থেকে ইমেইল এলে তা মেইল বক্সে জমা হয় । ঠিকানাটি যার সে মেইল বক্স থেকে ইমেইলটি যখন ইচ্ছা খুলে পড়তে পারে । এই মেইল পড়া ও পাঠানোর কাজটি প্রায় সময়ই বিনা পয়সায় করা যায় । ইমেইলের সঙ্গে যে কোনো ফাইল যুক্ত করা যায় । সেটি হতে পারে ওয়ার্ড ডকুমেন্ট, এক্সেল ফাইল, ছবি বা অন্য কোন ফাইল ।

১৫. ইন্টারনেটের সঙ্গে সংযুক্ত একটি কম্পিউটার থাকলেই বিনা মূল্যে ইমেইল ঠিকানা খোলা যায় । ইমেইল অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পাঠানো যায় । ইমেইল গ্রহণের জন্য কম্পিউটার খোলা থাকার কোনো প্রয়োজন নেই । দিন-রাত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যে কোনো সময় ইমেইল পাঠানো যায় আবার পড়াও যায় । একসঙ্গে অনেককে একই চিঠি পাঠানো যায় । গোপনীয়তা বজায় রেখেও ইমেইল পাঠানো যায় । তবে ইমেইল খোলার ব্যাপারে কিছু সতর্কতা জরুরি । যেমন: সন্দেহভাজন কোনো ইমেইল এলে তা খোলা উচিত নয় । কারণ এর সঙ্গে আসা ভাইরাস কম্পিউটারের ক্ষতি করতে পারে । ওয়েবে অনেক ইমেইল খোলার সাইট রয়েছে; যেমন- ইয়াহু মেইল সার্ভিস, জি-মেইল ইত্যাদি ।

প্রশ্নাবলি

১. ওয়েব ব্রাউজার কী? কয়েকটি জনপ্রিয় ওয়েব ব্রাউজার-এর নাম লিখুন ।

২. সার্স ইঞ্জিন কী? কয়েকটি জনপ্রিয় সার্স ইঞ্জিন-এর নাম লিখুন ।

৩. ইন্টারনেট থেকে কোনো তথ্য খোঁজার কৌশল কী?

৪. ইন্টারনেট থেকে কোনো ছবি খোঁজার কৌশল বর্ণনা করুন ।

৫. ছবি বা তথ্যকম্পিউটারে Save করার কৌশল বর্ণনা করুন ।

৬. বাংলায় সার্চ করার কৌশলবর্ণনা করুন ।

৭. শিক্ষা ও দৈনন্দিন জীবনে ইন্টারনেটের ব্যবহার লিখুন ।

৮. ইন্টারনেট থেকে কোনো সুনুর্দষ্ট তথ্য খোঁজার কৌশল বর্ণনা করুন ।

তথ্যসূত্র

প্রফেসর ফারুক আহমেদ, মো: আফজাল হোসেন সারওয়ার, মো: রফিকুল ইসলাম. (২০১৩). শিক্ষক সহায়িকা: শিক্ষক কর্তৃক ডিজিটাল উপকরণ তৈরি এবং মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম পরিচালনা. একসেস টু ইনফরমেশন (A2I-II) প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা ।

Curran, J., Fenton, N., & Des , F. (2016). *Misunderstanding the Internet* (2nd ed.). NY: Routledge.

Poulkov, V., & Ramjee , P. (2015). *Resource Management in Future Internet* (2nd ed.). Denmark: Aalborg: River Publisher.

ইউনিট ৭ : শিক্ষণ-শিখন সামগ্রী ও উপকরণ সংগ্রহ ও এর উন্নয়ন

আলোচিত বিষয়বস্তুসমূহ :

৭.১ ICTশিক্ষার উপযোগী শিক্ষণ-শিখন উপকরণ, সরঞ্জামাদিসহ দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী ও স্বল্প প্রাপ্য উপকরণ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ

৭.২ অন্যান্য পাঠ্যপুস্তক ও শিখন-শেখানো সামগ্রী, ভিডিও, টিভি, ইন্টারনেট

ইউনিট ৭

শিক্ষণ-শিখন সামগ্রী ও উপকরণ সংগ্রহ ও এর উন্নয়ন

শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সামগ্রী ও উপকরণ ব্যবহার শিখনকে তরান্বিত করে এবং শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াকে ফলপ্রসূ করে। শিক্ষণ কার্যক্রমে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরণের উপযোগী উপকরণ সংগ্রহ ও উন্নয়ন করা শিক্ষকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শিক্ষাদানে প্রতিনিয়ত শিক্ষণ-শিখন সামগ্রী ও উপকরণের উন্নয়ন যেমন শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগী করে তোলে তেমনি তাদের কল্পনা শক্তিরও বিকাশ ঘটায়। সেই সাথে শিক্ষা উপকরণ শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তুর জ্ঞানের বাইরেও ভাবতে শেখায়।

৭.১ ICT শিক্ষার উপযোগী শিক্ষণ-শিখন উপকরণ, সরঞ্জামাদিসহ দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী ও স্বল্প প্রাপ্য উপকরণ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ উপযোগী

৭.১.১ শিক্ষণ-শিখন উপকরণ:

দৈনন্দিন জীবনে নানা কাজ সমাধানের জন্য বিভিন্ন উপাদান সহায়ক হিসেবে কাজ করে। যে সব উপাদান বা উপকরণ কোনো কাজকে সহজে, অল্প সময়ে ফলপ্রসূভাবে সম্পন্ন করতে সহায়তা করে সেগুলোকে সহায়ক উপকরণ বলা হয়। অর্থাৎ উপকরণ হলো সহায়ক সামগ্রী বা উপাদান যা কোনো কাজ সম্পাদনে সহায়কের ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারণা, তথ্য বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বস্তুগত উদাহরণগুলোকে শিক্ষাউপকরণ বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে সজীব ও ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য শিক্ষক তার পাঠদানের সময় এমন কতগুলো সহায়ক মূর্ত উপকরণ ব্যবহার করেন যেগুলো শিক্ষার্থীর সকল ইন্দ্রীয় যেমন- চোখ, কান, নাক, ত্বক ইত্যাদিকে সক্রিয় করতে সক্ষম হয়। যেমন- ফুলের বিভিন্ন অংশ পাঠদানের সময় একটি আদর্শ ফুল বাস্তবে শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন করা এবং এর বিভিন্ন অংশ আলাদা করে দেখানো যায়। এ ক্ষেত্রে আদর্শ ফুলটি শিক্ষা উপকরণ হিসেবে কাজ করে।

৭.১.২ শিক্ষণ-শিখন উপকরণের শ্রেণি বিভাগ

প্রত্যেক পাঠদানে একই ধরনের শিক্ষা উপকরণ প্রয়োজন পড়ে না। প্রয়োজন ও দৃশ্যমানতা বিবেচনা করে শিক্ষা উপকরণের শ্রেণি বিভাগ করা যায়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো:

১. দর্শনমূলক শিক্ষা উপকরণ
২. শ্রবণমূলক শিক্ষা উপকরণ
৩. শ্রবণ-দর্শনমূলক শিক্ষা উপকরণ
৪. কাল্পনিক বা বাচনিক শিক্ষা উপকরণ

১। দর্শনমূলক শিক্ষা উপকরণ:

যে সব উপকরণ চোখে দেখা যায় তাকে দর্শনমূলক শিক্ষা উপকরণ বলা হয়, যেমন- গ্লোব, ম্যাপ, চার্ট, ব্ল্যাকবোর্ড, চক, ডাস্টার, পোস্টার পেপার, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি।

২। শ্রবণমুলক শিক্ষা উপকরণ:

যে সব শিক্ষা উপকরণ শ্রবণের মাধ্যমে শিক্ষাদানে সহায়তা করে তাকে শ্রবণ ভিত্তিক শিক্ষা উপকরণ বলা হয়, যেমন- রেডিও, গ্রামোফোন, টেপরেকর্ডার, বিভিন্ন ধরনের বাস্তব বস্তু ও নমুনা, ছবি, মডেল, ফিল্মস্ট্রিপ ও স্লাইড প্রজেক্টর, ওভারহেড প্রজেক্টর, প্রাসঙ্গিক জিনিস যথা - ফুল, বক্স, বোতল, পাতা, খবরের কাগজ, কম্পিউটার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।

৩। শ্রবণ-দর্শন মূলক শিক্ষা উপকরণ:

যে সমস্ত শিক্ষা উপকরণ একই সাথে শোনা ও দেখা যায় তাকে শ্রবণ-দর্শনমূলক শিক্ষা উপকরণ বলা হয়, যেমন- টেলিভিশন, কম্পিউটার, ভিসি আর, সবাক চলচিত্র ইত্যাদি।

৪। কাল্পনিক বা বাচনিক শিক্ষা উপকরণ:

যে সমস্ত শিক্ষা উপকরণ চোখে দেখা যায়না কিন্তু, শিক্ষকের কথা শুনে উপলব্ধি করা যায় এবং পাঠদান কাজে সহায়তা করে তাকে কাল্পনিক বা বাচনিক শিক্ষা উপকরণ বলে। যেমন- গল্প বলে বা বিভিন্ন ধরনের উপমা ও যুক্তি প্রদান করে পাঠদান করা, রূপকথা শোনানো, যুক্তি প্রদর্শন করা ইত্যাদি।

৭.১.৩ শিক্ষণ-শিখন উপকরণের প্রয়োজনীয়তা

- শিখন বোধগম্য ও স্থায়ী হয়।
- শিক্ষার্থীদেরকে যথাযথ শিখনে অনুপ্রাণিত করা যায়।
- দেখা, শোনা, স্বাদ গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিখনের যথার্থ মর্মোদ্ধার করতে পারে।
- শিক্ষার্থীর ধারণাগত উন্নয়ন ঘটায়।
- শিক্ষার্থীদেরকে শিখনে আগ্রহ তৈরি করে।
- শিক্ষার্থীদের শিখনের বাস্তব অভিজ্ঞতা পেতে পারে।
- শিক্ষণ-শিখনে সময় ও অর্থ সাশ্রয় হয়।
- নিরস পাঠকে সহজভাবে উপস্থাপন করা যায়।
- শিখন আনন্দদায়ক ও মজার হয়।

৭.১.৪ ICT শিক্ষার উপযোগী শিক্ষণ শিখন সামগ্রী

সকল বিষয়েই শিক্ষণ-শিখন সামগ্রী এবং উপকরণ রয়েছে। তেমনি ICT এর মত প্রযুক্তি নির্ভর বিষয়ের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন উপকরণ রয়েছে। ICT বিষয়ের নানা তাত্ত্বিক বিষয় তুলে ধরার সাথে সাথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে হাতে কলমে কাজ করার প্রয়োজন হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও আদান-প্রদান ইত্যাদি কাজে অনেক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়। ফলে সঠিক ও ফলপ্রসূ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিখনের জন্য তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় ক্ষেত্রেই যে সকল উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে সেগুলোকে ICT শিক্ষার উপযোগী শিক্ষণ-শিখন সামগ্রী বলে। যেমন, একটি ছবি স্ক্যান করা শিখতে হলে, উপকরণ হিসেবে কম্পিউটার ও স্ক্যানার ব্যবহৃত হয়।

৭.১.৫ ICT শিক্ষণ-শিখনে ব্যবহৃত শিক্ষা উপকরণ

প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার উপকরণসমূহ

- মাল্টিমিডিয়া সম্বলিত কম্পিউটার- যাতে করে শিক্ষার্থীরা সিডি রম ব্যবহার করতে পারে।
- লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক- যাতে শিক্ষার্থীরা একজন আর একজনের সাথে তথ্যের আদান প্রদান করতে পারে।
- ইন্টারনেট সংযোগ- যা ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।
- ই-মেইল- যাতে শিক্ষার্থীরা ই-মেইল আদান প্রদান করা শিখতে পারে।
- কালার প্রিন্টার- বিভিন্ন রকমের রঙিন ডকুমেন্ট বা ছবি প্রিন্ট করতে পারে।
- স্ক্যানার- হাতে আঁকা ছবি বা অন্য কিছু স্ক্যান করে সংরক্ষণ করতে পারে।
- ডিজিটাল স্থির এবং ভিডিও ক্যামেরা, ডকুমেন্ট ক্যামেরা ইত্যাদি যেন শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় ছবি তোলে কম্পিউটারে নিতে পারে।
- মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর- শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের তথ্য সুন্দরভাবে সকলের জন্য উপস্থাপন করতে পারে।

নিচে আইসিটি শিক্ষণ-শিখনে ব্যবহৃত শিক্ষা উপকরণ হিসেবে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার উপকরণসমূহের একটি ধারণা চিত্র প্রদত্ত হলো :

Source: http://s1.thingpic.com/

প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার উপকরণসমূহ

- ডিকশনরি সফটওয়্যার থাকতে পারে যাতে করে শিক্ষার্থীরা কোনো শব্দ খুঁজতে পারে ।
- ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার যেমন- মাইক্রোসফট ওয়ার্ড যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সুন্দরভাবে তৈরি করতে পারে ।
- গ্রাফিক্স সফটওয়্যার যেমন- এমএস পেইন্ট, এডাবি ফটোসপ ইত্যাদি যাতে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ছবি আঁকতে পারে ।
- হাজার হাজার ছবি সম্বলিত ক্লিপ-আর্ট প্রোগ্রাম কম্পিউটারে ইনষ্টল করা থাকতে পারে যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের ডকুমেন্টে কাজে লাগাতে পারে ।
- ইন্টারনেট ব্রাউজার যেমন- ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, নেটস্ক্যাপ নেভিগেটর ইত্যাদি যাতে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ওয়েব সাইট ব্রাউজ করতে পারে এবং তথ্য খুঁজে বের করতে পারে ।
- বিভিন্ন রকমের টিউটোরিয়াল সিডি ।
- ই-মেইল করার জন্য যেমন ইউডোরা সফটওয়্যার এবং মাইক্রোফট আউটলুক সফটওয়্যার ।
- মাল্টিমিডিয়া অথোরিং সফটওয়্যার ।
- লেখচিত্র, বারগ্রাফ, পাই-চার্ট ইত্যাদি তৈরি করার জন্য বিভিন্ন রকমের গ্রাফিক্স সফটওয়্যার ।
- ছোট-খাট ডাটাবেজ তৈরির জন্য যেমন: মাইক্রোসফট এক্সেল, ভিসুয়্যাল ফক্সপ্রো ইত্যাদি ডাটাবেজ সফটওয়্যার ।
- বিভিন্ন রকমের গাণিতিক কাজের জন্য এবং স্প্রেডসীট এনালাইসিসের জন্য সফটওয়্যার যেমন- মাইক্রোসফট এক্সেল ।
- বিভিন্ন কার্যপ্রণালি রেকর্ড করার জন্য সফটওয়্যার; যেমন ভিডিও সফটওয়্যার ।
- মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশনের জন্য সফটওয়্যার; যেমন পাওয়ার পয়েন্ট সফটওয়্যার ।

Source: https://www.technotification.com

প্রয়োজনীয় আনুসঙ্গিক উপকরণসমূহ :

- বিভিন্ন রকমের ICT নির্ভর পোস্টার ল্যাবের দেয়ালে/শ্রেণিকক্ষে ঝুলিয়ে রাখা ।
- পুরাতন যন্ত্রপাতি যেমন- মাদার বোর্ড, প্রসেসর, র‍্যাম, মাউস, কীবোর্ড, প্রিন্টার ইত্যাদি সংরক্ষণ করে ল্যাবে রাখা ।
- বিভিন্ন ম্যাগাজিন, জার্নাল ইত্যাদি সংরক্ষণ করা ।
- বিদ্যুৎ চলে গেলে যাতে তথ্য মুছে না যায় তার জন্য ইউপিএস এর ব্যবস্থা রাখা ।

চিত্র: মাইক্রোসফ্‌ট অফিস প্রোগ্রামের একটি ছবি

৭.১.৬ ICT সরঞ্জামাদিসহ দুস্প্রাপ্য সামগ্রী ও স্বল্পপ্রাপ্য উপকরণ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ

দুস্প্রাপ্য সামগ্রী

ICT সরঞ্জামের মধ্যে যে সকল সামগ্রী বা উপকরণ সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন সেগুলোকে আমরা দুস্প্রাপ্য সামগ্রী বা উপকরণ বলে থাকি। অনেক ICT সামগ্রী আছে যা বর্তমানে ব্যবহৃত হয় না। যেমন- নির্বাক চলচিত্র, রিকটার স্কেল, গ্রামোফোন, সুপার-কম্পিউটার ইত্যাদি। এসব সামগ্রী বর্তমানে উৎপাদন বন্ধ থাকায় বাজারে কিনতেও পাওয়া যায় না। ফলে এসব ICT সামগ্রী সংগ্রহ করা খুবই কঠিন। আবার অনেক অত্যাধুনিক ICT সরঞ্জাম আছে যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় সংগ্রহ করা যায় না। এসব সরঞ্জাম ও সামগ্রী হলো দুস্প্রাপ্য সামগ্রী।

স্বল্পপ্রাপ্য সামগ্রী

যেসব ICT সামগ্রী ও সরঞ্জাম বিদ্যালয় অল্প পরিমাণ সংগ্রহ করা হয় তাদেরকে স্বল্পপ্রাপ্য সামগ্রী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেমন- কম্পিউটার, প্রিন্টার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ভিডিও ক্যামেরা ইত্যাদি। তাছাড়াও আরো কিছু সামগ্রী আছে যেগুলো ICT সামগ্রী বা সরঞ্জাম না হলেও ল্যাবে সহায়ক সামগ্রী হিসেবে কাজ করে। যেমন- UPS, A/Cইত্যাদি।

দুস্প্রাপ্য ও স্বল্পপ্রাপ্য ICT সামগ্রীর নমুনা তালিকা

দুস্প্রাপ্য ICT সামগ্রী	স্বল্পপ্রাপ্য ICT সামগ্রী	
➢ গ্রামোফোন ➢ সুপার কম্পিউটার ➢ রেডিও ট্রান্সমিটার ➢ টেলিগ্রাম ➢ নির্বাক চলচিত্র ➢ রিকটার স্কেল ➢ রাডার	➢ রেডিও ➢ টেপ রেকর্ডার ➢ প্রিন্টার ➢ ফোন ➢ ফ্যাক্স ➢ স্মার্ট বোর্ড ➢ Interective Board	➢ কম্পিউটার ➢ স্ক্যানার ➢ OHP ➢ Document Camera ➢ ভিডিও ক্যামেরা ➢ অডিও প্লেয়ার ➢ টেলিভিশন

৭.১.৭ ICT সরঞ্জামাদি ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ

শিক্ষণে সাধারণত যে সব ICT সামগ্রী বা সরঞ্জাম ব্যবহৃত হতে পারে তা হলো: কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ফোন, OHP, ক্যামেরা ইত্যাদি। তাছাড়া সহায়ক সামগ্রী UPS, A/C, ইন্টারনেট সুবিধা ইত্যাদি ব্যবহার হতে পারে। আমাদের প্রয়োজন এসব সরঞ্জামাদির যথাযথ ব্যবস্থাপনা করা। যথাযথ ব্যবস্থাপনা ছাড়া এসব সামগ্রী দ্রুত কার্যকারিতা হারায়। তাই এসব সামগ্রী বা সরঞ্জামের সুষ্ঠু ও সঠিক ব্যবস্থাপনা শিক্ষার্থীর ICT শিখন নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। সুষ্ঠু ও সঠিক ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিম্নরুপ:

১. ICT-তে ব্যবহৃত সরঞ্জামসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা।
২. এ সব সরঞ্জামসমূহ ব্যবহার উপযোগী রাখার জন্য সময়ে সময়ে এদের কার্যকারিতা বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করা।
৩. এসব সরঞ্জাম ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা এবং নীতিমালা অনুসারে ব্যবহার করা।
৪. ICT ক্লাস পরিচালনার জন্য পৃথক শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থা করা।
৫. ICT শ্রেণিকক্ষ ধুলাবালি মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা।
৬. শ্রেণিকক্ষে ICT শিখন-শেখানো কার্যক্রম নিরবিচ্ছিন্ন রাখার জন্য সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ নিশ্চিত করার জন্য জেনারেটরের ব্যবস্থা করা।
৭. সম্ভব হলে ICT শ্রেণিকক্ষে A/C এর ব্যবস্থা করা।
৮. ICT সরঞ্জামসমূহ সঠিক নিয়মে ব্যবহার নিশ্চিত করা। যেমন- কম্পিউটার open ও close সঠিক নিয়মে করা।
৯. ICT ক্লাস শুরুর পূর্বে এবং ক্লাস শেষ হওয়ার পর সব সরঞ্জাম সঠিক আছে কিনা তা যাচাই করা।

৭.২ অন্যান্য পাঠ্যপুস্তক ও শিখন-শেখানো সামগ্রী, ভিডিও, টিভি, ইন্টারনেট

সকল বিষয়েই শিক্ষকের জন্য পাঠ্যপুস্তক একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। মাধ্যমিক পর্যায়ে ICT শিক্ষায় পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য পুস্তকসহ নানা ধরনের উপকরণ বিদ্যমান। পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের জন্য দর্শনমূলক, শ্রবণমূলক এবং শ্রবণ-দর্শনমূলক শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন- টিভি, ভিডিও ইত্যাদি। শিক্ষন-শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর ফলপ্রসূ শিখনের জন্য শিক্ষকের ICT বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকসহ অন্যান্য শিক্ষণ-শিখন সামগ্রীর যথাযথ ব্যবহার প্রয়োজন।

উপকরণ হিসাবে পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পাঠদান প্রক্রিয়া সার্থক করতে বিভিন্ন পুস্তকের সাহায্য নেয়া হয়। প্রকৃত পক্ষে একটি বিষয়বস্তু সার্থকভাবে শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করতে হলে প্রয়োজন বিষয়বস্তু সংক্রান্ত গভীর জ্ঞান এবং যথার্থ কৌশল প্রয়োগ। অর্থাৎ বিষয়গত জ্ঞান এবং বিভিন্ন পাঠদান পদ্ধতি বা কৌশলের মাধ্যমেই বিমূর্ত ধারণা প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে মূর্ত হয়ে ওঠে। সে কারণে ফলপ্রসূ পাঠদানের জন্য প্রয়োজন মূল পাঠ্যপুস্তক ছাড়া অন্যান্য পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য গ্রহণ।

নানা ধরণের পুস্তক পাঠের জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা। প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের জন্য নানা ধরণের পুস্তক একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম যা প্রকৃতভাবে চাহিদা নিবৃত্ত করতে পারে। অন্যভাবে বলা যায় শিখনে পরিণমন সৃষ্টিকারী একটি উপাদান হচ্ছে পুস্তক। অন্যান্য পুস্তক বলতে বিষয় ও বিষয়বস্তু ভিত্তিক বিভিন্ন পুস্তক, কারিকুলাম রিপোর্ট, গবেষণা পত্র, বিভিন্ন সেমিনারে আলোচনা পত্র, শিক্ষক নির্দেশিকা প্রভৃতি বোঝায়। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপাত্ত-নির্ভর পুস্তক, প্রতিবেদন, বাৎসরিক ম্যাগাজিন, প্রশিক্ষক ম্যানুয়েল প্রভৃতি পুস্তক জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে।

৭.২.১ ICT শিখনে ভিডিও, টেলিভিশন এবং ইন্টারনেট

ভিডিও, টিভি ও ইন্টারনেট ইত্যাদি শিখন সামগ্রী হিসেবে ব্যবহারের জন্য খুবই উপযোগী। কারণ এ তিনটি যন্ত্রই বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান তৈরি, সংরক্ষণ ও প্রচারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে। এ তিনটি যন্ত্রই তথ্য, শব্দ ও ছবি সংরক্ষণ ও প্রচার করতে পারে। ফলে অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের চেয়ে এ তিনটি শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার সুবিধাজনক। ICT শিখনের ক্ষেত্রে এ তিনটি সামগ্রীর ভূমিকা নিচে আলোচনা করা হলো-

ভিডিও

ভিডিও হচ্ছে কোনো চলমান ঘটনার রেকর্ড সংরক্ষণ করা যা পরবর্তীতে টেলিভিশন বা কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রচার করা যায় অর্থাৎ রেকর্ডকৃত চলমান ঘটনা পুনরায় দেখা যায়। ICT শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান তৈরি ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ভিডিও'র কিছু বিশেষ ব্যবহার হতে পারে। যেহেতু ICT প্রযুক্তি নির্ভর বিষয় তাই এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ICT উপকরণ ও সামগ্রী এবং তাদের ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেওয়ার ক্ষেত্রে ভিডিও প্রোগ্রাম ব্যবহার করা যেতে পারে। ICI শিক্ষায় ভিডিও প্রোগ্রামের মাধ্যমে বাস্তব চলমান চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন প্রকার ICT সামগ্রীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া বিভিন্ন ICT সামগ্রীর ব্যবহার কৌশল ভিডিও প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শেখানো বা ধারণা দেওয়া যেতে পারে। যেমন: ইন্টারনেট কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তা ভিডিও প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

টেলিভিশন

টেলিভিশন বা দূরদর্শন যন্ত্রের সাথে আমরা সকলেই পরিচিত। এটি বর্তমানে একটি শক্তিশালী ও বহুল ব্যবহৃত গণমাধ্যম। টেলিভিশনের মাধ্যমেও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান উপস্থাপন বা প্রচার করা যেতে পারে। ভিডিও প্রোগ্রাম ও টেলিভিশন প্রোগ্রাম একই বৈশিষ্ট্যের হলেও ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুটির প্রকৃতি দু'রকম। টেলিভিশন অনুষ্ঠান একটি প্রচার কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হয় এবং অন্য স্থান থেকে টেলিভিশন সেটের মাধ্যমে আমরা তা দেখতে পারি। যেমন- উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান। টেলিভিশনের মাধ্যমে দেশের সব শিক্ষার্থী একই সাথে এসব অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ পেতে পারে। কিন্তু ভিডিও প্রোগ্রামের মাধ্যমে একটি শ্রেণির শিক্ষার্থীরা একসাথে একটি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখতে পারে। আবার টেলিভিশন প্রোগ্রাম প্রচার কেন্দ্রের সুবিধাজনক সময়ে প্রচার করা হয়। অন্যদিকে ভিডিও প্রোগ্রাম নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তাদের সময় অনুযায়ী দেখতে বা দেখাতে পারে। ভিডিও প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীরা ইচ্ছে করলে বার বার দেখতে পারে। টেলিভিশন প্রোগ্রাম দেখার জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ ও টেলিভিশন সেট থাকলেই চলে। তবে স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের সংযোগ থাকলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানও দেখা যাবে।

টেলিভিশন ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা

টেলিভিশন ব্যবহারের সুবিধা	টেলিভিশন ব্যবহারের অসুবিধা
• অনুশীলনী পাঠদানে ফলপ্রসূতা আসে। • পাঠদানকালে শিক্ষার্থীদের জীবন্ত প্রোগ্রাম দেখানো যায়। • শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রমের প্রতিফলন ঘটে। • নিজেকে সংশোধন করা যায়। • পাঠ আনন্দদায়ক হয়।	• শিক্ষার্থীর সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা যায় না। • শিক্ষকের সাহচার্য থেকে বঞ্চিত হয়। • শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক কাজে অংশ নিতে পারে না। • পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করা যায় না। • সব সময় ব্যবহার করা সম্ভব হয় না।

ইন্টারনেট :

ইন্টারটে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার বা অন্য কোনো ডিভাইস এবং ইন্টারনেট ব্রাউজ করার জন প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার। ইন্টারনেট ব্রাউজ করে শিক্ষার্থীরা তাদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য পেতে পারে। যেমন: কোনো ICT সামগ্রীর বাস্তব চিত্র ইন্টারনেট থেকে পাওয়া যেতে পারে।

শিক্ষার্থীরা নিজেদের সুবিধামত সময়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারে। এক্ষেত্রে টিভি অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট সময়সূচির ন্যায় কোনো সময়সূচি নেই। এখানে একই উৎস থেকে বিভিন্ন সময় একই তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। তাছাড়া ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে বা ই-মেইল ব্যবহার করে একজন অন্যজনের সাথে তথ্য আদান প্রদান করতে পারে।

ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা

ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা	ইন্টারনেট ব্যবহারের অসুবিধা
• ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় যোগাযোগ করা যায়। • এর মাধ্যমে খুব সহজেই তথ্য আদান-প্রদান নিশ্চিত করা যায়। • এর ব্যবহার করে তাৎক্ষণিক ও দ্রুত যোগাযোগ করা যায়। • এর মাধ্যমে দূর্লভ ছবি, তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা যায়।	• ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। • এর অবাধ বা অপব্যবহার শিক্ষার্থীদের ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে; বিশেষ করে পর্ণোসাইট ভিজিটের মাধ্যমে। • এর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো, ভৌত সুবিধা ও আর্থিক সংগতি থাকা প্রয়োজন যা অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নেই। • এর সুবিধা পেতে কম্পিউটার পরিচালনায় দক্ষ হতে হয় যা মাধ্যমিক স্তরের অনেক শিক্ষকের নেই।

প্রশ্নাবলি

১. শিক্ষণ-শিখনে উপকরণের শ্রেণি বিভাগ লিখুন।
২. শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে শ্রবণ-দর্শনমূলক শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের গুরুত্ব লিখুন।
৩. আইসিটি শিক্ষণে প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার উপকরণসমূহের একটি তালিকা তৈরি করুন।
৪. শিক্ষার্থীরা ই-মেইল আদান প্রদান করে কীভাবে শিখতে পারে লিখুন।
৫. দুষ্প্রাপ্য ও স্বল্পপ্রাপ্য আইসিটি সামগ্রী সংরক্ষণের নীতিমালা তৈরি করুন।
৬. শিখন-শেখানো সামগ্রী হিসেবে ভিডিও ব্যবহারের সুবিধা লিখুন।
৭. শিখন-শেখানোতে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা লিখুন।

তথ্যসূত্র

Clarke, A. (2001). *Designing Computer-based Learning Materials.* England: Gower Publishing, Ltd.

Jason Brick. (2017). *Types of Teaching Aids*. Retrieved November 11, 2017, from http://www. http://classroom.synonym.com/list-6100903-types-teaching-aids.html.

Nikky.(13 July 2010). Teaching *Aids, Their Needs, Types and Importance of Teaching Aids In Teaching Learning Process.*Retrieved November 11, 2017, from http://www.indiastudychannel.com.

অধ্যায় ৮: শিখন-শেখানো কার্যাবলীতে সমন্বিত মূল্যযাচাই

আলোচিত বিষয়বস্তুসমূহ :

৮.১: ICT শিক্ষণ-শেখানো কার্যাবলিতে শিখন যাচাইয়ের ভূমিকা: আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক, গঠনকালীন ও প্রান্তিক মূল্যযাচাই, শিখন যাচাই কাজের উন্নয়ন

৮.২: ব্যক্তিগত ও বৌদ্ধিক দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের সাথে জড়িত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও লেখা সতীর্থ পর্যালোচনা, অণুশিক্ষণ, সাদৃশ্যমূলক শিক্ষণ ও ফলাবর্তনের মাধ্যমে শিখন যাচাই কাজের পরীক্ষা করা

৮.৩: শিখন যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে শিক্ষাক্রমের নির্দিষ্ট পাঠ/শিরোনাম শিক্ষণের পর্যালোচনার পরিকল্পনা

অধ্যায় ৮

শিখন-শেখানো কার্যাবলীতে সমন্বিত মূল্যযাচাই

শিক্ষার্থীগণ শিক্ষণের উদ্দেশ্য বা শিখনফল কতটুকু অর্জন করতে পেরেছে তা পরিমাপের জন্য যে পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয় তাকে মূল্যযাচাই বলে। শিক্ষণ-শিখনের সাথে জড়িত সব কর্মকান্ডের মধ্যে মূল্যযাচাই অতি গুরুত্বপূর্ণ। মূল্যযাচাই বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পরিধি প্রদর্শনের সুযোগ প্রদান করে।

মূল্যযাচাইয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে এবং এই সব পদ্ধতিসমূহকে ৪টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:-নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া, রচনা, দক্ষতা মূল্যায়ন ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ। বিভিন্ন শিখনফল যাচাইয়ের জন্য প্রতিটি ভাগেরই কিছু সুবিধা রয়েছে। যেমন– নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়ায় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সব ক্ষেত্রের জ্ঞানের পরিমাপ করা যায় যদিও এর মাধ্যমে শুধু শিক্ষার্থীর যৌক্তিক ক্ষমতাই বেশি প্রদর্শিত হয়।

পরীক্ষা গ্রহণ করা মূল্যযাচাইয়ের একটি পদ্ধতি - এটি একটি ভুল ধারণা। শিক্ষার্থীদের দক্ষতা কীভাবে পরিমাপ করা হবে, পরীক্ষা পদ্ধতি তার শর্ত নির্ধারণ করে থাকে। তা সাধারণত মূল্যযাচাই কোথায় এবং কত সময়ে হবে তা নির্দিষ্ট করে। পরীক্ষা পদ্ধতির শর্তসমূহ মূল্যযাচাইয়ের সব কৌশলেই অবলম্বন করা যায়।

৮.১ ICT শিখন-শেখানো কার্যাবলিতে শিখন যাচাইয়ের ভূমিকা: আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক, গঠনকালীন ও প্রান্তিক মূল্যযাচাই, শিখন যাচাই কাজের উন্নয়ন

ICT শিক্ষণ ও শিখনে মূল্যযাচাই একটি অপরিহার্য অংশ। শিক্ষায় মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে জাতীয় চিন্তা চেতনা সম্পর্কে ভালো ধারণা লাভের ফলে পরিকল্পনা, শিক্ষাদান ও রিপোর্ট তৈরিতে সাহায্যে করে। প্রতি ইউনিট শেষে একটি আনুষ্ঠানিক মূল্যযাচাই করা হলে শিক্ষার্থীরা পাঠ শেষে তার যোগ্যতা প্রদর্শনের সুযোগ পায়। মূল্যযাচাই অনেক ভাবেই করা যায়। যেমন: আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক, গঠনকালীন ও প্রান্তিক মূল্যযাচাই ইত্যাদি।

৮.১.১ আনুষ্ঠানিক মূল্যযাচাই

আনুষ্ঠানিক মূল্যযাচাই একটি ছোট পরীক্ষা অথবা কাজের মাধ্যমে করা যেতে পারে। যেমন: ওয়ার্ড প্রসেসিং এর ক্ষেত্রে একটি সহজ মূল্যায়ন পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে একটি লেখা বোল্ড বা আন্ডারলাইন করা, ফন্ট সাইজ ছোট-বড় করা ইত্যাদি। পরীক্ষার মাধ্যমে একজন শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের ICT সম্পর্কে জ্ঞানের পরিধি নির্ধারণ করতে পারেন। এ ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে খুব দ্রুত মূল্যায়ন করা যায়।

যে কোনো বিষয়ে পাঠদান শেষে শিক্ষার্থীরা উক্ত পাঠ থেকে কী শিখতে পারলো তা যাচাইয়ের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে সময় দিয়ে কাজটি করিয়ে নিয়ে তার মূল্যায়ন করলে শিক্ষক যেমন তার শিক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োজনে পরিবর্তন ও সংশোধনের সুযোগ পান তেমন শিক্ষার্থীদের দক্ষতাও শিক্ষক পরিমাপ করতে পারেন। তবে প্রতিটি পাঠশেষে ১৫/২০ মিনিটের একটি কাজ দিয়ে মূল্যযাচাই করার প্রতি শিক্ষকদের খেয়াল রাখা উচিত।

৮.১.২ অনানুষ্ঠানিক মূল্যযাচাই

পাঠদান কালে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের প্রশ্নের উত্তর দানের মাধ্যমে, শিক্ষার্থীদের কাজ দেখাশোনার মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিক মূল্যযাচাই করা যেতে পারে। যেমন: স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম শেখানোর সময় একটি সেল-এ ফর্মূলা ব্যবহার করে অথবা একটি সেল-এ ডাটা আপডেট করে গ্রাফের/চার্টের পরিবর্তন প্রদর্শনের মাধ্যমে এই মূল্যযাচাই করা যেতে পারে।

যে কোনো বিষয়ে পাঠদানকালে শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদেরকে ছোট ছোট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে পাঠের কার্যকারিতা এবং শিক্ষার্থীদের দক্ষতা অর্জন সম্পর্কে অতি দ্রুত ধারণা লাভ করতে পারেন।

৮.১.৩ গঠনকালীন মূল্যযাচাই

Form থেকে Formative শব্দের উৎপত্তি। Form অর্থ গঠন করা বা তৈরি করা। শিক্ষার্থীর দুর্বলতা বা সবলতা সনাক্ত করে নিরাময় মূলক ব্যবস্থা (Remedial Measure) গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে তৈরি বা গঠন করে নেয়ার জন্য যে মূল্যায়ন করা হয় তাকে গঠনমূলক বা গঠনকালীন মূল্যায়ন বলে।

Page Thomasg-এর মতে, যে মূল্যযাচাই ব্যবস্থায় প্রয়োগকৃত অভীক্ষার ফলাফল থেকে তথ্যের ফলাবর্তনের (Feed Back) মাধ্যমে শিক্ষণ-শিখন ব্যবস্থাকে উন্নত করা যায় বা যা শিক্ষণ পদ্ধতির কার্যকারিতা ও সর্বোচ্চ শিখন প্রতিবন্ধকতার চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম, তাকে গঠনকালীন মূল্যযাচাই বলে ।

Ruth Sutton-এর মতে গঠনকালীন মূল্যযাচাই হলো আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত একটি চলমান অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিশুর শিখন সংক্রান্ত তথ্য ও প্রমাণ পাওয়া যায় এবং তার মাধ্যমে পরবর্তী ধাপের পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় ।

Best & Khan বলেছেন, গঠনকালীন মূল্যযাচাই একটি চলমান ও অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া । গঠনমূলক পর্যবেক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য হলো কোনো নির্দিষ্ট শিখন কাজের কতটুকু পূর্ণ হলো তার মাত্রা নিরূপণ এবং সফল শিখন ঘটতে কতটুকু বাকী থাকল তার সুনির্দিষ্টকরণ ।

র‍্যাগ ও থমাসের মতে, শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া উন্নয়নের জন্য যে মূল্যায়ন ব্যবহৃত হয় তাই গঠনমূলক মূল্যায়ন ।

এবল ও ফ্রিজবি বলেন "পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী শিখন সংগঠিত হচ্ছে কি-না তা তদারক করার জন্য পরিচালিত মূল্যায়নই গঠনমূলক মূল্যায়ন ।"

সুটন বলেন, "গঠনকালীন মূল্যায়ন হলো আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত একটি চলমান প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য ও সাক্ষ্য বিবেচনা করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় ।

ICT শিক্ষণ ও শিখনে মূল্যযাচাইয়ের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে শিক্ষার্থীদের গঠনকালীন দক্ষতা যাচাই, পাঠের কার্যকারিতা যাচাই ইত্যাদিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে । পাঠদানের শুরুতে অথবা মাঝামাঝি সময়ে এই ধরনের মূল্যযাচাই করা হয়ে থাকে । এটি শিক্ষককে তার পরবর্তী পাঠদানে পরিকল্পনা করতে সহায়তা করে থাকে । এটি আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় উপায়েই করা হতে পারে । একজন শিক্ষক নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন তিনি কি আনুষ্ঠানিক মূল্যযাচাই করবেন না-কি অনানুষ্ঠানিক মূল্যযাচাই করবেন । পূর্বে প্রশ্নপত্র তৈরি করে মূল্যযাচাই একটি কার্যকর পদ্ধতি হতে পারে । অন্য দিকে অনানুষ্ঠানিক মূল্যযাচাইয়ের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক শিখনফল যাচাই করে ফল পাওয়া যেতে পারে । এ ক্ষেত্রে যদিও সব শিক্ষার্থী তাদের পূর্ণ দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারে না ।

গঠনকালীন মুল্যযাচাইয়ের ক্ষেত্রে যে কাজ দেয়া হবে তা পাঠের স্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিনা, কাজটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পরিস্কার ধারণা আছে কিনা, যে স্তরের জন্য কাজটি নির্ধারণ করা হয়েছে, সে স্তরের সাথে কাজটির ভাষা ও গাণিতিক দক্ষতা সঠিক হয়েছে কিনা ইত্যাদি শিক্ষককে সম্পূর্ণভাবে জেনে নিতে হবে ।

গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Formative Assessment)

বিভিন্ন শিক্ষাবিদগণের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে গঠনকালীন মূল্যায়নের নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায় ।

- এটি একটি চলমান ও অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া ।
- শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি সম্পর্কে ধারনা দেয় ।
- শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধানে এটি তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত দিতে সহায়তা করে ।
- এটি শিক্ষার্থীর শিখন উদ্দেশ্যকে পরিমাপ করতে সক্ষম ।
- এটি আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দুভাবেই সম্পন্ন করা যায় ।
- গঠনকালীন মূল্যযাচাই হতে পারে দৈনিক,সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, সান্মাসিক অথবা যেকোনো পিরিয়ডিক মূল্যায়ন ।
- এর মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষাদানের জন্য পরবর্তী কার্যক্রম কি হবে তা ঠিক করে থাকেন ।
- এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষণ পদ্ধতি ও উপকরণের ধরণ ও ব্যবহার পরিবর্তন করা হয় ।
- শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষাথীরা ধারণা গঠনের জন্য গঠনমূলক মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক ও নিরন্তন প্রক্রিয়া ।
- পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী শিখন-শেখানো কার্যক্রম কতটা অগ্রসর হচ্ছে তার একটি তদারকি প্রক্রিয়া ।
- এ মূল্যায়নের জন্য সময়সীমা বা প্রয়োগক্ষেত্র সম্পর্কে কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই ।
- শিক্ষার্থীর দুর্বলতা ও সবলতার মাত্রা সনাক্ত করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গঠনমূলক মূল্যায়ন হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয় ।
- এ মূল্যায়নের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি সম্পর্কে একটা বিস্তৃত ধারণা পাওয়া যায় ।
- এ মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষক তাঁর শিক্ষণ কৌশল ও পদ্ধতিতে দুর্বলতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে পারেন ।
- ব্যবহৃত শিক্ষোপকরণের ফলপ্রসুতা যাচাইয়ের মাধ্যমে সঠিক উপকরণ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে পারেন ।

- শিক্ষক শিক্ষাদানের প্রতিটি স্তরে তাঁর সফলতা ও ব্যর্থতা সনাক্ত করে পরবর্তী পদক্ষেপে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে পারেন।
- গঠনকালীন মূল্যায়ন আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক হতে পারে।
- এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা বারংবার ও প্রতিনিয়ত মূল্যায়ন হয় বলে মূল্যায়নের প্রতি শিক্ষার্থীর ভীতি দূর হয়।
- সমস্যা সমাধানের অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেয়ার মতো ফলাবর্তন পাওয়া যায়।
- শিক্ষাক্রমের ধারাবাহিক বাস্তবায়ন এবং সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ জানা যায় এবং শিক্ষাক্রম নবায়ন ও পরিমার্জনে সহায়তা করে।

গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের কৌশল

অভীক্ষা তৈরির পর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে অথবা ঘোষণা না দিয়ে এ মূল্যায়ন করা যেতে পারে। অভীক্ষা ছাড়াও পর্যবেক্ষণ, চেকলিষ্ট, প্রশ্নোত্তর, বাড়ির কাজ প্রদান, কুইজ, ক্লাস-টেষ্ট ইত্যাদি কৌশল অবলম্বন করে এ মূল্যায়ন করা যায়। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকভাবেই এ মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের পদ্ধতি ও হাতিয়ারগুলো হলো:

- **শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের পর্যবেক্ষণ:** এ প্রক্রিয়ায় পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীর মনোযোগ, আগ্রহ ও অংশগ্রহণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।
- **মৌখিক প্রশ্নকরণ:** শিক্ষার্থী পাঠের কতটুকু বুঝতে পারল বা পারল না প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তা জানা যায়।
- **শ্রেণির কাজ:** শ্রেণিতে শিক্ষার্থীকে দলগতভাবে বা এককভাবে কাজ করতে দিলেও তাদের শিক্ষণের অগ্রগতির মাত্রা যাচাই করা যায়।
- **শ্রেণি অভীক্ষা:** শ্রেণিতে শিক্ষার্থীকে দলগতভাবে বা এককভাবে শ্রেণির অভীক্ষার মাধ্যমে তাদের শিখনের অগ্রগতির মাত্রা যাচাই করা যায়।
- **বাড়ির কাজ:** দৈনন্দিন বাড়ির কাজ দিয়ে বা বিশেষ কাজ দিয়েও শিক্ষার্থীর শিখনের ধরণ ও মাত্রা সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায়।
- **সাপ্তাহিক পরীক্ষা:** প্রতি সপ্তাহে সাপ্তাহিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠের অগ্রগতি যাচাই করা যায়।
- **অর্পিত কাজ:** যে কাজ শিক্ষার্থীদেরকে করে আনতে দেওয়া হয় তাকে অর্পিত কাজ বলে। শিক্ষক তাদের অর্পিত কাজের তদারকি করবেন।
- **টার্মপেপার:** শিক্ষার্থীদের প্রতি ক্লাসে বিভিন্ন বিষয়ের টার্ম পেপার করে আনতে বলবেন এবং তারা তা করেছে কিনা তা খতিয়ে দেখবেন।
- **সেমিনার:** শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সেমিনার বা সিম্পোজিয়াম আয়োজন করতে পারেন। এতে তাদের পাঠে অগ্রগতি হয়।
- **শিক্ষা সফর:** প্রতি বছর স্কুল থেকে দেশের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে শিক্ষা সফরের আয়োজন করা যেতে পারে।
- **কুইজ:** সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন প্রণয়ন করে ধাঁধাঁ আকারে প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমেও মূল্যায়ণ করা যায়।
- **বিতর্ক ও আলোচনা সভা:** বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক, আলোচনা সভা করেও শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা যায়।
- দৈনন্দিন উপস্থিতি বা ক্লাসের হাজিরাও গঠনমূলক মূল্যায়নের একটি নির্ভরযোগ্য কৌশল।
- শিক্ষার্থীদেরকে ডায়েরি বা লার্নিং লগ লিখতে দিয়েও গঠনমূলক মূল্যায়ন করা যায়।
- আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীর যে প্রগ্রেস রিপোর্ট দেয়া হয় এটিও এক ধরণের গঠনমূলক মূল্যায়ন।

গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের ক্ষেত্রসমূহ

বুদ্ধিবৃত্তীয় ক্ষেত্র

জ্ঞানমূলক ক্ষেত্র বা জ্ঞান বিষয়ক ক্ষেত্র চিন্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত। তাই একে বোধগম্য ক্ষেত্রও বলা হয়। Bloom তার Taxonomy of Educational Objectives পুস্তকে জ্ঞানমূলক ক্ষেত্র সম্পর্কে বলেছেন- "যে সব শিখন উদ্দেশ্য মননশীল ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত সেগুলো জ্ঞানের স্মরণ, চেনা বা সনাক্তকরণ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ বিকাশের সাথে সম্পর্কিত" এই ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রতিভা বিকশিত হয়।

আবেগীয় ক্ষেত্র

আবেগিক ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, আগ্রহ ও যথাযথ গুণ বিচারকরণ ক্ষমতার পরিবর্তন। Bloom তার Taxonomy of Educational Objectives-এ আবেগিক ক্ষেত্র সম্পর্কে বলেছেন। আবেগিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের পরিবর্তন এবং যথাযথ গুণ বিচার ও খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা বিকশিত হয়। ফলে শিক্ষার্থীর বোধগম্যতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়।

মনোপেশিজ ক্ষেত্র

ক্রিয়ামূলক ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যগুলো কিছু কাজ করার সাথে সম্পর্কযুক্ত। যে সব উদ্দেশ্য দৈহিক ও অঙ্গ সঞ্চালনমূলক দক্ষতাকে (Motor Skill) তাদের বিষয়বস্তু হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে সেগুলো ক্রিয়ামূলক ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষার্থীদের যে সব আচরণ পেশিজ ক্রিয়া বা কর্মের অন্তর্ভুক্ত এবং যার জন্য স্নায়ুপেশিজ সমন্বয় প্রয়োজন সেগুলোকে ক্রিয়ামূলক ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর কাজের যোগ্যতা বা দক্ষতা তৈরি হয়।

গঠনকালীন মূল্যযাচায়ের গুরুত্ব

ধারাবাহিক মূল্যায়ন/গঠনকালীন মূল্যায়ন হলো শিক্ষকের বর্ণিত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিষয় ভিত্তিক/সংশ্লিষ্ট শিক্ষক কর্তৃক পরিচালিত যে সব কাজ শিক্ষার্থী সম্পাদন করে তাকে বোঝায়। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর মননশীল ক্ষেত্রের পাশাপাশি তার আবেগিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রের মূল্য যাচাই সম্ভব হবে। এছাড়া একজন শিক্ষার্থী সবগুলো শিখন উদ্দেশ্য অর্জন করছে কিনা তা নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী যাচাই করা হয়। শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা, মৌখিক উপস্থাপন নেতৃত্বের বিকাশ, ব্যক্তি আচরণ, মূল্যবোধ, দায়িত্বশীলতা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা ইত্যাদি উন্নয়নে ধারাবাহিক মূল্যায়নের গুরুত্ব অপরিসীম। এতে শিক্ষার্থীকে শিখনে সাহায্য করার লক্ষ্যে তাকে তার অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করা যায়।

৮.১.৪ প্রান্তিক মূল্যযাচাই

ICT শিক্ষণ ও শিখনে মূল্যযাচাইয়ের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে প্রান্তিক মূল্যযাচাই আরও একটি অপরিহার্য অংশ। প্রান্তিক মূল্যযাচাই সাধারণত একটি ইউনিট/অধ্যায়ের পাঠদান শেষে নেয়া হয়ে থাকে। প্রান্তিক মূল্যযাচাই নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে নেয়া হয়ে থাকে-

- সম্পূর্ণ পাঠ্যক্রমের শিখনফল সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ ধারণা লাভের জন্য।
- শিক্ষার্থীরা পাঠদান শেষে কতটুকু শিক্ষা লাভ করতে পারল তা জানানোর জন্য।
- যে যে বিষয়ে বা বিষয়ের যে যে অংশে শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা রয়েছে তা জানানোর জন্য।
- পাঠ পরিকল্পনায় শিক্ষকদের দুর্বলতা কোথায় তা জানার জন্য।
- যে স্তরের শিক্ষার্থী সে স্তরের জন্য পাঠটি কতটুকু সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে তা জানার জন্য ।
- অভিভাবকদের রিপোর্ট দেয়ার জন্য।

যে যে পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর অর্জিত দক্ষতা মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে তা নিম্নে প্রদত্ত হলো:

- পাঠদান শেষে একটি পরীক্ষার মাধ্যমে।
- পাঠদান কালে সম্পন্ন করা কাজের মূল্যায়নের মাধ্যমে।
- পাঠদান শেষে অন্য ক্ষেত্রে আইসিটি ব্যবহার মূল্যায়নের মাধ্যমে।

প্রান্তিক মূল্যযাচাই আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয়ভাবেই হতে পারে।

৮.১.৫ শিখনযাচাই কাজের উন্নয়ন

মূল্যযাচাই করার পদ্ধতি পাঠ্যক্রমের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। মূল্যযাচাই কাজের উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজন ভালো মূল্যায়ন পদ্ধতি, ফলাফলের সাথে সম্পর্ক এবং সিলেবাসের নির্ধারিত কাঠামো অনুসরণ ইত্যাদির উপর জোর দেয়া উচিৎ। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ শিক্ষককে মূল্যযাচাইকরণ কাজ তৈরিতে সহায়তা করতে পারে–

- কাজটি শিক্ষণ-শিখন উপযোগী কি না।
- সিলেবাসের সাথে প্রদত্ত কাজটি সরাসরি সম্পর্কযুক্ত কি না ।
- ছাত্রদের যা করা উচিৎ তা প্রদত্ত কাজে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে কিনা।
- কাজটি যথাসময়ে সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব কিনা।

- কাজটি শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা প্রদর্শনে যথেষ্ট কিনা ।
- যে বিষয়গুলো যাচাই করা হবে তা মূল্যায়ন কাজটির মধ্যে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে কিনা ।
- কাজটি শিক্ষার্থীরদের ক্ষমতা প্রদর্শনের যথেষ্ট সুযোগ প্রদান করে কিনা ।
- প্রদত্ত কাজটি বাস্তব সম্মত কিনা ।
- কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার সব ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারবে কিনা ।
- কাজটি যে লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে তা যথার্থ হয়েছে কিনা ।
- ভিন্ন মতাবলম্বীদের জন্য কাজটি প্রযোজ্য হয়েছে কিনা ।
- কাজটি ইউনিট পাঠের স্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিনা ।
- কাজটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পরিস্কার ধারণা আছে কিনা ।
- যে স্তরের জন্য কাজটি নির্ধারণ করা হয়েছে, সে স্তরের সাথে কাজটির ভাষা ও গাণিতিক দক্ষতা সঠিক কিনা ।
- কাজটি প্রদত্ত সময়ে সম্পন্ন করতে না পারলে তা পুনরায় প্রদর্শনের সুযোগ দেয়া হয়েছে কিনা ।
- একই বিষয়ে শিক্ষার্থীকে ভিন্ন কাজ পছন্দ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে কিনা ।
- একই বিষয়ে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ভিন্ন একটি গ্রুপে সমান ফলাফল লাভ করতে পারবে কিনা ।
- কাজটি শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ ও বোধগম্যভাবে বর্ণনা করা হয়েছে কিনা ।
- কাজটি শিক্ষার্থীদের দেয়ার পূর্বে এটি কোন্ পদ্ধতিতে করা হবে তা নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা ।

কোনো একটি কাজ উন্নয়ন শেষে যদি তা সম্পূর্ণরূপে ফলাফল লাভে সক্ষম না হয় সে ক্ষেত্রে তা পূর্ণ ফল লাভের জন্য পরিবর্তন /পরিবর্ধন করা যেতে পারে । মূল্যায়নের জন্য কোনো কাজ নির্ধারণের পূর্বে তা পাঠের লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম কিনা তা পরীক্ষা করা উচিৎ ।

৮.১.৬ নির্দেশিত কাজ

মূল্যযাচাই কাজের উন্নয়ন

লক্ষ্য: মূল্যযাচাই কাজের উন্নয়ন কীভাবে করা যায় সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারা ।

সংগঠন ও পদ্ধতি : প্রথমত প্রয়োজনীয় সংখ্যক আদর্শ দল গঠন করতে হবে । তন্মধ্যে প্রতিটি দল একজন দলনেতা নির্বাচন করবে । প্রত্যেক দল কাজ করার ধারা ও নির্দেশনাসমূহ নিজেরাই স্থির করে নিবে এবং প্রতিটি দল তাদের কাজ সম্পাদন করে একটি কমন সভার আয়োজন করবে । দলনেতা শিক্ষক প্রশিক্ষককে প্রতিবেদন প্রদান করবেন ।

কার্যপ্রণালী: নিচের ধাপসমূহ অনুসরণ করে প্রতিটি দল কর্ম সম্পাদন করবেন ।

১ । মূল্যযাচাই কাজের অধিকতর উন্নয়ন করার কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করবেন ।

২ । কর্মপত্র অনুযায়ী আরও উন্নয়নের জন্য কি কি যুক্ত করা প্রয়োজন?

ক্রমিক নং	বিবরণ

প্রদেয় সামগ্রী: প্রতিবেদন

সময়: তিন দিন

৮.২: ব্যক্তিগত ও বৌদ্ধিক দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের সাথে জড়িত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও লেখা, সতীর্থ পর্যালোচনা, অণুশিক্ষণ, সাদৃশ্যমূলক শিক্ষণ ও ফলাবর্তনের মাধ্যমে শিখনযাচাই কাজের পরীক্ষা করা

৮.২.১ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও লেখা

ICT শিক্ষণ-শিখনে মূল্যযাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা এবং লেখা অতিগুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর মাধ্যমে যাচাইকরণের উদ্দেশ্য অর্জিত হয় এবং সঠিক উত্তর পাওয়া সম্ভব। প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা ও লেখার মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও বৌদ্ধিক দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ ইত্যাদির প্রকাশ ঘটে। প্রশ্ন তৈরির পর তা সংশোধন করা যেতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রশ্নটি একটি পরিস্কার অর্থ বহন করে।

ICT শিক্ষণ-শিখনে মূল্যযাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রশ্ন জিজ্ঞাসাও লেখার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা উচিত:

- প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা ও লেখা সহজ ভাষায় এবং বোধগম্য হতে হবে।
- লেখা পরিস্কার এবং অর্থবহ হতে হবে।
- প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত হবে।
- প্রতিটি প্রশ্ন একটি ধারণাবহ হতে হবে।
- প্রভাবিত প্রশ্ন এড়িয়ে চলতে হবে।
- বিষয়ভিত্তিক সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রশ্ন হতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের উপযোগী প্রশ্ন হতে হবে।
- প্রশ্নের ধরণ এবং উত্তরের গঠন নির্ধারণ করতে হবে।

প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা ও লেখা ওপেন এবং ক্লোজ-এন্ডেড দু'ভাবেই হতে পারে। মূল্যযাচাইয়ের লক্ষ্য অর্জনের উপর ভিত্তি করে কোন্ ধরনের প্রশ্ন হবে তা পূর্বেই নির্ধারণ করতে হবে। মূল্যযাচাইয়ের উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৮.২.২ সতীর্থ পর্যালোচনা

ICT শিক্ষণ-শিখনে মূল্যযাচাইয়ের কাজের পরীক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে সতীর্থ পর্যালোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ে এর গুরুত্ব অপরিসীম। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রান্তিক মূল্যযাচাইয়ের এ পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। সতীর্থদের ছোট ছোট গ্রুপে কাজ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। এতে কাঙ্খিত ফলাফল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ঝুঁকি কমে এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

সতীর্থ পর্যালোচনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখা উচিৎ-

- পর্যালোচকগণ প্রদর্শনের জন্য আহ্বান করবেন এবং সময় নির্ধারণ করবেন। সাধারণত প্রদর্শন দু'ভাবে হয়ে থাকে: (ক) ছোট গ্রুপে; (খ) বড় গ্রুপে। যিনি প্রদর্শন করবেন তিনি তাঁর সেরা শিক্ষণ-কৌশল প্রদর্শন করবেন যাতে সতীর্থগণ শিখন সম্পর্কে প্রশ্ন এবং সমস্যা উত্থাপন করতে পারে। সাধারণত এ ক্ষেত্রে প্রদর্শন পরবর্তি সময়ে কথোপকথনের জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়।
- শিক্ষণ-শিখন বিষয়ে প্রদর্শক এবং পর্যালোচকের মধ্যে প্রদত্ত বিষয়, প্রেক্ষিত,অবস্থান সম্পর্কে শুরুতে আলোচনা হতে পারে।
- শিক্ষণ-শিখন বিষয়ে প্রদর্শক এবং পর্যালোচক শুরুতে ক্লাশরুম, সময়, ব্যাপ্তি, উদ্দেশ্য ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্বে অবগত হবেন। শিক্ষার্থীগণ ক্লাশে পর্যালোচকের উপস্থিতি সম্পর্কে অবগত থাকবে।
- সম্ভব হলে পরবর্তিতে শিক্ষণ-শিখন বিষয়ে আরও একটি আলোচনা হতে পারে, যেখানে পর্যালোচক একটি গঠনমূলক মতামত প্রদান করবে।
- পর্যালোচক আবার প্রদর্শকের ভূকিায় এবং প্রদর্শক আবার পর্যালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে পূর্বের ধাপগুলো অনুসরণ করবে।

সতীর্থ পর্যালোচনার সুবিধাসমূহ

- এটি শিক্ষার্থীকে স্বাধীন, দায়িত্বশীল ও অংশগ্রহণে আগ্রহী করে তোলে।
- এটি শিক্ষার্থীকে অন্যান্য সতীর্থদের কাজের সমালোচনা করতে শিখায়।
- এটি মূল্যযাচাইয়ের শর্তসমূহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে সাহায্যে করে।
- এটি শিক্ষার্থীদের ব্যাপক ফলাবর্তন (ফিডব্যাক) দিতে সহায়তা করে।
- শিক্ষককে নম্বর প্রদান কাজের বা গ্রেডিং করার ক্ষেত্রে সাহায্য করে।

সতীর্থ পর্যালোচনার অসুবিধাসমূহ

- এটি শিক্ষার্থীকে সতীর্থদের মূল্যায়নের ক্ষমতা হ্রাস করতে পারে ।
- মূল্যযাচাই নিরপেক্ষ নাও হতে পারে ।
- শিক্ষার্থী কাজটি গুরুত্ব সহকারে না নিলে কাংখিত ফলাফল অর্জন না-ও হতে পারে ।
- শিক্ষকের হস্তক্ষেপ ছাড়া শিক্ষার্থীরা একে অন্যকে ভুল বুঝতে পারে ।

নির্দেশিত কাজ

সতীর্থ পর্যালোচনার মাধ্যমে মূল্যযাচাই কাজের পরীক্ষা করা ।

লক্ষ্য: সতীর্থ পর্যালোচনার মাধ্যমে মূল্যযাচাই সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন ।

সংগঠন ও পদ্ধতি

প্রথমত প্রয়োজনীয় সংখ্যক আদর্শ দল গঠন করতে হবে । তন্মধ্যে প্রতিটি দল থেকে একজন দলনেতা নির্বাচন করতে হবে । প্রত্যেক দল কাজ করার ধারা ও নির্দেশনাসমূহ নিজেরাই স্থির করে নিবে এবং প্রতিটি দল তাদের কাজ সম্পাদন করে একটি কমন সভার আয়োজন করবে । দলনেতা শিক্ষক প্রশিক্ষককে প্রতিবেদন প্রদান করবেন ।

কার্যপ্রণালী

নিচের ধাপসমূহ অনুসরণ করে প্রতিটি দল কর্ম সম্পাদন করবেন ।

১ । সতীর্থ পর্যালোচনা কী তা উল্লেখ করবেন ।

২ । সতীর্থ পর্যালোচনার বিবেচ্য বিষয়সমূহ উল্লেখ করবেন ।

৩ । সতীর্থ পর্যালোচনার বিভিন্ন সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ উল্লেখ করবেন ।

প্রদেয় সামগ্রী: প্রতিবেদন

সময়: তিন দিন

৮.২.৩ অনুশিক্ষণ

অনুশিক্ষণ হলো একটি সম্মিলিত ব্যবহারিক শিক্ষা । এ পদ্ধতি একজন শিক্ষককে মূল্যযাচাইয়ের ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে । সাধারণত এটি একজন শিক্ষক প্রথম মূল্যযাচাইয়ের পূর্বে করে থাকেন । অনুশিক্ষণ হলো একটি দ্রুত, দক্ষ ও পরীক্ষীত পদ্ধতি যা শিক্ষকদেরকে মূল্যযাচাইয়ে আরও আত্মবিশ্বাসী করে তোলে ।

একটি বিষয়ের অথবা সমমানের বিষয়ের অন্তত ছয় জন শিক্ষক মিলে একটি অনুশিক্ষণ সেশন করা যায় । কোর্স প্রধান কিছু অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীরা এর সাহায্যকারী হতে পারে । এ পদ্ধতিতে একজনের পর অন্য এক জন শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে থাকে এবং অন্যান্যরা শিক্ষার্থীর ভূমিকা পালন করে থাকে । এ ক্ষেত্রে যাঁরা শিক্ষার্থীর ভূমিকা পালন করে তাঁরা যৌক্তিক প্রশ্ন-উত্তর করে থাকে । এ পর্ব ৫ থেকে ১০ মিনিট চলে । তারপর এর সমালোচনা চলে এবং শিক্ষক ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে সংশোধন করে নেন । প্রয়োজনে উক্ত সেশন ভিডিও রেকর্ডিং করে রাখা যেতে পারে ।

মূল্যযাচাইয়ের পূর্বে যে বিষয়ে মূল্যযাচাই করা হবে সে বিষয়ের জন্য পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে কিছু উপকরণ তৈরি করে রাখা ভালো । নতুবা মূল্যযাচাইয়ের পূর্বে সতর্কতার সাথে সঠিক চিন্তা করে নেয়া ভালো । একটি মূল্যযাচাই অনেকভাবেই করা যেতে পারে । যেটি সবচেয়ে বেশী উপযোগী তা-ই করতে হবে এবং এটি করাই অনুশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ।

৮.২.৪ সাদৃশ্যমূলক শিক্ষণ

সাদৃশ্যমূলক শিক্ষণ বা ছদ্মশিক্ষণ মূলত মূল্যযাচাই পরিকল্পনাকে পুন:গঠন এবং নিরীক্ষণের সুযোগ করে দেয় । এটি শিক্ষার্থীকে একটি বিষয়ের মূল্যায়নের ধরন সম্পর্কে বিশেষ বার্তা প্রদান করে । শিক্ষার্থীকে একটি বিষয়ে সাফল্য অর্জনের জন্য অবশ্য করণীয় কাজের সূত্র প্রদান করে । প্রতিটি শ্রেণির ভিন্ন মতাবলম্বী শিক্ষার্থীদের নিয়ে দৈবভাবে নির্বাচিত করে একটি সাদৃশ্যমূলক শিখন দল গঠন করা হয় । এই দলের সব শিক্ষার্থী অতিমাত্রায় মূল্যায়ন নির্ভর হয় । ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণকারীদের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ভালো হয় । সাদৃশ্যমূলক শিক্ষণ বা ছদ্মশিক্ষণের ফলে একজন শিক্ষক তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতি ও মূল্যযাচাই পদ্ধতি সম্পর্কে আরও গভীর ধারণা লাভ করে । যদিও বিষয়ের উদ্দেশ্য, শিক্ষার্থীদের কর্মপরিধি এবং ফলাবর্তন এর উপর উপযুক্ত সমতা স্থাপন করা শিক্ষকের অবশ্য করণীয় ।

৮.২.৫ ফলাবর্তন

শিক্ষার্থীরা একটি পাঠে একই ধরণের ভুল যাতে পুনরায় না করে এবং প্রতিটি প্রদক্ষেপে যাতে উন্নতি লাভ করে সে জন্য ফলাবর্তন সাহায্যে করে থাকে। যদি শিক্ষার্থীরা পাঠের মাঝে ফলাবর্তন না পেয়ে থাকে তাহলে তাঁরা এর কোনো ফল ভোগ করতে পারেনা। সাধারণত শিক্ষার্থীরা পরবর্তী ধাপে যাওয়ার পূর্বে ফলাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করে। পরীক্ষাকে ফলাবর্তনের আওতায় নেয়া যায় না। কেননা এটি পাঠের শেষে থাকে এবং শিক্ষার্থীদের ভুল সংশোধনের সুযোগ থাকে না।

শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চমানের ফলাবর্তন নিচের তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল-

- যে বিষয়ের উপর মূল্যযাচাই করা হবেতাঁর উপর স্বচ্ছ ধারনা থাকতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের কাজের পরিধির মধ্যে বিস্তারিত এবং সুস্পষ্ট মন্তব্য থাকতে হবে।
- মন্তব্যে অগ্রগতির দিক নির্দেশনা থাকতে হবে।

৮.৩: শিখনযাচাইয়ের উদ্দেশ্যে শিক্ষাক্রমের নির্দিষ্ট পাঠ/শিরোনাম শিক্ষণের পর্যালোচনার পরিকল্পনা

মূল্যযাচাই এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখনফল যাচাই করা হয় এবং যার মাধ্যমে কীভাবে শিখনফল অর্জন করা যায় সে ব্যাপারে ধারণা করা হয়। মূল্যযাচাই প্রক্রিয়াতে কখন এবং কীভাবে নির্ধারিত সময়ে শিক্ষাক্রমের নির্দিষ্ট পাঠ/শিরোনামের উপর শিক্ষার্থীর শিখনফল যাচাই করা হবে তার বিবরণ থাকতে হবে। শিক্ষাক্রমের নির্দিষ্ট পাঠ/শিরোনামের মূল্যযাচাইয়ের পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণিত থাকতে হবে-

১। শিক্ষাক্রমের পাঠের কিছু মূল্যযাচাইয়ের কাজ শুরুতে নির্ধারণ করতে হবে। সম্ভাব্য উপায় হচ্ছে-
- একই পাঠে পূর্বে যে মূল্যযাচাই কাজ দেয়া হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি করা।
- ছাত্রাবস্থায় শিক্ষক যে যাচাইকরণ কাজ করেছিল তাঁর পুনরাবৃত্তি করা।
- পাঠ্যপুস্তক বা সহায়ক পুস্তকে বর্ণিত কাজটি করা।
- বিদ্যালয়ের প্রচলিত মূল্যযাচাইকরণ কাজ অনুসরণ করা।
- অন্য প্রতিষ্ঠানের একই পাঠে প্রচলিত যাচাইকরণ কাজ অনুসরণ করা।

২। মূল্যযাচাইয়ের কাজটির দুটি উদ্দেশ্য থাকতে হবে;
(১) পাঠটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান নিরুপন এবং (২) শিক্ষার্থীকে পাঠে সাহায্যে করা।

৩। মূল্যযাচাইয়ের প্রক্রিয়াতে বিভিন্ন প্রকার কাজ বিভিন্নভাবে সম্পন্নকরতে দেয়া উচিৎ। উদাহরণ স্বরূপ:
- কাজটি একটি সেমিস্টার চলাকালীন সময়ে বা সেমিস্টারের পরে করতে হবে।
- কাজটি শ্রেণিকক্ষে এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরে হতে পারে।
- কাজটি পরীক্ষা পরিবেশে সম্পন্ন হতে পারে।
- কাজটি শিক্ষার্থী এককভাবে বা দলবদ্ধভাবে করতে পারে।

৪। মূল্যযাচাইয়ের প্রক্রিয়াটি মূল উদ্দেশ্য অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ করতে হবে। যেমন: শিক্ষার্থীকে কাজের ফল প্রদানের মাধ্যমে, শিক্ষার্থীর শিখনের ফলাবর্তনের মাধ্যমে অথবা উভয় প্রক্রিয়ায়।

৫। কাজটির মাধ্যমে কোন্ ক্ষেত্রে মূল্যযাচাই করা হচ্ছে তা বর্ণনা করতে হবে।

৬। কোর্সটির মূল্যযাচাইয়ের প্রক্রিয়াতে একটি ছকের মাধ্যমে উল্লেখিত সব তথ্য থাকতে হবে।

নিচে একটি নির্দিষ্ট পাঠ /শিরোনাম শিখনের পর্যালোচনার পরিকল্পনার ছক দেয়া হলো। শিক্ষার্থীগণকে একটি বিষয় নির্বাচন করে দিয়ে তাঁদেরকে উক্ত বিষয়বস্তুর উপর পর্যালোচনার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করতে দেওয়া যাবে।

পর্যালোচনার পরিকল্পনার ছক

পাঠের শিরোনাম	
বিষয় পরিধি:	
পাঠের উদ্দেশ্য:	
পাঠের সময়:	
পাঠের স্থান:	
পাঠের পরিবেশ	
মূল্যযাচাই কীভাবে হবে? এককভাবে নাকি গুচ্ছ করে	
মূল্যযাচাই পদ্ধতি	১। ২। ৩।
মন্তব্য:	

নির্দেশিত কাজ

মূল্যযাচাইয়ের উদ্দেশ্যে শিক্ষাক্রমের নির্দিষ্ট পাঠ/শিরোনাম শিক্ষণের পর্যালোচনার পরিকল্পনা ।

লক্ষ্য: শিক্ষণের পর্যালোচনার পরিকল্পনা তৈরি করতে শেখা ।

সংগঠন ও পদ্ধতি

প্রথমত প্রয়োজনীয় সংখ্যক আদর্শ দল গঠন করতে হবে । তন্মধ্যে প্রতিটি দল থেকে একজন দলনেতা নির্বাচন করতে হবে । প্রত্যেক দল কাজ করার ধারা ও নির্দেশনা সমূহ নিজেরাই স্থির করে নিবে এবং প্রতিটি দল তাদের কাজ সম্পাদন করে একটি কমন সভার আয়োজন করবেন । দলনেতা শিক্ষক প্রশিক্ষককে প্রতিবেদন প্রদান করবেন ।

কার্যপ্রণালী

নিচের ধাপসমূহ অনুসরণ করে প্রতিটি দল কর্ম সম্পাদন করবেন ।

১ । পর্যালোচনার পরিকল্পনার ছক অনুসারে প্রত্যেকটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করবেন ।

২ । অ্যাডভান্স আইসিটি কোর্সের যে কোনো একটি বিষয়ের উপর একটি নমুনা ছক তৈরি করবেন ।

প্রদেয় সামগ্রী: প্রতিবেদন ।

সময়: পাঁচ দিন ।

প্রশ্নাবলি

১ । মূল্যযাচাই কী? ব্যাখ্যা করুন ।

২ । গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের সুবিধা এবং অসুবিধাসমূহ কী?

৩ । অ্যাডভান্সআইসিটি শিক্ষণ-শিখনে মূল্যযাচাইয়ের সতীর্থ আলোচনায় বিবেচ্য বিষয়সমুহ কী?

৪ । অ্যাডভান্সআইসিটি শিক্ষণ-শিখনের ফলাবর্তনের জন্য বিবেচ্য বিষয়সমূহ কী?

৫ । শিক্ষাক্রমের নির্দিষ্ট পাঠ /শিরোনামের মূল্যযাচাইয়ের পরিকল্পনায় কোন্‌কোন্ বিষয় থাকা উচিৎ?

৬ । নিচের একটি প্রজেক্ট-এর কাজ প্রদত্ত হলো ।

এমএস স্প্রেডশীট প্রোগ্রামের সাহায্যে প্রজেক্টটি সম্পন্ন করুন:

Make a bar chart with the following data and add more rows to observe the chart

Age group	Annual Income
30-40	5,00,000.00
40-50	7,50,000.00
50-60	6,00,000.00

উপরোক্ত তথ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে নিম্নলিখিত কাজগুলো করতে দিন–

১. উপরোক্ত ডাটা দিয়ে আর কি কি গ্রাফ বা চার্ট তৈরি করা যেতে পারে?
২. উপরোক্ত তথ্য সম্পূর্ণভাবে উপস্থাপনের জন্য কোন্ চিত্রটি যথাযথ হবে?
৩. গ্রাফ বা চার্টটিকে কীভাবে ওয়ার্ড প্রসেসিং প্যাকেজে ব্যবহার করা যেতে পারে?
৪. গ্রাফের রং কীভাবে পরিবর্তন করা যায়?

তথ্যসূত্র

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা ।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ বিস্তরণের শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা ।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষণ. (২০১০). টিকিউআই-প্রকল্প, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা ।

ড. শেখ আমজাদ হোসেন. (২০০৭). *শিখন, মূল্যযাচাই ও প্রতিফলনমূলক অনুশীলন*. প্রভাতী লাইব্রেরি, ঢাকা ।

অধ্যায় ৯ : ICT ক্লাসে সকল শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণের উপায়

আলোচিত বিষয়বস্তুসমূহ:

৯.১ শ্রেণির কাজে শিক্ষার্থীর নিজস্ব কম্পিউটার সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োগে সক্ষম করে তোলা, শিক্ষার্থীদের বিদ্যমান ধারণা সনাক্তকরণ ও সুস্পষ্টকরণে গঠনকালীন শিখনযাচাইয়ের ব্যবহার

৯.২ শিখন সক্ষমতা বৈচিত্র্যের অবতারণা; দলগত কাজ, সতীর্থ শিখন, বর্ধিত কার্যক্রম, অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও অর্জন নির্ণয়

৯.৩ ছেলে ও মেয়ে উভয় শিক্ষার্থীর আগ্রহের সৃষ্টি ও শিখনে সহযোগিতার পরিকল্পনা, অণুশিক্ষণ, সাদৃশ্যমূলক শিক্ষণ ও ফলাবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষণ পদ্ধতি ও পরিকল্পনার পরীক্ষাকরণ

অধ্যায় ৯

ICT ক্লাসে সকল শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণের উপায়

বর্তমান যুগে শিক্ষার ক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহারের বিকল্প নেই। এতে ব্যবহারিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। আর এ জন্যই প্রতিটি শিক্ষার্থীর নিজস্ব কম্পিউটার থাকা আবশ্যক। শিক্ষার্থীদের ক্লাসে কম্পিউটার ব্যবহারের জন্য একটি ভিন্ন উপযোগী পরিবেশ সম্পন্ন কম্পিউটার ল্যাব থাকা প্রয়োজন। আধুনিক সুবিধা সংযোজন করে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এটি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা উচিৎ। এটি লক্ষ্য রাখতে হবে যে প্রতিটি শিক্ষার্থীই যেন একটি কম্পিউটারে এককভাবে বসে তাঁর বিষয়গুলো আয়ত্ব করতে পারে। ল্যাবে ইন্টারনেট কানেকশনসহ অত্যাবশ্যকীয় হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার থাকা বাঞ্ছনীয়। এছাড়াও ল্যাবে শিক্ষার্থীদের প্রবেশাধিকার অবাধ হওয়া প্রয়োজন। মোট কথা ল্যাবের পরিবেশ অবশ্যই শিক্ষার্থীদের ভীষণভাবে আকৃষ্টকারী হতে হবে। লক্ষ্যণীয় যে, ল্যাবে স্বাস্থ্যহানিকারক যন্ত্রপাতির অবস্থান অনভিপ্রেত। এছাড়াও ল্যাবে ধূমপান ও খাওয়া-দাওয়া বর্জনীয় হওয়া উচিত। ল্যাবের ভিতর ধূলাবিহীন ও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ হওয়া যুক্তিযুক্ত। এটি সম্ভব না হলে প্লাস্টিকের ম্যাট স্থাপন করে ধূলাবালিমুক্ত এবং অপেক্ষাকৃত শীতল রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। নিজস্ব কম্পিউটারে অপারেটিং সিস্টেম হিসাবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে উইন্ডোজ থাকা ভালো। তাঁর কাজের জন্য মাইক্রোসফট অফিস অবশ্যই থাকতে হবে। এছাড়াও গান, কথা ইত্যাদি রেকর্ড করা এবং শোনার জন্য মিউজিক এডিটিং এবং রেকর্ডিং সফটওয়্যার থাকতে হবে। ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য ইন্টারনেট কানেকশন থাকা উচিৎ এবং ওয়েব সাইট ব্রাইজিং এর জন্য ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার বা অন্য কোনো ব্রাউজার থাকতে হবে। হাজার হাজার ছবি সম্বলিত ক্লিপ আর্ট প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীর কম্পিউটারে ইনস্টল করা থাকতে পারে যাতে শিক্ষার্থী তাদের ডকুমেন্ট-এ প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারে। লেখচিত্র, বারগ্রাফ, পাইচার্ট ইত্যাদি তৈরি করার জন্য বিভিন্ন রকমের গ্রাফিক্স সফটওয়্যার থাকতে পারে।

৯.১: শ্রেণির কাজে শিক্ষার্থীর নিজস্ব কম্পিউটার সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োগে সক্ষম করে তোলা, শিক্ষার্থীদের বিদ্যমান ধারণা সনাক্তকরণ ও সুস্পষ্টকরণে গঠনকালীন শিখনযাচাইয়ের ব্যবহার

কম্পিউটারের যে অংশ দেখা যায় এবং স্পর্শ করা যায় সেই অংশকে হার্ডওয়্যার বলে। কম্পিউটার কতকগুলো যন্ত্রাংশের সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে। এই যন্ত্রাংশগুলোকে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার বলা হয়। এই হার্ডওয়্যারগুলো কখনো সিপিইউ-এর সাথে অন্তর্ভূক্ত থাকে আবার কখনো কোনো উপায়ে সিপিইউ-এর সাথে যুক্ত থাকে। এই যন্ত্রাংশ দ্বারা কম্পিউটার তৈরি হলেও উহা সচল করতে সফ্টওয়্যারের প্রয়োজন হয়ে থাকে।

কম্পিউটার সংগঠনের প্রধান অংশ

কম্পিউটার সংগঠন বলতে এর কাঠামোগত রূপ বা হার্ডওয়্যারকেই বুঝায়। হার্ডওয়্যার মানে কম্পিউটার সাংগঠনিক সকল যন্ত্রপাতি। কম্পিউটার সংগঠনের প্রধান অংশ তিনটি:

১. ইনপুট (Input); ২.প্রসেসিং ইউনিট (Processing Unit); ৩. আউটপুট (Output).

হার্ডওয়্যার

কম্পিউটারের যেসব উপকরণসমূহকে 'ধরা' যায় সে সব যন্ত্রাংশসমূহকেই একত্রে হার্ডওয়্যার বলে।

Clements (2006) এর মতে: A computer's hardware includes all the physical components that make up the computer system. These components range from the CPU to the memory and input/output devices.

কম্পিউটারের প্রধান হার্ডওয়্যারসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: সিপিইউ, মনিটর, কিবোর্ড, মাউস, প্রিন্টার, স্ক্যানার, স্পিকার ইত্যাদি। এসব হার্ডওয়্যার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিচে দেয়া হলো:

সিস্টেম ইউনিট: সিস্টেম ইউনিট কম্পিউটারের মস্তিষ্ক হিসেবে কাজ করে। বাক্সের মত দেখতে এই যন্ত্রাংশের মধ্যে থাকে মাদারবোর্ড, বিভিন্ন মেমোরি ডিভাইস, বিভিন্ন ধরণের কার্ড- ভিজিএ/এজিপি, সাউন্ড, নেটওয়ার্ক ইত্যাদি, পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট। যে ধাতব বাক্সটির মধ্যে যন্ত্রাংশগুলো থাকে তাকে 'কেসিং' বলে।

- সিস্টেম ইউনিটে প্রধান লক্ষণীয় বিষয় হলো এতে থাকে পাওয়ার বাটন। পাওয়ার বাটন  অন করে কম্পিউটার ওপেন করতে হয়।

- এতে থাকে সিডি/ডিভিডি রোম। কোনো সিডি বা ডিভিডি চালাতে হলে সিডি/ডিভিডি রোমের বাটনে  ক্লিক করলে একটি ট্রে ওপেন হবে। সেখানে সিডি/ডিভিডি ঢুকিয়ে আবার বাটনে ক্লিক করলে ট্রে বন্ধ হয়ে যাবে এবং সয়ংক্রিয়ভাবে তা চালু বা ওপেন হবে।

কিবোর্ড (Keyboard): কিবোর্ড ব্যবহার কওে কোনো ডকুমেন্ট টাইপ করা যায়। এছাড়া বিভিন্ন নির্দেশ দেয়ার ক্ষেত্রেও এটি ব্যবহৃত হয়। বাংলা টাইপ করার জন্য বাংলা অক্ষর সম্বলিত কিবোর্ড এবং 'অভ্র' নামক বিনামূল্যের একটি সফ্টওয়্যার ব্যবহার করা যেতে পারে। কি বোর্ডের বিশেষ কয়েকটি কি আমাদের বেশি ব্যবহার করতে হয়।

Source: http://6iee.com/data/uploads/25/376136.jpg

মাউস (Mouse): কম্পিউটারে বিভিন্ন কাজ করা বা নির্দেশ দেয়ার জন্য মাউস ব্যবহার করা হয়। মাউসে সাধারণত দুটি বোতাম থাকে: বাম ও ডান বোতাম। বলার সময় আমরা বেশি ব্যবহার করি Left button ও Right button কথাটি। ল্যাপটপের সাথে একটি টাচ্প্যাড যুক্ত করাই থাকে। তবে কাজের সুবিধার্থে ল্যাপটপের সাথে আলাদা মাউস ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া চাকার মতো Scrool button দিয়েও বেশ কিছু কাজ করা যায়।

মনিটর (Monitor): টিভির মত দেখতে যে যন্ত্রাংশ কম্পিউটারের যাবতীয় কাজকে ব্যবহারকারীর নিকট দৃশ্যমান করে তাকে বলে মনিটর। মনিটরে একটি পাওয়ার বাটন এবং মেনু বাটন থাকে। এক সময় সিআরটি মনিটর ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে এলসিডি ও এলইডি মনিটর ব্যবহৃত হচ্ছে।

মডেম (Modem): টেলিফোন লাইন, ক্যাবল বা ওয়্যারলেস দ্বারা ইন্টারনেটের সাথে সংযোগ করে তথ্য আদান প্রদানের জন্য যে ডিভাইসটি ব্যবহার করা হয় তা হলো মডেম। বর্তমানে সহজে বহনযোগ্য ও ব্যবহারযোগ্য **USB** মডেম বাজারে পাওয়া যায়।

মডেম

USB মডেম

প্রিন্টার (Printer): কম্পিউটারে প্রস্তুতকৃত কোনো তথ্য বা ডকুমেন্ট প্রিন্ট করার ক্ষেত্রে যে ডিভাইসটি ব্যবহার করা হয় তা হলো প্রিন্টার। সাধারণত তিন ধরনের প্রিন্টার ব্যবহার করা হয়। এগুলো হলো: ডট মেট্রিক্স, ইঙ্কজেট এবং লেসার।

ইউএসবি বা পোর্টেবল ড্রাইভ (USB or Portable Drive): এটিকে অনেকে পেন ড্রাইভ, ফ্লাশ ড্রাইভ, মেমোরি স্টিক বলে। এক কম্পিউটার থেকে কোনো ফাইল ইউএসবি ড্রাইভে কপি করে নিয়ে অন্য কম্পিউটারে স্থানান্তর বা ওপেন করা যায়। অর্থাৎ কম্পিউটার থেকে কম্পিউটারে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ইউএসবি ড্রাইভ বা পেন ড্রাইভ একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক। পূর্বে ২.০ ভার্সনের ইউএসবি ড্রাইভ ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে ৩.০ ভার্সনের ইউএসবি ড্রাইভ পাওয়া যাচ্ছে।

স্ক্যানার (Scanner): হাতে থাকা কোনো ছবি বা ডকুমেন্টকে কম্পিউটারে ডিজিটাল ফরম্যাটে সংরক্ষণ করার জন্য স্ক্যানার ব্যবহৃত হয়। এই ডিভাইসটি বিভিন্ন ডকুমেন্ট-এর প্রিন্টেড বা হার্ডকপির ছবি তুলে সেটিকে ইমেজ বা পিডিএফ ফাইল হিসেবে সংরক্ষণ করে থাকে।

স্পিকার **(Speaker):** যেসব কনটেন্ট-এ সাউন্ড আছে তা শোনার জন্য স্পিকার প্রয়োজন। ভিডিও ক্লিপ বা অডিও ক্লিপ যেমন: শিক্ষার্থীদের ইংলিশ উচ্চারণ শিখানো, ডায়ালগ, বিভিন্ন সাউন্ডযুক্ত অ্যানিমেটেড ক্লিপ, সংগীত প্রভৃতি শোনানোর জন্য স্পিকার ব্যবহার করা হয়। প্রায় সকল ল্যাপটপের সাথে স্পিকার বিল্ট-ইন অর্থাৎ সেট করাই থাকে। ডেস্কটপ কম্পিউটারের ক্ষেত্রে এটি আলাদা কিনতে হয়।

ইউপিএস (Uninterruptible Power Supply-UPS): নিরবিচ্ছিন্নভাবে কম্পিউটারে বিদ্যুৎ প্রবাহ সরবরাহ করার জন্য ইউপিএস ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় কম্পিউটারে কাজ করতে থাকা অবস্থায় বিদ্যুৎ চলে যেতে পারে। ইউপিএস সংযুক্ত না থাকলে হঠাৎ করে কম্পিউটার বন্ধ হয়। ফলে চলতি ফাইলটি মুছে যায়। এতে অনেক বিভ্রান্তিতে পড়তে হয়। ইউপিএস সংযুক্ত থাকলে ওপেন করা ফাইল সেভ করে কম্পিউটার সঠিকভাবে বন্ধ করার সময় পাওয়া যায়। এতে কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক ক্ষতির সম্মুখীন হয় না।

ওয়েব ক্যামেরা (Web Camera) : ওয়েব ক্যামেরা দিয়ে সরাসরি কম্পিউটারে ভিডিও বা ছবি ধারণ করা যায়। ধরুন ইন্টারনেটে কারো সাথে চ্যাট করছেন বা কথা বলছেন। এক্ষেত্রে ওয়েব ক্যামেরা থাকলে সরাসরি পরস্পরের ভিডিও চিত্র দেখতে পারেন। বর্তমানে প্রায় সকল ল্যাপটপের সাথেই ওয়েব ক্যামেরা সংযুক্ত থাকে। ডেস্কটপ কম্পিউটারের ক্ষেত্রে আলাদা ওয়েব ক্যামেরা কিনে নিতে হয়।

কম্পিউটার সফট্ওয়্যার (Computer Software)

কোনো সমস্যা সামাধানের জন্য কম্পিউটারের ভাষায় যে সারিবদ্ধ সুশৃঙ্খল নির্দেশ দেয়া হয় তাকে সাধারণ অর্থে প্রোগ্রাম বা সফ্টওয়্যার বলা হয়। কতকগুলো যন্ত্রাংশের সমন্বয়ে কম্পিউটার গঠিত হলেও তা কাজ করতে পারে না। তাই কম্পিউটারকে সচল করতে সফ্টওয়্যার প্রয়োজন হয়ে থাকে।

সফট্ওয়্যারের শ্রেণি বিভাগ (Classification of Software)

কম্পিউটার সফটওয়্যারকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

- সিস্টেম সফ্টওয়্যার (System Software/Operating System)
- এপ্লিকেশন সফ্টওয়্যার (Application Software)

এপ্লিকেশন সফটওয়্যার বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। যেমন :

- কাস্টমাইজড্ সফটওয়্যার (Customized Software)
- মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার (Multimedia Software)
- গ্রাফিক্যাল সফটওয়্যার (Graphical Software)
- ইন্টারনেট বেজড সফটওয়্যার (Internet Based Software) ইত্যাদি।

সিস্টেম সফট্ওয়্যার (System Software/Operating System)

যে সফ্টওয়্যার কম্পিউটার স্মৃতিতে স্থায়ীভাবে রাখা হয় তাহাকে সিস্টেম সফটওয়্যার বলে। কম্পিউটার নির্মাণকারী সংস্থা কম্পিউটার নির্মাণের সময় এই কাজ করেন। সিস্টেম সফটওয়্যার, এপ্লিকেশন সফটওয়্যার তৈরি করতে সাহায্যে করে। কম্পিউটারকে সচল করা, বিভিন্ন পেরিফেরালকে নিয়ন্ত্রণ করা, উচ্চতর ভাষায় লিখিত ব্যবহারিক প্রোগ্রামকে যন্ত্র-ভাষায় অনুবাদ করা ও স্মৃতিতে সংরক্ষণ, ব্যবহারিক প্রোগ্রামকে স্মৃতিতে পড়ে নেয়া ইত্যাদি কাজ সিস্টেম সফটওয়্যারের অন্তর্ভূক্ত। System Software কে ৬টি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলোর মধ্যে Operating System অন্যতম অংশ। সিস্টেম সফটওয়্যারের Utility Programe দ্বারা কম্পিউটারের Repair এর কাজ করা যায়।

এপ্লিকেশন সফট্ওয়্যার (Application Software)

যে সফ্টওয়্যার ব্যবহারকারীর ব্যবহারিক কাজের নিমিত্তে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তৈরি করা হয় তাকে Application Software বলে। তাছাড়াও ব্যবহারকারী নিজেই কম্পিউটারের ভাষা ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় যে কোনো সমস্যা সমাধান বা তথ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য এই ধরনের প্রোগ্রাম রচনা করতে পারেন। বড় কাজের প্রোগ্রাম রচনা করা খুব কঠিন ও সময় সাপেক্ষ বলে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত কম্পিউটার ব্যবহারকারী জটিল কাজের প্রোগ্রাম নিজেরা তৈরি করেন না। এই কাজে নিয়োজিত আছে বড় বড় প্রতিষ্ঠান। যারা এক একটি সর্বজন উপযোগী প্রোগ্রাম তৈরি করে কোনো সহায়ক স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে বাণিজ্যিক ভাবে বিক্রি করে। এ ধরণের প্রোগ্রাম ব্যবহারিক প্যাকেজ বা প্যাকেজ প্রোগ্রাম নামে পরিচিত। এ জাতীয় প্রোগ্রামগুলো বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য সর্বজন উপযোগী করে তৈরি হওয়ায় ব্যবহারকারীর সমস্ত চাহিদা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পূরণ নাও হতে পারে। উল্লেখযোগ্য প্যাকেজ প্রোগ্রামের মধ্যে ওয়ার্ড প্রসেসিং প্যাকেজ প্রোগ্রাম, স্প্রেডশীট প্যাকেজ প্রোগ্রাম ও ডাটাবেজ প্যাকেজ প্রোগ্রাম ইত্যাদি।

কাস্টমাইজড্ সফটওয়্যার (Customized Software)

বিভিন্ন বিনোদন মূলক সফ্টওয়্যার এর অন্তর্ভূক্ত। যেমন Game, Fun ইত্যাদি।

মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার (Multimedia Software)

যে সফটওয়্যার এর মাধ্যমে অডিও ও ভিডিও গান শুনতে পাই তা হলো Multimedia Software যেমন Jetaudio, Superdecoder, Xingplayer ইত্যাদি।

গ্রাফিক্যাল সফটওয়্যার (Graphical Software)

যে সফটওয়্যার Gaphics এর কাজ করতে সাহায্য করে তাকে Graphical Software বলে। যেমন Photoshop, Illustrator ইত্যাদি।

ইন্টারনেট বেজড সফটওয়্যার (Internet Based Software)

যে সফটওয়্যার এর মাধ্যমে ইন্টারনেটের কাজ করা হয় তা Internet Based Software বলে। যেমন Internet Explorer, Netscape Navigator ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীদের ICT তে বিদ্যমান ধারণা সনাক্তকরণ ও সুস্পষ্টকরণে গঠনকালীন শিখনযাচাই

ICT শিক্ষা সুসংহত সমাজ গঠন ও উন্নয়নের একটি মজবুত হাতিয়ার। ICT শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত জীবন কার্যক্রম পরিচালনা ও জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করা সম্ভব। ICT বিশ্বকে হাতের মুঠোয় এনেছে। ICT শিক্ষার মাধ্যমে বিশ্বকে জানা এখন একটি অতি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ICT বিষয়ক প্রচলিত ধারণায় কিছু ভ্রান্তি রয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের কারো কারো মধ্যে রয়েছে মান্ধাতা আমলের চিন্তা-চেতনা। এটি গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু গোড়ামিও রয়েছে। আরও রয়েছে এতদসংক্রান্ত যান্ত্রিক ভীতি। ICT শিক্ষা হচ্ছে মূলত Information and Communication Technology ব্যবহারের শিক্ষা লাভ। শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে আইসিটি'র ব্যবহার কী তা আমাদের জানা দরকার। আর সে বিষয়ে ধারনা লাভের জন্য আমাদের মধ্যে একটি জ্ঞানের মানদন্ড গ্রথিত করেছে।

শিক্ষার্থীদের বিদ্যমান ধারণা শনাক্তকরণের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর প্রশ্ন করা উচিৎ-

- শিক্ষার্থীদের আইসিটি টুলস সম্পর্কে ধারণা আছে কিনা।
- শিক্ষার্থীরা আইসিটি টুলস এর ব্যবহার জানে কিনা।
- বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেম সম্পর্কে তাদের ধারণা আছে কিনা এবং কীভাবে তা অপারেট, কনফিগার এবং কাস্টমাইজ করতে হয়।
- কীভাবে কম্পিউটারের সাধারণ আনুসংগিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয়।
- কীভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হয়।
- শিক্ষাক্ষেত্রে আইসিটি-এর ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা।
- চিকিৎসা ক্ষেত্রে এর ব্যবহার সম্পর্কে ধারনা।
- ব্যবসায় ক্ষেত্রে আইসিটি এর ব্যবহার সম্পর্কে ধারনা।

৯.২ শিখন সক্ষমতা বৈচিত্র্যের অবতারণা; দলগত কাজ, সতীর্থ শিখন, বর্ধিত কার্যক্রম, অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও অর্জন নির্ণয়

৯.২.১ দলগত কাজ

দলগত কাজ বলতে সম্মিলিত কাজকে বুঝায়। ছোট দল বলতে তিন, পাঁচ বা সাতের সমাহারকে বুঝায়। লক্ষণীয় যে, ছোট দলেরে সদস্যদের নিজেদের মাঝে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা সম্ভব হলেও দলের সদস্যদের মাঝে তা করা মোটেও সম্ভব নয়। দলগত কাজের সফলতা বা ব্যর্থতা কোনো একজনের উপর বর্তায় না, যেহেতু সকলেই এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত থাকেন।

একটি কার্যকর দলগত কাজের বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- ✓ দলগত গুণাবলী চিহ্নিতকরণ এবং শিক্ষার্থীদেরকে দলগত কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে সম্পুর্ণরূপে অবহিতকরণ।
- ✓ দলগত কাজ দেয়ার পূর্বে শিক্ষার্থীদের এ ধরণের পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে কিনা তা জেনে তা থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো।
- ✓ দলগত কাজের উদ্দেশ্য ও সুবিধাসমূহ শিক্ষার্থীদেরকে বিস্তারিতভাবে জানানো যাতে করে শিক্ষার্থীদের শিখনফল পুরোপুরি অর্জিত হয়।
- ✓ দলগত কাজ দেয়ার পূর্বে শিক্ষার্থীদেরকে তাদের দায়িত্ব এবং নিয়মাবলী সম্পর্কে অবহিত করতে হবে যাকে কেউ এককভাবে কাজ না করে সকলে মিলে সমন্বিতভাবে কাজটি সম্পন্ন করে।
- ✓ দলের সদস্য সংখ্যা ৩-৫ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

- ✓ দলগত কাজ শুরুর পূর্বে এমন সময় দিতে হবে যাতে করে দলের সব সদস্য একে অন্যের সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে পারে।
- ✓ দলগত কাজ দেয়ার পূর্বে দলের সকলে কীভাবে কাজ করবে তার উপর ধারণা দিতে হবে। যেমন-দল তৈরিকীভাবে করতে হবে, দলের সদস্যদের দায়িত্ব এবং নিয়মাবলী কি হবে, কীভাবে কাজটিকে কার্যকর করা যায়, দলের নেতা হবে, দলের সময় কে রক্ষা করবে, রিপোর্ট কে উপস্থাপন করবে ইত্যাদি।

দলগত কাজের সুবিধাসমূহ

- ✓ পাঠে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।
- ✓ কাজের মাধ্যমে শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি হয়।
- ✓ শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।
- ✓ শিক্ষার্থীরা পাঠে মনোযোগী হয়।
- ✓ পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা এগিয়ে যাবার সুযোগ লাভ করে।
- ✓ শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- ✓ শিক্ষার্থীদের চিন্তন শক্তি বিকশিত হয়।
- ✓ শিক্ষার্থীদের ভিতর নেতৃত্বের গুণাবলী বিকশিত হয়।
- ✓ জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত মজবুত হয়।
- ✓ শিক্ষার্থী - শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক - শিক্ষার্থী সম্পর্ক উন্নত হয়।
- ✓ শিক্ষার্থী - শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক - শিক্ষার্থী মিথস্ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়।

দলগত কাজের অসুবিধাসমূহ

- ✓ দলের মধ্যে অধিক মত সৃষ্টির ফলে গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে দলের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে।
- ✓ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দলগত কাজ শেষ নাও হতে পারে।
- ✓ মত ভিন্নতার কারণে আলোচনার গতিপথ পরিবর্তন হতে পারে।
- ✓ দলের সকলের সমভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত নাও হতে পারে।
- ✓ পারস্পরিক প্রভাব বিস্তার নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হতে পারে।
- ✓ দলগত কাজের জন্য অধিক জায়গার প্রয়োজন হতে পারে।

৯.২.২ সতীর্থ শিক্ষণ

সতীর্থ শিক্ষণ একটি যৌথ ব্যবস্থা যার মাধ্যমে একাধিকের সমাহার বিদ্যমান। বর্তমান যুগে শিক্ষার ক্ষেত্রে সতীর্থ শিক্ষণ ব্যবস্থার একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। এ ব্যবস্থায় অনেকের সমন্বিত চেষ্টার বহি:প্রয়োগ ঘটে। যার ফলে কোনো একজনের ব্যবস্থাপত্র কার্যকরী না হলেও কারো না কারো ব্যবস্থাপত্র অবশ্যই কার্যকরী এবং যুক্তিগ্রাহ্য হবে।

সতীর্থ শিক্ষণের সুবিধা

- ✓ জোড়ায় কাজ করার ফলে শিক্ষার্থীদের মাঝে পারস্পরিক সমঝোতা বৃদ্ধি পায়।
- ✓ পরস্পরের প্রতি সম্মান জাগ্রত হয়।
- ✓ এ পদ্ধতিতে বিভিন্নভাবে জোড়া গঠনের সুযোগ থাকে। যেমন- বয়স ও জেন্ডার অনুযায়ী।
- ✓ সমস্যা সমাধানের জন্য সহজে মতৈক্যে পৌছানো যায়।

সতীর্থ শিক্ষণের অসুবিধা

- ✓ সতীর্থ শিক্ষণে জোড়ায় সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে অনেক সময় পারস্পরিক দ্বিমতের কারণে সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পাদন করা কঠিন হয়ে যেতে পারে।

৯.২.৩ বর্ধিত কার্যক্রম

বর্ধিত কার্যক্রমে উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় আরও মনোযোগী এবং আগ্রহী করা যাতে করে তাদের যোগাযোগ এবং ব্যক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষার্থীরা বর্ধিত কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ফলে তাদের মনোবল বৃদ্ধি পায় এবং নতুন নতুন ধারণা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। শিখন সক্ষমতার বৈচিত্র্যের অবতারণার জন্য শিক্ষার্থীরা বর্ধিত কার্যক্রম অংশগ্রহণ করলে প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার সহায়ক হয়। তাঁরা জানতে পারে কীভাবে প্রযুক্তিকে নিজের জন্য, সমাজের জন্য ব্যবহার করা যায়।

বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের বাইরে যে সব কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় তা হলো বর্ধিত কার্যক্রম। নিচে এর কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

ক) সরাসরি আইসিটি সম্পৃক্ত -

- ✓ বিভিন্ন ধরনের ওয়েব সাইট ব্রাইজিং। যেমন- বিশ্বের নামকরা বিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট ভিজিট করা এবং তাদের কালচার সম্পর্কে জানা ইত্যাদি।
- ✓ অনলাইন শিক্ষামূলক খেলায় অংশগ্রহণ। যেমন: প্রোগ্রামিং প্রতিযোগীতায় অংশ নেয়া, বিভিন্ন কুইজ-এ অংশ নেয়া ইত্যাদি।
- ✓ নিজের বাসায় নেটওয়ার্ক স্থাপন করা।
- ✓ বিভিন্ন ধরণের আইসিটি কোর্সে অংশ নেয়া এবং এ বিষয়ক সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশ নেয়া।
- ✓ মাইক্রোসফ্ট পাওয়ার পয়েন্টে প্রেজেন্টেশনের জন্য বিভিন্ন রকমের টেমপ্লেট তৈরি করা।

খ) আইসিটি সম্পৃক্ত /সহায়ক অন্যান্য কর্মকান্ড-

- ✓ মিউজিক কম্পোজিশন এবং মিক্সিং
- ✓ ডিজিটাল ফটোগ্রাফি
- ✓ ডিজিটাল ভিডিও
- ✓ ই-শপিং

৯.২.৪ অগ্রগতি পরিবীক্ষণ

অগ্রগতি পরিবীক্ষণ হচ্ছে এমন একটি বিজ্ঞান নির্ভর অনুশীলন যা শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা পরিমাপ করে এবং নির্দেশনার কার্যকারিতা দেখে। অগ্রগতি পরিবীক্ষণ একজন শিক্ষার্থীর উপর বা সমগ্র ক্লাসের উপর করা যেতে পারে।

একটি নির্দিষ্ট সময়ে একজন শিক্ষার্থী কতটুকু দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্য ছিল এবং বর্তমানে কতটুকু অর্জন করতে পেরেছে তা পরিমাপ করাকেই অগ্রগতি পরিবীক্ষণ বলে। শিক্ষার্থীর প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা সাধারণত সপ্তাহিক ভিত্তিতে অথবা মাসিক ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীর কাংখিত এবং প্রকৃত অর্জনের হারের তুলনা করে তাঁর অগ্রগতি নির্ধারণ করা হয় এবং এর উপর ভিত্তি করে শিক্ষণের পদ্ধতি প্রয়োজন মত পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং পরিমার্জন করা হয় যাতে করে শিক্ষার্থীর অর্জন সঠিক থাকে।

অগ্রগতি পরিবীক্ষণের সুবিধা

- ✓ এর ফলে শিক্ষার্থী আরও যথোপযুক্ত শিক্ষণের নির্দেশনা পেয়ে থাকে যাতে করে অর্জনের হার সঠিক থাকে।
- ✓ এর ফলে অভিভাবকগণ তাঁর সন্তান সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারেন।
- ✓ শিক্ষকগণ তাঁর ছাত্রদের নিকট আরও ফলাফলের জন্য আশা করতে পারেন।

নির্দেশিত কাজ

শিখন সক্ষমতার বৈচিত্র্যের অবতারণার জন্য বর্ধিত কার্যক্রম

লক্ষ্য

- ✓ বর্ধিত কাজের মাধ্যমে ইন্টানেট ব্যবহার করে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার মান জানা
- ✓ গ্রাফ তৈরি করা

সংগঠন ও পদ্ধতি

প্রথমত প্রয়োজনীয় সংখ্যক আদর্শ দল গঠন করতে হবে। তন্মধ্যে প্রতিটি দল থেকে একজন দলনেতা নির্বাচন করতে হবে। প্রত্যেক দল কাজ করার ধারা ও নির্দেশনাসমূহ নিজেরাই স্থির করে নিবে এবং প্রতিটি দল তাদের কাজ সম্পাদন করে একটি কমন সভার আয়োজন করবে। দলনেতা শিক্ষক প্রশিক্ষককে প্রতিবেদন প্রদান করবেন।

কার্যপ্রণালী

নিচের ধাপসমূহ অনুসরণ করে প্রতিটি দল কর্ম সম্পাদন করবেন:

- ✓ বিভিন্ন ওয়েব সাইট ব্যবহার করে বাংলাদেশী ১০০০ টাকায় ইউ এস ডলারে কত হয়, কানাডীয়ান ডলারে কত হয়, ইন্ডিয়ান রুপীতে কত হয় খুঁজে বের করতে হবে।
- ✓ মাইক্রোসফট এক্সেলে গত ১০ দিনের টাকার সাথে ইউএস ডলারের মান বসিয়ে একটি গ্রাফ তৈরি করতে হবে।
- ✓ প্রতিবেদনে যে সব ওয়েবসাইট থেকে সহায়তা নেয়া হয়েছে তার বিবরণ দিতে হবে।

প্রদেয় সামগ্রী

ক) গ্রাফ সম্বলিত প্রতিবেদন

জমা দেবার সময়: তিন দিন

৯.৩ ছেলে ও মেয়ে উভয় শিক্ষার্থীর আগ্রহের সৃষ্টি ও শিখনে সহযোগিতার পরিকল্পনা, অণুশিক্ষণ, সাদৃশ্যমূলক শিক্ষণ ও ফলাবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষণ পদ্ধতি ও পরিকল্পনার পরীক্ষাকরণ

আইসিটি বিষয়ের কাজে অংশগ্রহণে ছেলে ও মেয়েদের সাম্য রক্ষা

আইসিটি বিষয়ে ছেলেদের/মেয়েদের কাজ বলে কোনো বিভেদ নেই। সামাজিকভাবে সৃষ্ট যেসব কাজে ছেলে-মেয়ে বিভেদ করা হয়ে থাকে, আইসিটি বিষয়ে তা দূর করতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সব মানুষের সমানভাবে উপকারী। এই বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা সকলের সমান অধিকার। তাছাড়া মেয়েদেরকে নির্দিষ্ট কতগুলো কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখলে তাঁরা সামগ্রিকভাবে আইসিটির সুফল ভোগ করতে পারবে না এবং তাদের শিখন অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। এ কারণে আইসিটি বিষয়ের সব কাজে ছেলে মেয়েদের সমান অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে। তাদেরকে ছেলে মেয়ে সমন্বয়ে দল গঠন করে একসাথে কাজ করে শিখনে উৎসাহ দিতে হবে। আইসিটি বিষয় সংশ্লিষ্ট সব কাজে ছেলে ও মেয়েদের দিয়ে পালাক্রমে সম্পাদন করার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে হবে।

শিক্ষক বা স্কুল কর্তৃপক্ষ অনেক সময় অজান্তেই অনিচ্ছাকৃতভাবে ছেলে ও মেয়েদের ব্যাপারে কিছু গতবাঁধা কাজ করে থাকেন। যেমন-

- ✓ প্রশ্ন-উত্তরের ক্ষেত্রে মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের প্রাধান্য দেয়া।
- ✓ মেয়েদের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কাজ এবং ছেলেদের যন্ত্রপাতির কাজ দেয়া।
- ✓ ভুল উত্তরের জন্য মেয়েদের সমালোচনা করা।
- ✓ সঠিক উত্তরে বা কাজের জন্য ছেলেদের পুরস্কৃত করা, কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে তা সবসময় না করা ।
- ✓ মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের বেশি দায়িত্ব দেয়া।
- ✓ পক্ষপাতদুষ্ট পাঠ্যবই ও অন্যান্য শিখন উপকরণ ব্যবহার করা।

কিন্তু শিখনে মেয়ে ছেলে বিভেদ বা বৈষম্য নেই। ছেলেরা সবসময় মেয়েদের চেয়ে বুদ্ধিমান বা মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে কম শিখতে পারে, এ ধারণা ঠিক নয়। জন্ম গ্রহণের সময় ছেলে ও মেয়েরা সমান ক্ষমতা নিয়ে আসে। কিন্তু পরবর্তীতে সমাজ সৃষ্ট জেন্ডার বৈষম্যর কারণে অনেক ক্ষেত্রেই মেয়েরা তাদের সহজাত মেধা ও ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এ কারণে আইসিটি বিষয় শিখনে

ছেলে ও মেয়েদের কাজে কোনো বিভেদ করা যাবে না। বরং ছেলে এবং মেয়েরা যেন একই সাথে সমান আগ্রহ নিয়ে আইসিটি বিষয়বস্তু আয়ত্ব করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এজন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে যত্নবান হতে হবে।

- ✓ আইসিটি বিষয়ের ক্লাসে ছেলে ও মেয়েদের মিলিয়ে দল গঠন করে দিয়ে দলগতভাবে শিখনে উৎসাহিত করতে হবে।
- ✓ দলনেতা নির্বাচন পালাক্রমে ছেলে ও মেয়েদের মধ্য থেকে নিতে হবে।
- ✓ কম্পিউটার কক্ষ পরিস্কার এবং যন্ত্রপাতি নিয়ে সব কাজ শিক্ষার্থীরা পালাক্রমে করবে।
- ✓ পিছিয়ে পড়া মেয়েদের এগিয়ে নিতে এবং তাদেরকে উৎসাহিত করতে নিয়মিতভাবে মেয়েদের দ্বারা নেতৃত্বমূলক কাজ করতে দিতে হবে।
- ✓ কোনো প্রশ্নের উত্তর ভুল করলে কাউকেই (ছেলে বা মেয়ে) লজ্জা না দিয়ে সহযোগিতার মাধ্যমে ভুল সংশোধন করে দিতে হবে।
- ✓ শ্রেণিতে বা ল্যাবরেটরিতে ছেলেদের কাজ বা মেয়েদের কাজ বলে কোনো কাজকে পৃথক করা যাবে না। বরং পর্যায়ক্রমে মেয়ে ও ছেলেকে একই কাজ করতে উৎসাহিত করতে এবং নির্দেশনা দিতে হবে।

আইসিটি বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও শিখন উপকরণ ছেলে মেয়ে সাম্য রক্ষা

অনেক সময় আমাদের শিক্ষাক্রমে বা শিখন উপকরণে অনিচ্ছাকৃতভাবে কুসংস্কার বা বৈষম্য চিহ্নিত হতে পারে। বিশেষ করে ছেলে ও মেয়েদের ভুমিকা বা ভিন্ন প্রেক্ষাপট এবং ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ নেতিবাচকভাবে প্রতিফলিত হতে পারে। অথচ মেয়ে ছেলে সবার মধ্যে রয়েছে সমান প্রতিভা ও সামাজিক দক্ষতা। কাজেই আমাদের শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা উপকরণ যত বেশি বিভিন্ন প্রেক্ষাপট এবং ক্ষমতা সম্পন্ন বা ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সবার কথা সমানভাবে তুলে ধরবে ততই তা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে এবং শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক হবে। মেয়েদের প্রতি এই বৈষম্যমূলক আচরণ আমাদের শিক্ষা ও শিখন উপকরণের অনেক ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। যখন মেয়েরা দেখে যে পাঠ্যপুস্তক ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের কম সক্রিয় দেখানো হয়েছে তখন তা তাদের অবচেতন মনে প্রভাব ফেলতে পারে। ফলে তুলনামূলকভাবে কঠিন বিষয় যেমন গণিত,বিজ্ঞান বা আইসিটি বিষয়ে মেয়েরা খারাপ ফল করতে পারে। মেয়েদের ধারণা হতে পারে এসব বিষয় তাদের জন্য নয় বরং এগুলো ছেলেদের বিষয়। এজন্য শিক্ষাক্রম প্রণয়নে লিঙ্গ সমতা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।

আইসিটি শিখনে জেন্ডার সচেতনতা প্রতিফলন

মেয়েদেরকে স্কুলে সাবলম্বী হতে ছেলেদের মত সমান সুযোগ দিতে হবে। এজন্যে শিক্ষকবৃন্দ এবং স্কুলের প্রশাসকদের নিচের বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে-

- ✓ শিখন উপকরণে কোনো ধরণের জেন্ডার পক্ষপাতিত্ব থাকলে তা দূর করতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি শিক্ষককে বিশেষভাবে সচেতন হতে ও উদ্যোগ নিতে হবে। পক্ষপাতদুষ্ট শিখন সামগ্রী চিহ্নিত করে তা কেন পক্ষপাতদুষ্ট এ নিয়ে শ্রেণিতে একটি গঠনমুলক আলোচনার সূত্রপাত করে তা সমাধানের চেষ্টা নিতে হবে।
- ✓ মেয়েরা বাড়িতে ঘর গেরস্থালির কাজের জন্য বা ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনা করার জন্য সময়াভাবে ক্লাসে নিয়মিতভাবে উপস্থিত না-ও থাকতে পারে। সেজন্য একটি শিথিল শিক্ষাক্রম ও স্ব-নির্দেশিত শিখন উপকরণ চালু করতে হবে। যেহেতু বেঁচে থাকার তাগিদে পরিবারের সবাইকে সবার সাহায্য করতে হয়, সেজন্য দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা স্কুলের কাজে সময় কম দিতে পারে। তাই স্কুলের সময়সীমার মধ্যে শিখন কাজ শেষ করতে চেষ্টা করতে হবে এবং বাড়ির কাজ করার ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে গুরুত্ব দিতে হবে।
- ✓ বেশির ভাগ বিদ্যালয়ে শিক্ষকেরা সাধারণত মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের সাথে বেশি কথা বলে, বেশি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে এবং বেশির ভাগ সময়ে ছেলেদের কাছ থেকে উত্তর গ্রহণ করে। এতে মেয়েরা ধীরে ধীরে সংকোচিত হয়ে যায়, তাদের মধ্যে জড়তা কাজ করে এবং পড়ালেখায় পিছিয়ে পড়ে। তাই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য সমতাভিত্তিক ও বাস্তবমুখী শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

এ সমস্ত প্রচেষ্টায় বাবা, মা ও অভিভাবক বা পরিচর্যাকারীদের সহযোগিতা প্রয়োজন হতে পারে। এ কারণে সহযোগিতার এ বিষয়সমূহ স্কুল কমিটির সভায় আলোচনা হওয়া উচিত এবং এ সংক্রান্ত বাস্তবসম্মত একটি কর্ম পরিকল্পনা থাকা উচিত। শৃঙ্খলাবোধ বা জেন্ডার পক্ষপাতিত্বের বিষয়টি স্কুল নীতিমালায় অন্তভুক্ত হলে স্কুলের সমস্ত শিক্ষক ও অভিভাবক তা অনুমোদন করলে স্কুলে মেয়ে এবং ছেলেদের সমতা ভিত্তিক শিখন পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

অনুশিক্ষণ

শাব্দিক অর্থে অনুশিক্ষণ হলো ক্ষদ্রাকারে সংগঠিত শিক্ষণ প্রক্রিয়া । এটি একটি বিশেষ শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া । শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার্থী দ্বারা শিক্ষক হিসেবে শিক্ষা লাভের অনুশীলনই হলো অনুশিক্ষণ । একজন শিক্ষক অনুশীলনের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে তাঁর পুরনো শিক্ষণ দক্ষতার উকর্ষ সাধন বা নতুন দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে পারেন ।

অনুশিক্ষণ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদানের কোনো পদ্ধতি নয়, বরং শ্রেণিকক্ষে কোনো বিষয়ের ওপর পাঠদানের পূর্বে দক্ষ শিক্ষক তৈরির একটি প্রক্রিয়া মাত্র । শ্রেণিকক্ষে কোনো বিষয়ের ওপর পাঠদানের সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখন উদ্দেশ্যে বিভক্ত করা হয় । বিভিন্ন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক সেই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখন উদ্দেশ্য অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জন করে থাকে । প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক পূর্বে নির্ধারিত একটি পাঠ বা বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত নির্দিষ্ট শিখন উদ্দেশ্যের ওপর পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন । আর শিক্ষণের সামগ্রীক আচরণের যে কোনো একটি মাইক্রো বা অণু যেমন- শিক্ষাদানকালে শিক্ষকের প্রকাশভঙ্গি, কণ্ঠস্বরের ওঠা-নামা, ভাষার প্রয়োগ, জ্ঞানের গভীরতা, হাতের লেখা, চিত্রাঙ্কন, প্রভৃতি একটি অণু হিসেবে নির্বাচন করে দক্ষতা উন্নয়ন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় ।

অনুশিক্ষণ এক ধরণের শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী নিদিষ্ট কয়েকটি দক্ষতা স্বল্প সময়ে, অপেক্ষাকৃত নিয়ন্ত্রিত শ্রেণির মাঝে পর্যায়ক্রমে অর্জনের সুযোগ পায় । শিক্ষক প্রশিক্ষণে অনুশীলন পাঠদান চলাকালে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় । নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিটি আচরণিক দক্ষতা অর্জনের জন্য অনুশীলন করানো হয় । এতে সাধারণত পাঁচ থেকে দশ জনের একটি ক্ষুদ্র দল গঠন করা হয় এবং প্রতিটি শিক্ষণ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য তিন থেকে পাঁচ মিনিট অনুশীলনের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের জন্য সময় নির্ধারিত হয় ।

অনুশিক্ষণ একটি আবর্ত বা চক্রাকারে সংগঠিত হয় । চক্রটি হলো-

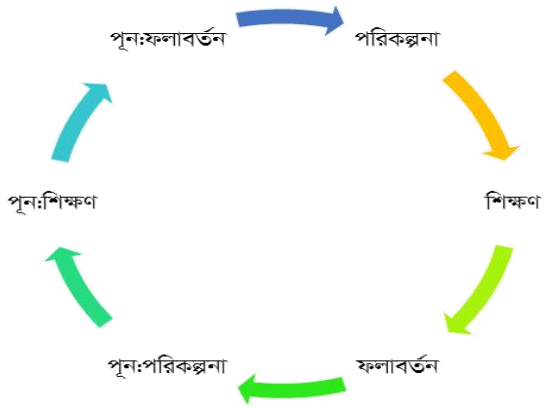

প্রতিটি চক্রে একটিমাত্র বিশেষ দক্ষতা অনুশীলন বা প্রশিক্ষণের জন্য নিদিষ্ট থাকে । তবে শিক্ষণ দক্ষতার পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভের জন্য এ চক্রের একাধিক প্রয়োগ হতে হবে । প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক নিজের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী আচরণিক দক্ষতা অর্জনের জন্য অনুশীলনের সুযোগ পান । অনুশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থী বিভিন্ন কৌশল ও দক্ষতা আয়ত্ব করতে পারে বলে শিক্ষা দান ক্ষেত্রে নিজের প্রতি আত্নবিশ্বাস জন্মে । অনুশিক্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্য অভিজ্ঞতা অর্জন করা নয় ।

অনুশিক্ষণ প্রক্রিয়াকে ব্যষ্টিক শিক্ষণ পদ্ধতি হিসেবেও অভিহিত করা হয় । ষাটের দশকে আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইক্রো টিচিং বা অনুশিক্ষণ শুরু হয় । অনুশিক্ষণকে কেউ কেউ অনুপাঠ দান হিসেবে অভিহিত করে থাকে ।

একটি বিষয়ের অথবা সমমানের বিষয়ের অন্তত ছয় জন শিক্ষক মিলে একটি অনুশিক্ষণ সেশন করা যায় । কোর্স প্রধান কিছু অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী'র সাহায্যকারী হতে পারেন । এ পদ্ধতিতে একজনের পর অন্য একজন শিক্ষকের ভুমিকা পালন করে থাকেন । এই পর্ব ৫ থেকে ১০ মিনিট চলে । তারপর এর সমালোচনা চলে এবং প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে সংশোধন করে নেন ।

পাঠদানের পূর্বে যে বিষয় পাঠ দান করা হবে সে বিষয়ের জন্য পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে কিছু উপকরণ তৈরি করে রাখা ভালো । নতুবা পাঠদানের পূর্বে সতর্কতার সাথে পাঠদানের সামগ্রিক দিক চিন্তা করা হবে, কীভাবে সম্পূর্ণ শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা করা হবে এবং কীভাবে শিক্ষার্থীদেরকে উক্ত পাঠে অংশগ্রহণ করানো যায় ইত্যাদি বিষয়গুলোও বিবেচনা করা প্রয়োজন । একটি পাঠ অনেকভাবেই দেয়া যেতে পারে । তবে যেটি সবচেয়ে বেশি উপযোগী তাই দিতে হবে এবং এটি করাই অনুশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ।

একটি অনুশিক্ষণ পাঠ তৈরি করার ক্ষেত্রে অবশ্যই নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে-

- ✓ এমন একটি বিষয় পছন্দ করতে হবে যা স্বাচ্ছন্দে একটি নির্দিষ্ট শিক্ষণ পদ্ধতিতে পাঠ দান করা যায় ।
- ✓ পাঠের উদ্দেশ্য অর্থাৎ পাঠ থেকে শিক্ষার্থীদের কী শেখানো হবে এবং কীভাবে শিক্ষণ পদ্ধতি সেই উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়তা করবে তা পূর্ব নির্ধারিত হতে হবে ।
- ✓ ফলাবর্তনের সময় সেশনে উপস্থিত সকলের নিকট থেকে তাদের মন্তব্য ও সমালোচনা আমলে নিতে হবে ।
- ✓ পুরো সেশনটি যাতে স্বত:স্ফুর্ত এবং প্রাণবন্ত হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে ।

পাঠ ঘোষণা

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জানা থেকে অজানা, মূর্ত থেকে বিমূর্ত ধারণার মাধ্যমে পাঠ শুরু করবেন । সহজ সরল ভাষায় আন্তরিকভাবে তিনি পাঠ শুরু করবেন । প্রয়োজনে সহজ উদাহরণ ও উপকরণ ব্যবহার করবেন । শিক্ষকের প্রেষণা সৃষ্টির উপর পাঠ ঘোষণা পর্বটি বহুলাংশে নির্ভর করে । শ্রেণি ও বিষয়ের প্রতি খেয়াল রেখে পরিকল্পিতভাবে প্রেষণা সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষক পাঠের ঘোষণা দিবেন । পাঠের শিরোনামটি বোর্ডে লিখে দিলে শিক্ষার্থীদের জন্য বুঝতে সুবিধা হয় ।

প্রশ্ন করার কৌশল

শিক্ষণ কাজে প্রশ্ন-উত্তর কৌশল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । কতগুলো বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করে থাকেন । এর উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে-

- ➢ শিক্ষার্থীর পূর্ব জ্ঞান যাচাই করা ।
- ➢ স্মরণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা ।
- ➢ চিন্তাশক্তির বিকাশ সাধন করা ।
- ➢ পাঠের প্রতি মনোযোগী করা ।
- ➢ শিখনফল লাভে মানসিকভাবে সব সময় প্রস্তুত রাখা ।
- ➢ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীর কৌতুহল সৃষ্টি করা ।
- ➢ পাঠের বিষয়বস্তু অনুসরণ করতে পারছে কিনা তা যাচাই করা ।
- ➢ সক্রিয় অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা ও তা ধরে রাখা ।
- ➢ শিক্ষার্থীর দুর্বলতা চিহ্নিত করা ।
- ➢ শিখন প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা লাভ করা ।

তবে প্রশ্ন-উত্তর কৌশলে শিক্ষার্থীকেও প্রশ্ন করার সুযোগ দেয়া হয় । শিক্ষার্থীকে সক্রিয় রাখা এবং পাঠের বিষয়বস্তু বোধ্যগম্য করে নেওয়ার জন্য এ সুযোগ দেওয়া হয় । শিক্ষণের একটি কৌশল হিসেবে শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করার সময় শিক্ষককে কয়েকটি বিষয় বিশেষ বিবেচনায় রাখতে হয় সেগুলো হলো-

- ✓ শ্রেণির সব শিক্ষার্থীকে উদ্দেশ্য করে প্রথমে প্রশ্ন করতে হবে । তারপর নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীকে প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞেস করতে হবে ।
- ✓ প্রশ্ন করার সময় সব শিক্ষার্থীর প্রতি সমান গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন ।
- ✓ প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের চিন্তা করার সময় দেওয়া প্রয়োজন ।
- ✓ সব সময় সহজ সরল ভাষায় প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে হবে ।
- ✓ প্রশ্ন হতে হবে স্পষ্ট ।
- ✓ শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ অভিজ্ঞতা বিবেচনায় রেখে প্রশ্ন করতে হবে ।
- ✓ প্রশ্ন পাঠের বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট হতে হবে ।
- ✓ একই সঙ্গে একাধিক প্রশ্ন করা ঠিক নয় ।
- ✓ প্রশ্ন সব সময় আনন্দদায়ক হওয়া প্রয়োজন ।
- ✓ স্বাভাবিক ভাব-ভঙ্গি বজায় রেখে প্রশ্ন করা বাঞ্চনীয় ।

সাদৃশ্যমূলক শিক্ষণ

ইংরেজী 'Simulate' শব্দ হতে "Simulation" এর উদ্ভব ঘটেছে । যার আভিধানিক অর্থ হলো ভান করা, ছদ্মরূপ ধারণ করা বা অনুকরণ করা । আর এটি যখন শিক্ষাদান বা Teaching-এর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তখন "Simulation Teaching" শব্দদ্বয়ের উৎপত্তি ঘটে । এটি বাস্তব অবস্থার কাছাকাছি কৃত্রিম অবস্থায় শিক্ষাদান পদ্ধতির একটি নবতর ধারণা ।

সাদৃশ্যমূলক শিক্ষণ বা ছদ্ম শিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি যা প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের পেশাগত প্রশিক্ষণের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় । আধুনিক শিক্ষাদান এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণে ছদ্ম শিক্ষণ এমন এক ধরণের পদ্ধতি বা প্রণালী যেখানে কোনো বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বা পাঠদানের জন্য বাস্তব অবস্থার কাছাকাছি কৃত্রিম অবস্থার সৃষ্টি করে এর মাধ্যমে বিষয়টির স্পষ্ট ধারণা দানের চেষ্টা করা হয়ে থাকে । অর্থাৎ একটি বাস্তব পরিবেশে শিক্ষক যেভাবে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করেন । ঠিক সেভাবে একটি কৃত্রিম পরিবেশে পাঠদান প্রক্রিয়াই সাদৃশ্যমূলক শিক্ষণ বা ছদ্ম শিক্ষণ ।

ছদ্ম শিক্ষণের অর্থ অনুরূপ অনুশীলন । তাই একে ভূমিকাভিনয় পদ্ধতি হিসেবেও অ্যাখ্যায়িত করা যেতে পারে ।

ICT শিক্ষণে সাদৃশ্যমূলক শিক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহার

এ পদ্ধতিতে শ্রেণি কক্ষের একটি কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করে একজন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক শিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন । এখানে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক শ্রেণি শিক্ষকের ভূমিকায় এবং অ্যান্য সতীর্থ প্রশিক্ষণার্থীরা ঐ সুনির্দিষ্ট শ্রেণির শিক্ষার্থীর ভুমিকা পালন করেন । এ কৃত্রিম শ্রেণিকক্ষে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক পদ্ধতি মাফিক পূর্ণাঙ্গ একটি ক্লাস নিবেন । শ্রেণিকক্ষে প্রশিক্ষক ছাড়াও অন্যান্য পর্যবেক্ষক থাকবেন । তাঁরা প্রত্যেকেই ক্লাসের মূল্যায়ন করবেন । মূল্যায়ন সীট ব্যবহার করে এ ধরণের মূল্যায়ন করবেন । মূল্যায়ন ছকটি ৫ স্কেলের হতে পারে এবং স্কেলটি বিভিন্ন পয়েন্টের হতে পারে । পাঠদানের পূর্বেই প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক প্রশিক্ষকের সাথে আলোচনা করে সুনির্দিষ্ট কৌশলগুলো ঠিক করে নিবেন যাতে কৌশলগুলোর মূল্যায়ন সুনিদিষ্ট হয় এবং কৌশলগুলোর উন্নয়ন সম্ভব হয় । পাঠদান চলাকালীন প্রশিক্ষক ও পর্যবেক্ষকগণ ডায়রি কিংবা কাগজের সীটে বিভিন্ন কৌশলে সবল ও দুর্বল দিক চিহ্নিত করবেন এবং মন্তব্য লিখবেন । পাঠদান শেষে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক পূর্বের নির্ধারিত কৌশলগুলোর ব্যাপারে তাঁর প্রশিক্ষক, পর্যবেক্ষক ও সতীর্থদের সামনে আত্মপর্যালোচনা করবেন । পরে সতীর্থদের সাথে মতামত বিনিময় করবেন এবং সতীর্থদের প্রশ্নের উত্তর দিবেন । সবশেষে পর্যবেক্ষক ও প্রশিক্ষক তাদের মতামত তুলে ধরবেন এবং গঠনমূলক পর্যালোচনা করবেন । তাঁরা সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয় ফিডব্যাক দিবেন যাতে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক পরবর্তী শিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা কালে দুর্বল দিকগুলো দূরীকরণে সচেষ্ট হন এবং সফল পাঠদানে সমর্থ হন । এ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীর প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব বজায় থাকা আবশ্যক ।

ICT শিক্ষণে সাদৃশ্যমূলক শিক্ষণের গুরুত্ব/ প্রয়োজনীয়তা

ICT শিক্ষণে সাদৃশ্যমূলক শিক্ষণ বা ছদ্ম শিক্ষণ যে সব কারণে গুরুত্বপূর্ণ বা প্রয়োজনীয় এর কিছু দিক নিচে উল্লেখ করা হলো–

- ✓ পূর্ণাঙ্গ ও ধারাবাহিকভাবে শিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ থাকে ।
- ✓ সুনির্দিষ্ট কৌশল নির্ধারণ করে পাঠদান করা হয় বিধায় কৌশলগুলোর যথাযথ উন্নয়ন সম্ভব ।
- ✓ শিক্ষক, সতীর্থ ও পর্যবেক্ষকদের মধ্যে সরাসরি ও গঠনমূলক পর্যালোচনা হয় বিধায় সবল ও দুর্বল দিক শনাক্ত করা সহজ হয় ।
- ✓ সরাসরি Feed Back পাওয়া যায় ।
- ✓ Feed Back এর ভিত্তিতে শিক্ষণ দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ থাকে ।
- ✓ মূল্যায়ন সীটে মূল্যায়ন করা হয় বিধায় শিক্ষকও তাঁর কার্যক্রমের পারদর্শিতা এক নজরে দেখতে পায় ।
- ✓ পর্যবেক্ষকগণ সীটে বা ডায়েরীতে মন্তব্য লিখেন বিধায় এগুলো প্রশিক্ষণার্থীর পরবর্তী উন্নয়নে কাজে লাগে ।
- ✓ কৃত্রিম উপায়ে যে কোনো সময়ে ক্লাস নেয়া যায় ।
- ✓ শিক্ষক, প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দমূলক সম্পর্ক গড়ে ওঠে ।

সাদৃশ্যমূলক বা ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নের উপায়

- ✓ সাদৃশ্যমূলক বা ছদ্ম শিক্ষণ কৌশলটি একটি গ্রুপে সম্পন্ন হয় । একটি গ্রুপে একজন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের ভূমিকা এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থীগণ শিক্ষার্থী ও পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন । সাদৃশ্যমূলক বা ছদ্ম শিক্ষণের সমগ্র কার্যক্রমটি প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের ভূমিকা প্রত্যক্ষণ ও ভূমিকাভিনয়ের একটি প্রশিক্ষণ হিসেবে পরিগণিত হয় ।
- ✓ এ পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষক দল প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের সবল ও দুর্বল দিক রেকর্ড করেন এবং শ্রেণিকক্ষে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের কাছে তা বিভিন্ন উপায়ে ব্যক্ত করেন যাতে তাঁর কার্যক্রম সম্পর্কে সঠিক ফলাবর্তন লাভ করা যায় ।
- ✓ সাদৃশ্যমূলক বা ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষণের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিকের সমন্বয় হওয়াতে প্রশিক্ষণার্থীর শিক্ষণ দক্ষতার উৎকর্ষ সাধন বা উন্নয়ন ঘটানো যায় । নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষণ সম্পন্ন করায় প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক এক দিকে যেমন শিক্ষণের বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তেমনি অন্যদিকে গঠনমূলক সমালোচকের অভিজ্ঞতাও অর্জন করেন ।
- ✓ এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক শুধুমাত্র শিক্ষকের ভূমিকা পালন ছাড়াও অন্য সময়ে পর্যবেক্ষক কিংবা শিক্ষার্থীর ভূমিকাতেও থাকেন । এ জন্যে সাদৃশ্যমূলক বা ছদ্ম শিক্ষণের অনুশীলন পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে শিক্ষকের জন্যে অত্যন্ত সহায়ক ।

শিক্ষণে ফলাবর্তনের গুরুত্ব

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ফলাবর্তনের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষাদানে বিভিন্নভাবে সফলতা আসে। যেমন-

- ✓ পাঠ অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।
- ✓ পাঠদানের অসুবিধা/ত্রুটি সম্পর্কে জানা হয়।
- ✓ শিক্ষার্থীদের মাঝে জানার আগ্রহ ও দলগত চেতনা বৃদ্ধি করে।
- ✓ যৌথভাবে কাজ করার মানসিকতা গড়ে ওঠে।
- ✓ শিক্ষক শিক্ষার্থী সম্পর্ক নিবিড় ও আন্তরিক হয়।
- ✓ শিখনফল অধিক স্থায়িত্ব লাভ করে।
- ✓ নিজের উন্নয়নের জন্যে ফলাবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে।
- ✓ প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী উভয়ের দক্ষতা বৃদ্বি পায়।
- ✓ অর্জিত শিখনফল জানা যায়।
- ✓ শিক্ষার্থীর মনোভাব জানা যায় ও চাহিদা নিরূপণ করা যায়।

ICT শিক্ষণ-শিখনে ফলাবর্তনের জন্য বিবেচ্য বিষয়

ICTশিক্ষণ-শিখনে ফলাবর্তনের জন্য বিবেচ্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপ-

- ✓ ফলাবর্তন দেয়ার সময় শিক্ষার্থী /প্রশিক্ষণার্থীর দুর্বলতার উপর গুরুত্ব না দিয়ে তাঁর সবল দিকগুলো উপস্থাপন করে প্রশংসা করা উচিত।
- ✓ দুর্বল দিকগুলো আস্তে আস্তে নিরুৎসাহিত করা উচিত ।
- ✓ শিক্ষক /পরিদর্শকের মন্তব্য হবে সুনির্দিষ্ট, গঠনমূলক ও সুস্পষ্ট।
- ✓ ফিডব্যাকের ভাষা হবে নির্দেশনামূলক, যেন শিক্ষার্থীর মধ্যে ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো সে নিজে উপলব্ধি করে এবং তা পরিমার্জনে সচেষ্ট হয়।
- ✓ ফলাবর্তনে মন্তব্য প্রদানকালে প্রশিক্ষণার্থীর মর্যাদায় আঘাত করা উচিৎ নয়।
- ✓ ফলাবর্তনের ভাষা বা মন্তব্য ইতিবাচক হওয়া বাঞ্চনীয়।
- ✓ শিক্ষার্থীকে এমনভাবে ফলাবর্তন দিতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর প্রেষণা, আগ্রহ ও আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং যার ফলে ভুল ধারণা সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি জন্মে এবং সে তা শুধরে নিতে পারে।
- ✓ শিক্ষকের মন্তব্যগুলো শিক্ষার্থীর খাতায় বা উত্তরপত্রে লেখা হলে শিক্ষার্থী সহজেই তা দেখতে পাবে এবং শিখন প্রক্রিয়ায় সে নিজেকে সেভাবে পরিচালিত করতে পারে।
- ✓ সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ফলাবর্তন প্রদানের জন্যে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পৃথক পৃথকভাবে তাদের কাজ নিয়ে আলোচনা করতে হবে এবং পরামর্শ দিতে হবে।

প্রশ্নাবলি

১। কম্পিউটার ব্যবহারের পরিবেশ সৃষ্টিতে ক্লাস রুমে কী কী হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার প্রয়োজন?

২। অগ্রগতি পরিবীক্ষণের সুফল কী?

৩। ICT বিষয়ে শিক্ষণ-শিখন কাজে ছেলে ও মেয়ে উভয় শিক্ষার্থীদের কীভাবে জেন্ডার সচেতন করা যায়?

৪। ICT বিষয় শিক্ষণে অনুশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

তথ্যসূত্র

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ বিস্তরণের শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষণ. (২০১০). টিকিউআই-প্রকল্প, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

ম. হাবিবুর রহমান. (২০০৩). *শিক্ষাকোষ*. প্রকাশক ঃ কম্পেডিয়াম অব এডুকেশন প্রজেক্ট, ঢাকা।

সুশীল রায়. (২০০৫). *শিক্ষণ ও শিক্ষা প্রসঙ্গ*. সোমা বুক এজেন্সি, কলিকাতা।

ড. শেখ আমজাদ হোসেন,. (২০১০). *শিখন, মূল্যযাচাই ও প্রতিফলনমূলক অনুশীলন*. প্রভাতী লাইব্রেরি, ঢাকা।

Clements, A. (2006). The Principles of Computer Hardware. London: Oxford University Press.

ইউনিট ১০: শিক্ষার্থীদেরকে ICT বিষয়ের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতকরণ

আলোচিত বিষয়বস্তুসমূহ:

১০.১ শ্রেণি অভীক্ষা ও অগ্রগতি অভীক্ষা প্রণয়ন ও নম্বর প্রদান, নম্বর প্রদানের মানদণ্ড এবং বিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়ন, নম্বর প্রদান সূচি, নম্বর প্রদান যাচাই ও সংশোধন

১০.২ শিক্ষার্থীদের ফলাফল সংরক্ষণ ও তাদের অর্জন পরিবীক্ষণএবং এসএসসি পরীক্ষার আইসিটি বিষয়ের প্রশ্নপত্র, অতীত ও নমুনা পরীক্ষা এবং স্বতন্ত্র প্রশ্ন পর্যালোচনা

ইউনিট ১০

শিক্ষার্থীদেরকে ICT বিষয়ের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতকরণ

শ্রেণি অগ্রগতি যাচাইয়ের জন্য শ্রেণি অভীক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় । শ্রেণি অভীক্ষার জন্য পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, নম্বর প্রদান সূচি, নম্বর প্রদান যাচাই ও সংশোধন ইত্যাদি সনাতন পদ্ধতিতে হয়ে আসছিল । বর্তমানে মূল্যায়নে পরিবর্তন এসেছে । এখন নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন হিসেবে বহুনির্বাচনী প্রশ্ন এবং সৃজনশীল উভয় প্রকারের প্রশ্ন সহকারে মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে । এছাড়া প্রতিটি বিষয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়নের বিশেষ করে শ্রেণিতে মূল্যায়ন করা হচ্ছে । অর্থাৎ প্রান্তিক মূল্যায়নের পাশাপাশি সামস্টিক মূল্যায়ন করা হচ্ছে । বছরে ২টি পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করে সান্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর সর্বাত্মক পরিচয়পত্র প্রদানের ব্যবস্থা করা হয় ।

১০.১ শ্রেণি অভীক্ষা ও অগ্রগতি অভীক্ষা প্রণয়ন ও নম্বর প্রদান, নম্বর প্রদানের মানদণ্ড এবং বিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়ন, নম্বর প্রদান সূচি, নম্বর প্রদান যাচাই ও সংশোধন

বর্তমানে শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো- শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের মাধ্যেমে তাঁর আচরণের কাঙ্খিত পরিবর্তন সাধন । এ ক্ষেত্রে আইসিটি শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম । আচরণের পরিবর্তন কতটুকু সাধিত হয়েছে তা নির্ণয় করা হয় শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের মাধ্যমে । শিক্ষার্থী মূল্যায়নের অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত মূল্যযাচাইয়ের একটি উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার হলো অভীক্ষা (Test) । অভীক্ষার ইংরেজি প্রতিশব্দ Test যার আভিধানিক অর্থ হলো Trail of the Qualities of person or a thing অর্থাৎ অভীক্ষা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির বা বস্তুর গুণগত মান যাচাই করা হয় ।

গুছিয়ে বললে, যে পরিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে বিশেষ ধরনের শিক্ষাগত বা মানসিক বৈশিষ্ট্য বা যোগ্যতা পরিমাপ করা হয়, তাকেই অভীক্ষা বলে । যে সকল উপকরণ বা হাতিয়ার বা কৌশলের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান, কৃতিত্ব বা পারদর্শিতা যাচাই করে তাদের পরস্পরের শিক্ষাগত পার্থক্য নিরুপণ করা হয়, তাদের শিক্ষামূলক অভীক্ষা বলে ।

১০.১.১ শ্রেণি অভীক্ষা:

শ্রেণি অভীক্ষার মূল কথা হচ্ছে- শিক্ষার্থী প্রতিদিন শ্রেণিতে যে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে তা থেকে শিক্ষার্থীদের অর্জন মূল্যায়ন কৌশল । শ্রেণি অভীক্ষা নতুন কিছু নয় । এটি গঠনমূলক মূল্যায়নের একটি ধরন । বিভিন্ন শিক্ষণ বিষয়ে অনেক শিক্ষকই তাঁদের শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি যাচাইয়ের জন্য নিয়মিত এই অভীক্ষা নিয়ে থাকেন । শ্রেণি অভীক্ষা বলতে মূলত লিখিত এবং অংকন বা সৃষ্টিমূলক কাজের পরীক্ষাকে বুঝায় । সাধারণত সিলেবাসের কোনো পরিচ্ছেদের শেষে পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায় শেষে বা কোনো ইউনিটের কাজের শেষে এই পরীক্ষা নেয়া হয় । ক্লাস চলাকালে বিষয় শিক্ষকগণ শ্রেণি অভীক্ষা নিয়ে থাকেন । এ পরীক্ষায় সকল শিক্ষার্থীকে অন্যের সহযোগিতা ছাড়াই এককভাবে প্রদত্ত প্রশ্ন/ প্রশ্নগুচ্ছের উত্তর/ নিজস্ব মতামত যুক্তিসহ উপস্থাপন করতে হয় । আমাদের বিদ্যালয়গুলোর আইসিটি বিষয়ের শ্রেণি অভীক্ষার কাজ মোটেই হয় না । যদিও কোনো কোনো বিদ্যালয়ে শ্রেণি অভীক্ষার কাজ চালানো হয় তা শুধু নামে মাত্র; শিক্ষার্থীর যথাযথ মূল্যায়ন হয় না । তাদের সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলও যথাযথ মূল্যায়ন করা হয় না । শুধু নামে-মাত্র বিষয়টি পড়ানো হয় ।

শ্রেণি অভীক্ষা শিক্ষার্থীদের চিন্তন দক্ষতার অগ্রগতি মূল্যায়ন করে । তাই এ অভীক্ষা প্রণয়নে তথা প্রশ্ন প্রণয়নে যে নীতিমালা রয়েছে তা কঠোরভাবে অনুসরণীয় । শ্রেণি শিক্ষক এমনভাবে অভীক্ষা পদ তৈরি করবেন যেন শিক্ষার্থীদের জ্ঞানীয় দক্ষতা, বৌদ্ধিক ও আবেগিক ক্ষেত্রে আচরণিক পরিবর্তন তথা অর্জিত শিখনফল মূল্যায়ন করা যায় ।

শ্রেণি অভীক্ষায় নানা ধরনের প্রশ্ন করা যেতে পারে; যেমন- বহুনির্বাচনী, সত্য-মিথ্যা, সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক, রচনামূলক, কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ইত্যাদি । শ্রেণি অভীক্ষা প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষককে সময় নিয়ে চিন্তা করে উন্নতমানের চিন্তা উদ্দীপক উচ্চমানের প্রশ্ন প্রণয়ন করা দরকার । যেমন 'একটি উন্নত মানের সফ্টওয়্যারের বৈশিষ্ট্য লিখ' এর বিকল্প প্রশ্ন হতে পারে 'একটি ভালো মানের সফ্টওয়্যারের সাথে একটি সাধারণ মানের সফ্টওয়্যারের তুলনা কর' ।

শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চিন্তন দক্ষতার অগ্রগতি মূল্যায়নের ক্ষেত্রসমূহ অর্থাৎ শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে যে সকল পারদর্শিতা মূল্যায়ন করা যেতে পারে তা নিম্নরূপ-

- শ্রেণি শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের অর্জিত শিখনফল স্মরণ করতে পারা।
- যা শিখছে তা অনুধাবন করতে পারা ও লব্ধ জ্ঞান নিজের ভাষায় প্রকাশ করতে পারা।
- তথ্যকে শ্রেণি বিন্যাস করতে পারা।
- তথ্য সংশ্লেষণের মাধ্যমে সারাংশ তৈরি করতে পারা।
- অর্জিত জ্ঞানকে নতুন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারা।
- কোনো বিষয়ে যুক্তিসহ নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারা।
- ভালো মন্দ ও মেধা-গুণ বিচারে বস্তু বা ঘটনার যথাযথ গুরুত্বারোপ-এর মাধ্যমে মূল্যবোধ জাগ্রত করা।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-এর মতে, প্রতিটি অধ্যায় শেষে শ্রেণি অভীক্ষা নেওয়া হবে। তবে অধিক নম্বর প্রাপ্ত অভীক্ষার নম্বর রেকর্ড রাখা হবে। শ্রেণি অভীক্ষার উত্তরপত্র শিক্ষার্থীকে দেখানোর পর ফেরত নিয়ে সংরক্ষণ করা হবে। যেসব বিষয়ে ব্যবহারিক কাজ আছে ঐসব বিষয়ে দু'টি ব্যবহারিক ও একটি লিখিত অভীক্ষার রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে। অন্যান্য বিষয়ে তিনটি লিখিত অভীক্ষার রেকর্ড রাখা হবে। ব্যবহারিক কাজের মূল্যায়নের মানদন্ড শ্রেণিতে সম্পাদিত ব্যবহারিক কাজের অনুরূপ হবে। শ্রেণি অভীক্ষা লিখিত বা ব্যবহারিক হবে। প্রতিটি শ্রেণি অভীক্ষা স্বল্প সময়ে নেওয়া হবে। সম্ভবমত বিষয়ের জন্য নির্ধারিত ক্লাস পিরিয়ডে নেওয়া হবে; নির্ধারিত এক ক্লাস পিরিয়ডের অতিরিক্ত সময় নেওয়া যাবে না।

প্রতিটি বিষয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও নম্বর বণ্টন :

ক্ষেত্র	নম্বর
ক. শ্রেণির কাজ	০৫
খ. বাড়ির কাজ ও অনুসন্ধানমূলক কাজ	০৫
গ. শ্রেণি অভীক্ষা	১০
মোট	**২০**

১০.১.২ অগ্রগতি অভীক্ষা

যে কোনো শিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষণ-শিখনের একটি নির্ধারিত পাঠ্যসূচিকে অনুসরণ করে পরিচালিত হয়। শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে মাঝে মধ্যে এবং কার্যক্রমের শেষে শিক্ষার্থীর শিক্ষার অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হয়। যে অভীক্ষা তথা প্রশ্নগুচ্ছের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হয় তাকে অগ্রগতির অভীক্ষা বলে। শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিখন অভিজ্ঞতা অর্জনের ফলে শিক্ষার্থী কতটুকু জ্ঞান অর্জন করছে এবং কী ধরনের মানসিকতা পোষণ করে তা যাচাই করা হয়। শিক্ষার্থীদের পাঠের অগ্রগতি যাচাই কার্যক্রম কখনো গঠনমূলক আবার কখনো সামষ্টিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করা হয়। উভয় প্রক্রিয়ার লিখিত, মৌখিক, রচনামূলক, সংক্ষিপ্ত বা নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের আলোকে করা হয়। অগ্রগতির অভীক্ষা প্রণয়নে শিক্ষককে উত্তম প্রশ্ন প্রণয়নের নীতি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হয়।

১০.১.৩ নম্বর প্রদানের মানদণ্ড

সকল ধরণের নৈর্ব্যক্তিক বিশেষ করে বহুনির্বাচনী বা শূন্যস্থান পূরণমূলক প্রতিটি প্রশ্নে এক নম্বর বরাদ্দ থাকে বিধায় এ ধরনের উত্তর মূল্যায়নে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হয় না। সমস্যাপূর্ণ ক্ষেত্র হলো রচনামূলক প্রশ্নের নম্বর বন্টন ও নম্বর প্রদান। প্রশ্ন প্রণয়নের

ক্ষেত্রে মূল বিবেচ্য হলো কতক্ষণ সময় পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত। প্রশ্নপত্রে নম্বর বন্টনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য উত্তর বিস্তৃতি, উত্তরের প্রকৃতি, কাঠিন্যের মাত্রা, সংশ্লিষ্ট ডোমেইন ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনার দাবি রাখে।

নিচে নম্বর প্রদানের একটি সম্ভাব্য মানদন্ড দেয়া হলো:

ক্রমিক	প্রশ্নের ধরন	অন্তর্ভূক্ত বিবষয়াবলী	নম্বর
১	স্মরণ করা	কে, কি, কোথায়, কোন্‌টি মূলক ইত্যাদি সংজ্ঞায়িত করা, নামকরণ করা, নির্দেশ করা	১
২	বুঝতে পারা	কেন, কীভাবে, সাদৃশ্য নির্ণয়, তুলনা করা, উদাহরণ দেওয়া	২
৩	প্রয়োগ করা	শ্রেণি বিন্যাস করা, ভাবসম্প্রসারণ করা, সর্বায়ন করা, বিশদ ব্যাখ্যা করা	৩
৪	বিশ্লেষণ করা	বিশ্লেষণ করা, পার্থক্য করা, ব্যাখ্যা করা, আলোচনা করা	৪
	মূল্যায়ন করা	যাচাই করা, গুরুত্ব নিরূপণ করা, তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা, মূল্যায়ন করা, বিবেচনা করা	
	সৃজন করা	প্রস্তাব করা, পরিকল্পনা করা, সংশ্লেষণ করা, মতামত দেওয়া	

১০.১.৪ বিদ্যালয়ের প্রশ্ন প্রণয়ন

বিদ্যালয়ের প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতি-

- প্রশ্নের ভাষা হবে সহজ ও শ্রেণি উপযোগী।
- প্রশ্ন হবে শিক্ষার্থীর চিন্তা উদ্দীপক ও প্রেরণা সৃষ্টিকারী। 'কেন', 'কীভাবে', 'কারণ কী', 'ব্যাখ্যা কর', 'বিশ্লেষণ কর', 'তুলনা কর' ইত্যাদি দ্বারা প্রশ্ন করা হলে চিন্তা করে উত্তর বের করতে হয়।
- যেসব প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' বা 'না' এমন প্রশ্ন না করাই ভালো। স্মৃতি নির্ভর প্রশ্ন যেমন 'কী', 'কে', 'কোথায়', 'কয়টি' বা 'কাকে বলে' ইত্যাদি প্রশ্ন যতটা সম্ভব পরিহার করা।
- পর্যায়ক্রমে এমনভাবে প্রশ্ন করা যেন প্রশ্নসমূহের উত্তর থেকে বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। প্রয়োজনে প্রশ্নোত্তরের মাঝে মাঝে আলোচনা করা।
- অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন (probing question) অর্থাৎ একটি প্রশ্নের উত্তর থেকে উদ্ভূত প্রশ্ন করে বিষয়ের পূর্ণতা আনা প্রয়োজন।

  যেমন:

  সাধারণ প্রশ্ন: বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতি কত?

  উত্তর : সাধারণ সময়ে ৮৫%, বিশেষ সময়ে ৫০%

  অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন: বিশেষ সময়ে কম কেন?

  উত্তর: ধান রোপণ ও ধান কাটার মৌসুমে ছেলেমেয়েদের অনেকে কৃষিকাজে অভিভাবককে সহায়তা করে তাই তারা বিদ্যালয়ে আসে না।

এসএসসিতে আইসিটি বিষয়ের তত্ত্বীয় পরীক্ষা কেবল বহুনির্বাচনী পরীক্ষার মাধ্যমে হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বহুনির্বাচনী পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়নের জন্য অনুসৃত নীতিমালা জানা আবশ্যক। বহু নির্বাচনী প্রশ্নের একটি উদ্দীপক (স্ট্যাম)/ নির্দেশনা (ইন্সট্রাকশন) থাকে এবং তার ভিত্তিতে কতগুলো বিকল্প উত্তর দেয়া থাকে। বিকল্প উত্তরসমূহের মধ্যে একটি সঠিক উত্তর এবং অপরগুলি বিক্ষেপক। এ বিক্ষেপগুলো সঠিক উত্তর নয়। এগুলো এমনভাবে প্রণয়ন করা হয় যেন পরীক্ষার্থীদের (যাদের বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেই) সেই সকল বিক্ষেপকের দিকে ধাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বহুনির্বাচনী প্রশ্নের উদ্দীপক তৈরিতে বিবেচ্য:

- প্রয়োজনীয় সব তথ্য সরবরাহ করা হবে;
- সহজ ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে হবে;
- অসঙ্গতিমূলক উপাদানমুক্ত হবে;
- প্রয়োজনীয় শব্দ অন্তর্ভুক্ত করা হবে (উত্তরসমূহে কোনো শব্দের পুনরাবৃত্তি থাকবে না);

- হ্যাঁ বোধক হতে হবে (আর 'না' বোধক শব্দের ব্যবহার অনিবার্য হলে শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমনভাবে লিখতে হবে) । যেমন: মোটা হরফে বা আন্ডার লাইন করে লেখা;
- এমন কোনো ইঙ্গিত দেওয়া যাবে না যাতে পরীক্ষার্থী উত্তরগুচ্ছ থেকে সঠিক উত্তর বাছাই করতে এবং ভুল উত্তর বাদ দিতে পারে ।

বিকল্প উত্তর তৈরিতে বিবেচ্য :

- বিষয়বস্তু এবং ব্যাকরণগত গঠনের দিক থেকে প্রশ্নের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে;
- প্রশ্নের অসম্পূর্ণ বাক্যকে অর্থপূর্ণ করে তুলবে;
- পরীক্ষার্থীদের দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে হবে (প্রতিটি বিকল্প উত্তর কমপক্ষে ৫% পরীক্ষার্থীর পছন্দ করার সম্ভাবনা থাকতে হবে);
- ক্রমানুযায়ী তালিকাভুক্ত হবে (সংখ্যাবাচক হলে);
- দৈর্ঘ্য প্রায় পরস্পর সমান হবে (বাক্যে শব্দ বেশি হলে তা সঠিক উত্তর হবার সম্ভাবনা থাকে);
- যথাসম্ভব কাছাকাছি উত্তর পরিহার করবে (প্রকৃতপক্ষে সে ক্ষেত্রে বিকল্প উত্তরের সংখ্যা কমে যায়);
- 'উপরের সবগুলো সঠিক'/ 'উপরের কোনোটি সঠিক নয়' এরূপ বাক্য যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে ।

একটি বহুনির্বাচনী প্রশ্নপত্রের বিভিন্ন প্রশ্নের বিকল্প উত্তর বা উত্তরগুচ্ছ সঠিক উত্তরের ক্রমিক সংখ্যা (সিরিয়াল নম্বর) এমনভাবে পরিবর্তন করতে হবে যেন সঠিক উত্তরের কোনো ধারাবাহিক ক্রম না থাকে ।

১০.১.৫ নম্বর প্রদানের সূচি

শিক্ষার্থী মূল্যায়নের নৈর্ব্যক্তিকতা রক্ষা করার লক্ষ্যে উত্তরপত্র নিরীক্ষণের পূর্বেই পরীক্ষকের নম্বর প্রদানের সূচি তৈরি করা প্রয়োজন । প্রশ্নপত্রে সাধারণত প্রশ্নের মান বন্টন করা থাকে । পরীক্ষক প্রশ্নে উল্লেখিত নম্বরের প্রেক্ষিতে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেন । প্রশ্নের প্রতিটি অংশের নম্বর যদি বিভাজন করা থাকে তবে নিরীক্ষণের জন্য সুবিধা হয় । অন্যথায় নিরীক্ষককে প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর আগে নির্ধারণ করে নম্বর বিভাজন করে নিতে হয় । এ ক্ষেত্রে নিরীক্ষককে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে নম্বর সূচি নির্ধারণ করতে হয়-

- বানান ভুলের জন্য নম্বর কাটা হবে কিনা;
- ভাষাগত ত্রুটির জন্য নম্বর কাটা হবে কিনা;
- উত্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চিত্রের জন্য কত নম্বর রাখা হবে;
- চিত্রের লেবেলিং এর জন্য নম্বর রাখা হবে কিনা;
- উত্তর উপস্থাপনের/ সংগঠনের মান (যেমন- ভূমিকা, মূল বিষয়, উপসংহার) যথার্থ আছে কিনা;
- প্রশ্নের সঙ্গে উত্তরের যথার্থতা আছে কিনা;
- সংজ্ঞার ক্ষেত্রে রেফারেন্স আছে কিনা ইত্যাদি ।

১০.১.৬ প্রদত্ত নম্বর যাচাইকরণ

উত্তরপত্র পরীক্ষণে প্রদত্ত নম্বর যাচাই আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলোর জন্য নতুন ধারণা । কেননা এখানে মাধ্যমিক শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থায় এর প্রচলন নেই বললেই চলে । প্রদত্ত নম্বর যাচাইয়ের ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিশেষ করে অনার্স বা মাস্টার্স এর মত উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে করা হয় । এক্ষেত্রে সর্বাধিক কার্যকরী ও প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে উত্তরপত্র ২য় পরীক্ষণ এবং ক্ষেত্রে বিশেষে ৩য় পরীক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় । সাধারণত ১ম ও ২য় পরীক্ষকের নম্বর গড় করে স্কোর নির্ধারণ করা হয়, তবে ১ম ও ২য় পরীক্ষকের প্রদত্ত নম্বরের মধ্যে যদি ২০% নম্বরের ব্যবধান হয় তখন উক্ত উত্তরপত্র ৩য় পরীক্ষকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয় । ৩য় পরীক্ষকের প্রদত্ত নম্বরের সাথে পূর্বে দেয়া যে নম্বরটি কাছাকাছি হবে তার নম্বরের সাথে গড় করে চূড়ান্ত স্কোর নির্ধারণ করা হয় ।

আইসিটি শিক্ষার ব্যবহারিক বিষয়ের পরীক্ষণের পদ্ধতি এমনি হওয়া উচিত। যদি একই বিষয়ের মূল্যায়ন একাধিক পরীক্ষকের কাছে ন্যস্ত করা হয় তবে নম্বর প্রদানে নৈর্ব্যক্তিকতা বজায় থাকে। শুধুমাত্র একজন শিক্ষকের ব্যক্তিগত রুচির দ্বারা প্রাপ্ত নম্বর নিয়ন্ত্রিত হওয়ার সুযোগ থাকে না। বিদ্যালয় আয়োজিত প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে কোনো প্রজেক্ট নির্বাচন কিংবা পুরষ্কার নির্বাচনের ব্যাপারেও একই পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। অর্থাৎ মূল্যায়নের সময় দুই বা ততোধিক শিক্ষক যদি নম্বর প্রদান করেন তবে তা নৈর্ব্যক্তিতা লাভ করে।

১০.১.৭ প্রাপ্ত নম্বর সংশোধন

সাধারণত বহু নির্বাচনীমূলক নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরকে সংশোধন করা হয়। যেহেতু বহু নির্বাচনী অভীক্ষায় শিক্ষার্থীর অনুমান নির্ভর উত্তর দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষার্থীদের অনুমান নির্ভর নাকচ করার জন্য নিচের সংশোধনী সূত্র ব্যবহার করা হয়।

$$S = R - \frac{W}{O-1}$$

এখানে,

S= নম্বর বা স্কোর

R= সঠিক উত্তরের সংখ্যা

W= ভুল উত্তরের সংখ্যা

O= বিকল্প উত্তরের সংখ্যা

১০.২ শিক্ষার্থীদের ফলাফল সংরক্ষণ ও অর্জন পরিবীক্ষণ এবং এসএসসি পরীক্ষার আইসিটি বিষয়ের প্রশ্নপত্র, অতীত ও নমুনা পরীক্ষা এবং স্বতন্ত্র প্রশ্ন পর্যালোচনা

১০.২.১ শিক্ষার্থীর ফলাফল সংরক্ষণ:

শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফল সংরক্ষণের জন্য নিম্নে একটি রেজাল্ট রেজিস্টার-এর নমুনা প্রদত্ত হলো:

রেজাল্ট রেজিস্টার

A= Excellent
B= Good
C= Fair & Average
D= Poor
E= Very Poor

বিদ্যালয়ের নাম:

শিক্ষার্থীদের নাম:

ভর্তিকৃত শ্রেণি ও সন:

বিষয়: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

পরীক্ষা	১ম বছর (... ... শ্রেণি)		২য় বছর (... ... শ্রেণি)		৩য় বছর (... ... শ্রেণি)	
	সাময়িক পরীক্ষা	বার্ষিক পরীক্ষা	সাময়িক পরীক্ষা	বার্ষিক পরীক্ষা	সাময়িক পরীক্ষা	বার্ষিক পরীক্ষা
তত্ত্বীয়						
ব্যবহারিক কাজ						
অনুসন্ধানমূলক ও বাড়ির কাজ						
শ্রেণির কাজ						
শ্রেণি অভীক্ষা						

পরীক্ষা	১ম বছর (... ... শ্রেণি)		২য় বছর (... ... শ্রেণি)		৩য় বছর (... ... শ্রেণি)	
	সাময়িক পরীক্ষা	বার্ষিক পরীক্ষা	সাময়িক পরীক্ষা	বার্ষিক পরীক্ষা	সাময়িক পরীক্ষা	বার্ষিক পরীক্ষা
মন্তব্য						
শিক্ষকের স্বাক্ষর						

সাধারণত আমাদের দেশের বেশিরভাগ বিদ্যালয়ে গতানুগতিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের প্রতি বছরের ফলাফল তৈরি করা হয় এবং বার্ষিক ফল প্রকাশের পর শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির বিবরণী প্রদানের মাধ্যমে এর কার্যকারিতা শেষ হয়। দীর্ঘমেয়াদী পর্যায়ে ফলাফলকে সংরক্ষণ করা হয় না। আবার কোনো কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সর্বাত্মক পরিচয়পত্র সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। সর্বাত্মক পরিচয়পত্র হচ্ছে শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির পরিচায়ক পত্র। দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, প্রক্ষোভিক, সামাজিক ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর উন্নতির মাত্রা ও পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হয় সর্বাত্মক পরিচয় পত্রে।

প্রগতি বিবরণী বা প্রগ্রেসিভ রিপোর্ট একজন শিক্ষার্থীর একবছরের বিভিন্ন সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলকে প্রকাশ করে। এ রিপোর্টের তথ্যাদিকে যদি রেজিস্টারের মাধ্যমে নূন্যতম তিন বছরের জন্য সংরক্ষণ করা যায় তবে তা শিক্ষার্থীদের একাডেমিক অগ্রগতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিতে সহায়ক হয়। পরে তা থেকে তার দুর্বলতা শনাক্তকরণ সম্ভব হবে এবং তাদের দুর্বলতা দূর করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ সহজ হবে। বর্তমানে অবশ্য বিভিন্ন সফটওয়ার ব্যবহার করে এ ধরনের ফলাফল সংরক্ষণ করা হয়। এখানে ফলাফলের পাশাপশি শিক্ষার্থীর অগ্রগতির একটি বিশ্লেষণও পাওয়া যায়। বিভিন্ন শিক্ষামূলক সফটওয়ার ডেভলপমেন্ট কোম্পানি ফ্রি ও অর্থের বিনিময়ে এ ধরনের সফটওয়্যার দিয়ে থাকে। তাছাড়া এমএস এক্সেল সফটওয়ার ব্যবহার করে খুব সহজে বিশ্লেষণসহ শিক্ষার্থীদের ফলাফলের রেকর্ড তৈরি করা যায়। নিচে এক্সেলে তৈরি করা একটি রেজাল্ট শিটের ছবি দেয়া হলো।

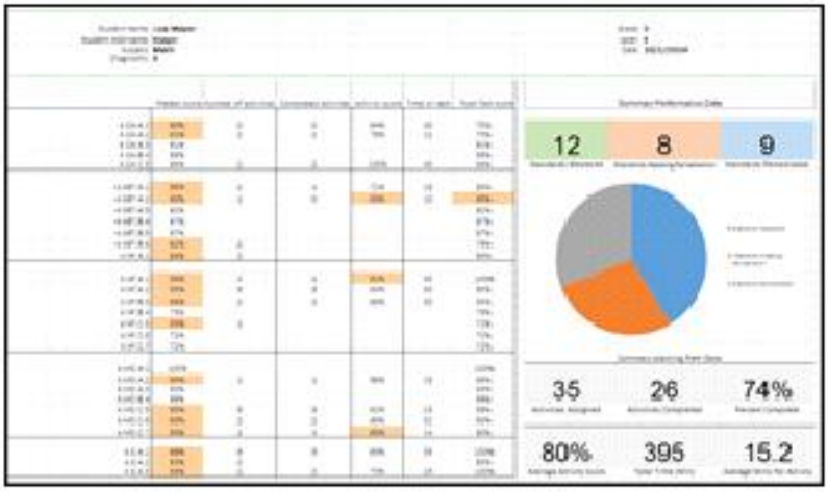

১০.২.২ অর্জন পরিবীক্ষণ

পরিবীক্ষণ শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ মনিটরিং। এটি সাম্প্রতিকালের ধারণা। মনিটরিং শব্দটি পরিবীক্ষণের তুলনায় বেশি পরিচিত। মনিটরিং শব্দটি এসেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উদ্ভাবমনমূলক প্রকল্প ও শিল্পোদ্যোগ সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে। পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়াটিতে স্পষ্টভাবে বলা যায় পরিকল্পনা গৃহীত হলো, বাস্তবায়নের যাবতীয় আয়োজন শুরু হলো, এখন দরকার পরিকল্পিত কাজকে অভীষ্ট লক্ষ্য বা সুষ্ঠু সমাপ্তির পথে এগিয়ে নেয়ায় সহায়ক কর্মসূচি প্রণয়ন। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এটা

একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং মনিটরিং একই সঙ্গে Means এবং Ends। উদাহরণস্বরূপ কোনো কাজ হাতে নেয়ার পর বাস্তবায়ন পর্যায়ে তা ঠিক ঠিক এগিয়ে চলছে কিনা তা জেনে ও বুঝে নেয়ার কাজটি হলো পরিবীক্ষণ।

পরবিক্ষিত কাজ তখনই সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয় যখন তার বাস্তবায়ন পর্যায়ে সৃষ্ট অসুবিধা, বাধা বা সমস্যা চিহ্নিত করে তা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ার পর থেকে বাস্তবায়নের সমাপ্তি পর্যন্ত সময় কালে এর বাস্তবায়নের সার্বক্ষণিক তদারকি ও সাময়িক মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে পরিবীক্ষণ বলে।

আইসিটি বিষয়ের শিক্ষার্থীদের শিখনযোগ্যতা অর্জিত হয় শ্রেণিকক্ষ ও ল্যাবের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক কাজের দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে। ব্যবহারিক কাজে তা কম্পিউটার বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইসে কাজ করার মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করে। এসব কাজ শিক্ষক ঠিক মতো পরিবীক্ষণ না করলে শিক্ষার্থীর অগগ্রতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক চেকলিস্ট ও ডায়েরি ব্যবহার করতে পারেন। শিক্ষার্থীর সঙ্গে তার সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন।

১০.২.৩ আইসিটি বিষয়ের প্রশ্নপত্র

শিক্ষার্থীরা অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে এবং কোনো বিষয়কে বিচার-বিশ্লেষণ বা মূল্যায়ন করতে পারে কি না তা যাচাই করা মূল্যায়নের উদ্দেশ্য। তাই মূল্যায়নকে ফলপ্রসূ করার জন্য প্রতিটি অধ্যায় শেষে অনুশীলনের জন্য নমুনা হিসেবে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মুখস্থ নির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অর্জন উপযোগী দক্ষতা ও যোগ্যতা পরিমাপে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক দক্ষতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

অষ্টম শ্রেণিতে যেহেতু জেএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তাই ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায়ও জেএসসি পরীক্ষার নমুনা অনুসরণ করা হয়।

জেএসসি/ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণির 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' বিষয়ের নম্বর বন্টন:

এনসিটিবি-এর নির্দেশনা অনুযায়ী জেএসসি/ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণির 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' বিষয়ের নম্বর বন্টন হবে নিম্নরূপ:

রচনাধর্মী প্রশ্ন:	৮টি বিকল্প প্রশ্ন থেকে ৫টি প্রশ্ন × ৫	=	২৫
বহুনির্বাচনী প্রশ্ন:	২৫ টি প্রশ্ন (বিকল্প নেই) × ১	=	২৫
	মোট নম্বর	=	৫০

এসএসসি/নবম-দশম শ্রেণির 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' বিষয়ের নম্বর বন্টন:

এনসিটিবি-এর নির্দেশনা অনুযায়ী এসএসসি/নবম-দশম শ্রেণির 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' বিষয়ের নম্বর বন্টন হবে নিম্নরূপ:

মোট নম্বর = ৫০

তত্ত্বীয় অংশের জন্য ২৫ নম্বর এবং ব্যবহারিক অংশের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

তত্ত্বীয় অংশের জন্য প্রশ্ন:

- ২৫ টি বহুনির্বাচনী প্রশ্ন থাকবে।
- সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।
- প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ নম্বর।

ব্যবহারিক অংশের জন্য প্রশ্ন:

- এস্যাইনমেন্ট/ প্রজেক্ট অনুশীলন/ ব্যবহারিক : ২০ নম্বর।
- মৌখিক অভীক্ষা : ৫ নম্বর।

ব্যবহারিক কাজের জন্য নির্দেশনা:

- শিক্ষাক্রমে বর্ণিত ব্যবহারিক কাজসমূহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পন্ন করবে। প্রয়োজনে শিক্ষাবোর্ড ব্যবহারিক কাজের একটি

তালিকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রেরণ করতে পারে ।

- সম্পন্ন ব্যবহারিক কাজের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ০৩টি ব্যবহারিক কাজের নম্বর গড় করতে হবে ।
- সম্পন্ন ব্যবহারিক কাজের প্রাপ্ত গড় নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ শিক্ষার্থীর নিবন্ধন নম্বর অনুযায়ী সংরক্ষণ করবেন ।
- শিক্ষাবোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবোর্ডে প্রেরণ করবে ।
- প্রতিটি ব্যবহারিক কাজের জন্য ২৫ নম্বর থাকবে ।

(সূত্র: এনসিটিবি-এর স্মারক নং: শি: উ:/২৭৭/১১/৭৪৫; তারিখ: ০১/০৭/২০১৫ খ্রি.)

উপরোক্ত মান বন্টন থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ২৫ নম্বরের তত্ত্বীয় পরীক্ষা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত প্রশ্নে নেয়া হয় । আর বাকি ২৫ নম্বরের ব্যবহারিক পরীক্ষা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নিয়ে থাকেন ।

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে প্রচলিত সৃজনশীল পদ্ধতিতে ১০০ নম্বরের মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু আছে । এর মধ্যে ১০ নম্বরের ৫টি রচনাধর্মী সৃজনশীল প্রশ্নের এবং ২৫টি বহুনির্বাচনী প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে হয় । সে সাথে ২৫ নম্বরের ব্যবহারিক কাজ আছে । নিম্নে একটি নমুনা সৃজনশীল প্রশ্ন প্রদান করা হলো ।

জনাব বাপ্পী ও জনাব মাহমুদ একটি ছোট ব্যবসা শুরু করার পর অফিসের স্টাফদের বিভিন্ন কাজের জন্য ৫ টি কম্পিউটার ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নেন । এর আগে জনাব মাহমুদের এক কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু তাদেরকে ব্যবসার সফলতার জন্য ক্লাউড কম্পিউটার ভাড়া নেয়ার পরামর্শ দেন । জনাব বাপ্পী ও জনাব মাহমুদ অনলাইন হতে ক্লাউড কম্পিউটার ভাড়া নেন ।

ক) ব্যান্ডউইথ কী?

খ) নেটওয়ার্ক স্থাপনে হাবের চেয়ে সুইচ ব্যবহার সুবিধাজনক কেন - ব্যাখ্যা কর ।

গ) উপরোক্ত উদ্দীপকে মাহমুদ ও বাপ্পীর প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্লাউড কম্পিউটিং এর কোন মডেলটি উপযুক্ত এবং কেন?

ঘ) ছোট ও প্রারম্ভিক পর্যায়ে জনাব বাপ্পী ও জনাব মাহমুদের সিদ্ধান্ত তাদের ব্যবসায় অধিক লাভ এনে দিবে- তোমার উত্তরের পক্ষে ব্যাখ্যা দাও ।

১০.২.৪ অতীত ও স্বতন্ত্র প্রশ্ন পর্যালোচনা:

আইসিটি শিক্ষার ক্ষেত্রে উত্তম ফলাফলের জন্য শিক্ষার্থীদের জ্ঞান চর্চাকে উৎসাহিত করা এবং বিষয়বস্তুর শিখনে প্রশ্নপত্র আলোচনা, সে অনুসারে নমুনা পরীক্ষা ও স্বতন্ত্র প্রশ্ন প্রস্তুতি করণের দক্ষতা শিক্ষার্থীর স্ব-শিখন ও আত্মবিশ্বাস দৃঢ় করণে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে ।

উত্তম ফলাফলের জন্য প্রশ্নপত্র পর্যালোচনায় শিক্ষকের পাশাপাশি শিক্ষার্থীর নিজস্ব প্রস্তুতিমূলক জ্ঞানের পরিধি বিকাশে যা করণীয় অর্থাৎ মনস্তাত্ত্বিক নির্ধারকগুলো হচ্ছে-

- বিষয়বস্তু নির্ভর অধ্যায় ভিত্তিক প্রশ্নপত্র পর্যালোচনা করা;
- বিষয়বস্তুর সামগ্রিক সিলেবাস সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা;
- প্রশ্নপত্র পর্যালোচনার কৌশল প্রয়োগে বিষয়বস্তুর সামগ্রিক ধারণা ও ধারাবাহিকতা বজায় থাকে;
- প্রশ্নের পর্যালোচনার মাধ্যমে কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায় এবং তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে যা ফলাফল উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখে;
- প্রশ্ন পর্যালোচনায় ব্যবহারিক ফলপ্রসূতাকে আরো বর্ধিত করে শিখনের সফলতা অর্জনে সহায়ক হয়;
- প্রশ্নের মান বন্টন এবং উত্তর লিখনে অনুশীলনের পথ সুগম হয়;
- প্রশ্নের মান অনুসারে সময়সীমা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়;
- মূল্যায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে ধারণা অর্জন হয়;

- অনুশীলনের মাধ্যমে আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়;
- শিখন হলো উদ্দেশ্যমুখী যা ব্যক্তিকে অভিযোজনে সাহায্য করে;
- বাস্তবমুখী উদ্দেশ্য স্থাপনকে সার্থক শিখনের শর্ত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে;
- শিক্ষার্থীদের কৃতকার্যতা সম্পর্কে ধারণা তাদের শিখনে প্রেষণা যোগায় । সে সব প্রচেষ্টা তাদের ফললাভে সাহায্য করে;
- শিক্ষার্থীদের অকৃতকার্যতা কেবল শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টার যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দিহান করে তোলে যা পরবর্তীতে কৃতকার্যতা সম্পর্কে সচেতনতা অর্জনে অনুপ্রাণিত করে;
- অগগ্রতি সম্পর্কে জ্ঞান তাদের সফলতামূলক প্রচেষ্টাগুলোর পুনরাবৃত্তিতে প্রেষণা যোগায় ।

১০.২.৫ নমুনা পরীক্ষা:

শিখন সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত প্রক্রিয়া । তবে দলগত প্রভাব এই প্রক্রিয়ার বিকাশে বিশেষভাবে সহায়তা করে । এক্ষেত্রে নমুনা পরীক্ষার মাধ্যমে-

- শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মনোভাব জাগ্রত হয়;
- আত্মপ্রতিযোগিতামূলক মনোভাব তৈরি হয় যা শিখনে সহায়তা করে;
- প্রাপ্ত দলগত প্রভাব শিখনের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলে;
- শিক্ষার্থীরা নিজেদের সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারে;
- শিক্ষার্থীর বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাশক্তির বিকাশ লাভ করে;
- এ জাতীয় শিখনের ফলে শিক্ষার্থীর গুণগত মানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং এ দক্ষতা অন্য কাজে সঞ্চালিত হয়;
- এটি একটি বিশ্লেষণধর্মী সক্রিয়তা যার মাধ্যমে সামগ্রিক দক্ষতার বিকাশ সাধন হয় ।

প্রশ্নাবলি

১. শিক্ষার্থীদের ফলাফল রেজিস্টারে কি কি বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা উচিত? এর যৌক্তিকতা লিখুন ।

২. এসএসসি পরীক্ষার আইসিটি বিষয়ের প্রশ্নপত্রের নম্বর বন্টনের বিবরণ দিন ।

৩. সাধারণত এমসিকিউ অভীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর সংশোধন সংক্রান্ত সূত্রটি উদাহরণ সহকারে বুঝিয়ে দিন ।

৪. স্বতন্ত্র প্রশ্ন পর্যালোচনার যৌক্তিকতা লিখুন ।

তথ্যসূত্র

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা ।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ বিস্তরণের শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা ।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষণ. (২০১০). টিকিউআই-প্রকল্প, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা ।

ইউনিট ১১ : ICT বিষয়ে স্ব-শিখন

আলোচ্য বিষয়:

১১.১ আইসিটি পাঠ দক্ষতা, সুপঠন ও শিখন অভ্যাস, আইসিটি বিষয় পুন:অধ্যয়নের উপায়

১১.২ ক্রমন্বিত পেশাগত উন্নয়ন এবং কীভাবে আইসিটি বিষয়ক নিজস্ব জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন করা যায়

১১.৩ আইসিটি শিক্ষণে কর্মসহায়ক গবেষণা/ প্রতিফলন পদ্ধতি এবং নতুন শিখন ধারণা সম্পর্কে নিজেকে হালনাগাদ রাখা

ইউনিট ১১
ICT বিষয়ে স্ব-শিখন

শিখন একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। শিক্ষকগণ যেহেতু সর্বদা পাঠদানের সাথে সম্পৃক্ত থাকেন, তাই তাদের সমসাময়িক জ্ঞানে হাল নাগাদ হয়ে থাকতে হয়। আর হাল নাগাদ থাকার একটি উপায় হলো স্ব-শিখন।

১১.১ আইসিটি পাঠ দক্ষতা, সুপঠন ও শিখন অভ্যাস, আইসিটি বিষয় পুন: অধ্যয়নের উপায়

১১.১.১ সুপঠন ও শিখন অভ্যাস

পঠন হচ্ছে একটি জটিল জ্ঞানগত প্রক্রিয়া যা চিহ্নকে অর্থে রূপান্তর করে আমাদের কিছু অনুধাবনে সহায়তা করে। কোনো কিছু পড়ে তার অর্থ অনুধাবন করাকে পঠন বলে। পঠন হলো ভাষার ব্যুৎপত্তি লাভ, যোগাযোগ এবং ধারণা ও তথ্য বিনিময়। এটি আসলে পাঠকের পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পাঠকের সাথে লেখার একটি জটিল মিথোস্ক্রিয়া। পঠন প্রক্রিয়ায় প্রয়োজন হয় নিয়মিত অনুশীলন, উন্নয়ন এবং নৈপুণ্য লাভ। সাথে সাথে এতে পাঠকের সৃজনশীলতা ও উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। তবেই পঠন হয়ে উঠে ফলপ্রসূ। পাঠক পাঠের সাথে সাথে মানসপটে একটা চিত্রকল্প বিনির্মাণ করে নেয়। এই চিত্রকল্পই পাঠকে পাঠের বিষয়বস্তু অনুধাবনে সহায়তা করে। জঁ পিয়াজের স্কিমাটা তত্ত্বে পঠন সম্পর্কে বলা হয়েছে, পাঠক প্রসঙ্গ-সূত্র (context clues) ব্যবহার করে অপরিচিত শব্দের অর্থ বের করে ফেলে। পাঠক পঠিত শব্দ বা শব্দগুচ্ছকে তাঁর এতোদিনের অর্জিত জ্ঞানের কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। অর্থাৎ কোনো অর্থবোধক চিহ্নকে ভাষায় রূপান্তর করে এর অন্তর্নিহিত ভাব অনুধাবনের দক্ষতাই হলো পঠন। কেউ যদি কোনো ভাষার চিহ্নগুলোর উচ্চারণ জানে এবং তা দিয়ে গঠিত শব্দেরকি অর্থ প্রকাশিত হচ্ছে তা না জানে তাহলে তা পঠন হলো না। এই পঠন সুচারুরূপে সম্পাদনের দক্ষতা হলো সুপঠন।

সুপঠনের বৈশিষ্ট্য

কেউ কেউ কোনো বিষয় ভাসাভাসাভাবে পড়ে মোটামুটি ধারণা নিয়ে রেখে দেয়, গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করে না। ফলে কিছুদিন পর পঠিত বিষয়ের অধিকাংশই আর মনে করতে পারে না। এটা পঠন হতে পারে, সুপঠন নয়। সুপঠন হলো কোনো কিছু উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে পাঠ করে এর অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু উপলব্ধি করে পরবর্তীতে স্মরণ করে অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করার দক্ষতা। সুপঠনের বৈশিষ্ট্যসমূহ-

- পঠনের সাথে সাথে বিষয়বস্তু উপলব্ধি করা;
- উদ্দেশ্যমূলকভাবে পাঠ করা, অর্থাৎ কেন পাঠ করা হচ্ছে সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পড়া;
- পড়ার সময় প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা;
- নিজস্ব পূর্ব জ্ঞানের সাপেক্ষে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করা;
- পড়ার সময় নিজস্ব চিন্তা ও যৌক্তিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে নতুন ধারণা গ্রহণ বা বর্জন করা;
- কোনো ক্ষুদ্র স্বার্থ (যেমনঃ পরীক্ষার) চিন্তা না করে নিজের বিকাশের উদ্দেশ্যে পাঠ করা;
- পাঠের একটা বড় লক্ষ্য থাকবে আনন্দ লাভ, নিজের পছন্দমতো বিষয় পড়ে আনন্দ লাভ করা।

সুপঠন ও শিখনের দক্ষতা অর্জনে করনীয়

আইসিটি শিক্ষার পাঠ দক্ষতা অর্জনে শিখন অভ্যাস তৈরি করতে হলে কতগুলো কৌশল ও সহজাত প্রবৃত্তি বিবেচনায় আনা আবশ্যক। ব্যক্তির স্বাভাবিক বিকাশ ও আচরণের নির্দিষ্টতা সব সময় বজায় থাকে না, তাই প্রয়োজন কিছু প্রবণতার অনুশীলন করা। তাঁর মধ্যে সুপঠন ও শিখন অভ্যাস একটি।

সুপঠন ও শিখন অভ্যাস তৈরির জন্য যা করা যেতে পারে-

- পছন্দের শিখনশৈলী আবিস্কার করতে হবে । কোনোভাবে শিক্ষা গ্রহণ করলে একজন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে সেটা জানতে হবে । সাধারণত সাত রকমের শিখন শৈলী আছে । যেমন: শ্রবণভিত্তিক, দর্শণভিত্তিক, ভাষাগতভাবে, দৈহিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে, সামাজিক মেলামেশার মাধ্যমে, নিজে নিজে কাজের মাধ্যমে, গাণিতিক সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে;
- শিখনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা;
- পঠনকে দৈনন্দিন কাজের একটা অংশে পরিণত করতে হবে;
- প্রতিদিনের পঠনের একটা কার্যকর সময়সূচি করতে হবে;
- পঠনের জন্য একটি নিজস্ব জায়গা বেছে নিতে হবে;
- পঠনের সময় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি টুকে রাখতে হবে;
- পঠনের সময় টুকে রাখা নোটগুলো বারবার দেখতে হবে;
- প্রয়োজনে প্রযুক্তির প্রজ্ঞাশীল ব্যবহার করতে হবে;
- কোনো একটি স্টাডি গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হওয়া;
- নিয়মমাফিক জীবনযাপন করা ।

বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা অর্জনে অধ্যায় ভিত্তিক শিখন অভ্যাস যে সকল পদ্ধতি ও কৌশল-এর উপর নির্ভর করে তা হলো-

- স্বশিখন প্রক্রিয়া;
- দলগত শিখন ও পর্যালোচনা;
- সফলতার চাহিদা নিরূপনে অনুশীলন করা;
- নব নব চিন্তা ধারার বিকাশ সাধনে সচেষ্ট হওয়া;
- তথ্য ও তত্ত্বগত জ্ঞানের আদান প্রদান;
- প্রভুত্ব বিস্তারের চাহিদাপূরণে সহায়ক;
- প্রচেষ্টার মাধ্যমে লক্ষে পৌঁছানো;
- চিন্তা শক্তির বিকাশে যত্নশীল ও সজাগ থাকা;
- অধ্যায়ভিত্তিক শিখন অভ্যাস নির্বাচনে সচেষ্ট হওয়া;
- শিখন অভ্যাস গঠনে পুনরাবৃত্তি অনুশীলন করা;
- বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা অর্জনে প্রেষণা ও আগ্রহ জাগ্রত করা;
- সমস্যা সমাধানে প্রকৃত কৌশল চিহ্নিতকরণ এবং প্রয়োগ করতে পারা;
- প্রতিযোগিতামূলক আচরণের উন্নয়ন ঘটানো;
- পারদর্শিতা অর্জনে সহায়ক;
- যথার্থতা অর্জনে নির্ভরশীল হতে সহায়ক;
- উত্তম ফলাফল অর্জনে নিয়ামক হিসেবে বিবেচনায় রাখা;
- প্রতিনিয়ত অধ্যবসায়ের অভ্যাস গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখা ।

১১.১.২ আইসিটি বিষয়ে পুন:অধ্যয়ন

সাধারণ অর্থে পুনঃঅধ্যয়ন বলতে কোনো কিছু বারবার অধ্যয়ন করাকে বুঝালেও মূলতঃ পুনঃঅধ্যয়নের উদ্দেশ্য আরো ব্যাপক । পুনঃঅধ্যয়নের উদ্দেশ্য হলো:

- পঠিত বিষয়ের ধারণাকে ক্রমে ক্রমে সুস্পষ্ট করা;
- নতুন জ্ঞানকে পুরনো অভিজ্ঞতার সাথে সমন্বয় করা;
- নতুন নতুন জ্ঞান ও তথ্য স্বল্প স্থায়ী স্মৃতি থেকে দীর্ঘ স্থায়ী স্মৃতিতে পরিচালিত করা;
- আরো নতুন নতুন তত্ত্ব ও জ্ঞানের প্রতি আগ্রহী হওয়া;
- অধিত বিষয়ের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পারদর্শী হওয়া ।

শিখনে পুনঃঅধ্যয়ন বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ। যেমন:

- বিষয়বস্তুর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও শিখনফল সম্পর্কে ধারণা স্বচ্ছ হয়;
- বিষয়বস্তু সহজবোধ্য হয়;
- জটিল বিষয় ক্রমে সহজ ও পরিস্কার হয়;
- পাঠকের সৃজনীশক্তির বিকাশ ঘটায়;
- জ্ঞানের ভিত মজবুত হয়

পুনঃঅধ্যয়নের কৌশল

আইসিটি বিষয়বস্তু পুনঃঅধ্যয়নের জন্য পাঠ্যবিষয়ের বিভিন্ন ছবি, উদাহরণ, ছক ইত্যাদি সামনে নিয়ে পূর্বের পাঠ থেকে স্মরণ করে নিজ নিজ আলোচনা করতে হবে। প্রয়োজনে সতীর্থদের সাথে দলগত আলোচনা করলে শিখন স্থায়ী হবে।

SQ4R কৌশল

পাঠ্যবই পুনঃঅধ্যয়নের জন্য SQ4R পদ্ধতিকে ধ্রুপদী কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এতে ছয়টি ধাপে অধ্যয়নকে অধিকতর কার্যকর করে তোলে এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গগুলো স্মরণে রাখতে সাহায্য করে। প্রথম প্রথম এই পদ্ধতিতে সব কয়টি ধাপ অনুসরণ করতে হয় এবং বিষয়টি বেশ সময়সাপেক্ষ মনে হয়। কিন্তু যখন একজন পাঠক বুঝতে পারেন কোন কোন ধাপ তাঁর অধ্যয়নকে ফলপ্রসূ করতে সাহায্য করছে, তখন সেসব নিয়েই কাজ করতে হয়।

জরিপ (Survey): একটি বই পড়ার শুরুতেই এর সম্পর্কে একটা পূর্ব ধারণা নেয়া এবং আগের কোনো পড়ার সাথে এর সম্পর্ক স্থাপনের কাজই হলো জরিপ। এ জন্য বইটির প্রচ্ছদ, ভূমিকা, সূচিপত্র, নির্ঘন্ট, পেছনের প্রচ্ছদ, লেখক পরিচিতি ইত্যাদি ভালো করে দেখে ও পড়ে নিতে হয়। এতে বইটির বিন্যাস, গঠন ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা হয়। একইভাবে কোনো অধ্যায় পড়া শুরুর আগে এর সম্ভাব্য তথ্যগুলো উল্টিয়ে পাল্টিয়ে জেনে নিতে হবে। এটার সুবিধা হলো পড়ার আগে বই বা অধ্যায় সম্পর্কে একটা মোটা দাগের ধারণা তৈরি হয় যা পাঠককে বিষয়বস্তুর গভীরে যেতে উৎসাহী করে তোলে।

প্রশ্ন করা (Question): কোনো পাঠ শুরুর আগে এর অনুচ্ছেদ বা উপ-অনুচ্ছেদের শিরোনাম (না থাকলে প্রথম লাইন) কে প্রশ্ন আকারে ভাবতে শুরু করুন। এতে পাঠের বিষয়বস্তুর উপর আগ্রহ ও কৌতুহল সৃষ্টি হয়। যেমন: বিষয়বস্তু যদি হয় 'আইসিটি ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ'। তাহলে প্রশ্নটি হতে পারে এমন: আইসিটি কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। পঠনের সময় এ ধরনের যেসব প্রশ্ন মনের ভেতরে উদিত হয় তা নোটবুকে টুকে রাখা যেতে পারে।

পঠন (Read): পড়া মানে বইয়ের লেখার উপর চোখ বুলিয়ে যাওয়া বা তথ্য-তত্ত্ব মুখস্থ করা নয়। মনের ভেতরে যেসব প্রশ্ন উদিত হয়েছে তার সঠিক উত্তর খুঁজে পাওয়া। গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো সাথে সাথে নোটবুকে টুকে নেয়া দরকার। তথ্যগুলো ধারাবাহিকভাবে লিখে রাখা উচিৎ। পঠন আরো ফলপ্রসূ করতে মাইন্ডম্যাপ বা প্রসেস ম্যাপের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। এটি পরবর্তীতে পুণঃ অধ্যয়নে সহায়তা করে।

সাড়াদান (Recite): একটি অধ্যায় পড়ার পর বই বন্ধ করে আপনার প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলুন অথবা খাতায় লিখে নিন। যদি মনে হয় উত্তর মনে আসছে না, তখন আবার অধ্যায়টি পড়ে নিতে হবে। কিন্তু বারবার পুনঃঅধ্যয়নের পরও যদি প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া যায় তখন প্রশ্নগুলো সংশোধন করে নেয়া উচিৎ। যেমন একটি প্রশ্ন হতে পারে: XOR গেট কী? সরাসরি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে এটাকে সহজ দুটো প্রশ্নে রূপান্তর করা যেতে পারে। যেমন:

১. XOR গেটে কোন্ কোন্ গেট ব্যবহৃত হয়?

২. XOR গেট কেন ব্যবহার করা হয়?

লিপিবদ্ধকরণ (Relate): পাঠের পর নোট টুকে নিলে পঠিত বিষয়টি বেশিদিন স্মৃতিতে থাকে। তাই প্রতিটি অনুচ্ছেদ বা উপ-অনুচ্ছেদ পড়ার সাথে সাথে এর গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো টুকে নেয়া উচিত।

পর্যালোচনা (Review): পাঠ শেষে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে অধীত বিষয়টি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নির্মাণ করতে হবে। প্রশ্নগুলো হতে পারে-

- কিসের ভিত্তিতে নতুন এ তথ্য/ জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত?
- পূর্বেও কোন জ্ঞানের ভিত্তিতে নতুন এই জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত?
- নতুন এই জ্ঞান আমি কীভাবে কাজে লাগাতে পারি?

পাঠের ২৪ ঘন্টার মধ্যে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর মিলিয়ে নিতে হবে। নিজেকে নিজে এ ধরনের প্রশ্ন করে উত্তর দিয়ে সৃজনশীলতা, দক্ষতা ও যৌক্তিক চিন্তন ক্ষমতার বিকাশ ঘটানো যায়।

১১.২ ক্রমন্বিত পেশাগত উন্নয়ন এবং কীভাবে আইসিটি বিষয়ক নিজস্ব জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন করা যায়

১১.২.১ ক্রমন্বিত পেশাগত উন্নয়ন

ইংরেজি শব্দ Development উন্নয়ন এর সমার্থক শব্দ। Development is nothing but desired changed of existing condition. অর্থাৎ বিরাজমান অবস্থার কাঙ্খিত পরিবর্তন সাধনই হলো উন্নয়ন। উন্নয়ন শব্দটির বিস্তৃতি ব্যাপক। উন্নয়নের শুরু হয় বিন্দু থেকে এবং ক্রমাগত অগ্রগতির ফলে তা থেকে রেখার সৃষ্টি হয়। রেখা থেকে বৃত্ত অর্থাৎ পরিপূর্ণতা।

ক্রমন্বিত পেশাগত উন্নয়ন বিষয়টি একটি ধারাবাহিক অনবদ্য প্রক্রিয়া বিশেষ, যা দেখে, শুনে, হাতে-কলমে কাজ করে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে সাধন করতে হয়।

এজন্য প্রয়োজন-

- অনুসন্ধিৎসু মন
- ধৈর্য্য ও অনুশীলন
- পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ দক্ষতা অর্জন;
- সমাজ ও পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান ও ঘটনাবলীর জ্ঞান ও দক্ষতা;
- মনোবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা;
- পেশার গুরুত্ব উপলব্ধি করা এবং তার সাথে নিজেকে উদ্ধার করে সম্পৃক্ত করা;
- আইসিটি জ্ঞানের একটি ফলিত শাখা। নিজ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সমাজ, দেশ ও জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নিজেকে নিবেদিত করার জন্য তৈরি করা।

নিজস্ব জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন

মাধ্যমিক স্তরের একজন আইসিটি বিষয়ের শিক্ষকের যেসব দক্ষতা থাকা দরকার তা হলো-

১. ওয়ার্ড প্রসেসিং-এর দক্ষতা;
২. স্প্রেডশিট ব্যবহারের দক্ষতা;
৩. ডাটাবেস দক্ষতা;
৪. ইলেকট্রনিক প্রেজেন্টেশন (যেমন মাল্টিমিডিয়া) দক্ষতা;
৫. ওয়েব নেভিগেশনের দক্ষতা;
৬. ওয়েবসাইট ডিজাইনের দক্ষতা;
৭. ই-মেল ব্যবস্থাপনা দক্ষতা;
৮. ডিজিটাল ক্যামরা ব্যবহারের দক্ষতা;
৯. স্কুলের প্রয়োজন মেটানোর মতো কম্পিউটার নেটওয়ার্কের দক্ষতা;
১০. ই-ফাইল ব্যবস্থাপনার দক্ষতা;

১১. ইন্টারনেট থেকে প্রয়োজনীয় সফটওয়ার ও ই-বুক ডাউনলোডের দক্ষতা;
১২. সফটওয়্যার ইন্সটলের দক্ষতা;
১৩. স্মার্টবোর্ড অথবা ইন্টারেক্টিভ বোর্ড ব্যবহারের দক্ষতা;
১৪. স্ক্যানার ও প্রিন্টার ব্যবহারের দক্ষতা;
১৫. পিডিএ (*Personal Digital Assistant - PDA*) ব্যবহারের দক্ষতা;
১৬. ভিডিও কনফারেন্স আয়োজনের দক্ষতা;
১৭. সাইবার নিরাপত্তা সুরক্ষার দক্ষতা;
১৮. প্রয়োজনীয় ছোটখাট মোবাইল এপস তৈরির ক্ষমতা;
১৯. সার্ভার ব্যবস্থাপনার দক্ষতা;
২০. প্রাথমিক প্রোগ্রামিং শেখানোর দক্ষতা।

সর্বোপরি মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের চাহিদা পরিপূরণ ও বিদ্যালয়ের আইসিটি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা দরকার। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির এ যুগে এ বিষয়ের একজন শিক্ষক বিদ্যালয়ের একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি শিক্ষায় আইসিটি'র যেসব নতুন নতুন উদ্ভাবন আসছে তা পুরো বিদ্যালয়ের মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন। অন্য শিক্ষকদের আইসিটি বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করবেন। সরকারের গৃহীত আইসিটি বিষয়ক সকল উদ্যোগ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকবেন। মোট কথা, তিনি হবেন বিদ্যালয়ের অন্যতম চৌকস ও সমসাময়িক জ্ঞানসম্পন্ন একজন ব্যক্তি।

১১.২.২ কীভাবে আইসিটি বিষয়ক নিজস্ব জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন করা যায়

আইসিটি বিষয়টি দ্রুত পরিবর্তনশীল। এটি আইসিটি বিষয়ের শিক্ষকদের জন্য একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। অন্যান্য বিষয়ে একজন শিক্ষক তাঁর অধীত বিদ্যা দিয়ে সারা জীবন শিক্ষার্থীদের পাঠদান করে যেতে পারেন। কিন্তু আইসিটি বিষয়টি প্রতিদিনই এতো বেশি সমৃদ্ধ ও পরিবর্তিত হচ্ছে যে পুরনো জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে বর্তমান সময়ের চাহিদা পরিপূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই আইসিটি বিষয়ের শিক্ষককে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রযুক্তি ও জ্ঞানের সাথে পরিচিত হতে হয় এবং তা শিক্ষার্থীদের মধ্য বিস্তরণ করতে হয়। এছাড়া, আমাদের দেশের বাস্তবতায় অনেক আইসিটি বিষয়ের শিক্ষক আছেন যাদের মাধ্যমিক স্তরের শিখন চাহিদা মেটানোর মতো পর্যাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতা নেই। তবে মুক্ত জ্ঞানের এ যুগে এটা তেমন বড়ো কোনো সমস্যা নেই। আগ্রহ থাকলে যে কোন সময় যে কোনো শিক্ষক যে কোনো অবস্থান থেকে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারেন। এ জন্য একজন শিক্ষক যা করতে পারেন-

১. সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের পক্ষ থেকে আয়োজন করা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা;
২. উন্মুক্ত প্রশিক্ষণ প্লাটফরম (যেমন: মুক্তপাঠ)-এ রেজিস্ট্রেশন করে শিক্ষকদের আইসিটি বিষয়ক কোর্সগুলোতে অংশ গ্রহণ করা;
৩. ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রে যোগাযোগ করা;
৪. দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনামূল্যে অনলাইন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স (যেমন: সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন কোর্সের ঠিকানা: http://sydney.edu.au/education_social_work/learning_teaching/ict/index.shtml) পরিচালনা করা হয়। তাতে অংশ গ্রহণ করা;
৫. ইউটিউবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনলাইন কোর্স আছে। তাতে দেখা;
৬. সোশাল মিডিয়ার সাহায্য নেয়া;
৭. শিক্ষক বাতায়নে অন্য শিক্ষকদের পোস্টে যেসব আইসিটি বিষয়ক টিপস দেয়া হয় তা অনুসরণ করা;
৮. পত্রিকার কম্পিউটার বিষয়ক নিবন্ধগুলো পড়া;
৯. অধিকতর জ্ঞান অর্জনের জন্য নৈশকালীন বা অবকাশকালীন কোর্সে ভর্তি হওয়া;
১০. অনলাইন কোর্সে অংশ গ্রহণ না করেও কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্রি টিউটোরিয়াল ভিডিও (যেমন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (www.boutube.edu.bd) দেখা;
১১. নিয়মিত টিচার টিউবের www.teachertube.com ভিডিও দেখা;
১২. ইউনেস্কো কর্তৃক সরবরাহকৃত ওপেন সফটওয়ারের সমষ্টি টুল কিট সম্পর্কে জানা।

পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের কৌশল

পর্যবেক্ষণ:

শিক্ষক পর্যবেক্ষণ বলতে বোঝায় পাঠদানকালে শিক্ষকের সামগ্রিক কর্মতৎপরতা ও পেশাগত অনুশীলন গভীরভাবে লক্ষ্য করা। তাঁর কাজ, মিথস্ক্রিয়া এবং মূল্যায়ন কৌশল দেখা এবং ফলাবর্তন করা। ফলাবর্তন অবশ্যই হতে হবে ইতিবাচক ও গঠনমূলক। যেমন পাঠ দানের ভালো দিকগুলো প্রথমে উল্লেখ করা উচিত। অতঃপর যে যে দিকগুলো উন্নয়ন করতে হবে এর উল্লেখ করতে হয়।

সুবিধা: অভিজ্ঞ শিক্ষকের কাজ দেখে নবীন শিক্ষক অনুপ্রাণিত হন। খোলামেলা আলোচনা ও গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে পর্যবেক্ষক শিক্ষক এবং পর্যবেক্ষিত শিক্ষক মতবিনিময় করতে পারেন।

সহকর্মীর কার্যাদি থেকে শিক্ষাদানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জেনে নিজের দক্ষতার উন্নয়ন করতে পারেন।

প্রদর্শনী পাঠ:

অভিজ্ঞ শিক্ষক পাঠ-পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করবেন এবং নবীন শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন।

সুবিধা: পাঠদান কৌশল পর্যবেক্ষণ ও শিখনের সুযোগ হয়। পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষকের শ্রেণিপাঠ পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়। কেবল তাত্ত্বিক নয় ব্যবহারিক কাজের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়। পাঠদানের পর পাঠের বিভিন্ন দিক চিন্তা করে আলোচনা করার সুযোগ পাওয়া যায়।

কনফারেন্স ও কর্মশিবির

অনেক শিক্ষককে সম্মিলিত করে পারস্পরিক আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে পেশাগত উন্নয়নের জন্য কনফারেন্স ও কর্মশিবির করা হয়।

সুবিধা: এ ধরনের আয়োজনের মাধ্যমে পেশাগত আলোচনার জন্য শিক্ষকদের একত্রীকরণ করা সম্ভব। দলগত চেতনার মাধ্যমে শিক্ষকদের সমস্যা উপলব্ধি করার সুযোগ ঘটে।

সমীক্ষা দল

কয়েকজন শিক্ষকের একটি ছোট দল যারা আধা আনুষ্ঠানিকভাবে মিলিত হয়ে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকগণ নিয়ে সমীক্ষা দল গঠন করা যায়।

সুবিধা: শিক্ষকগণ পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে তাদের চ্যালেঞ্জ বুঝতে ও মোকাবেলার উপায় খুঁজে বের করতে পারেন। অভিজ্ঞতা বিনিময় করে সমস্যা সমাধান করতে পারেন।

১১.৩ আইসিটি শিক্ষণে কর্মসহায়ক গবেষণা/ প্রতিফলন পদ্ধতি এবং নতুন শিখন ধারণা সম্পর্কে নিজেকে হালনাগাদ রাখা

১১.৩.১ কর্মসহায়ক গবেষণা

কর্মসহায়ক গবেষণা হলো বিশেষ এক ধরণের গবেষণা। এ ধরণের গবেষণা করা হয় বিশেষ কোনো অবস্থার পরিবর্তনের কার্যকারিতা যাচাই করার জন্য। শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মসহায়ক গবেষণা হলো শিক্ষাবিদ ও শিক্ষকদের এমন এক পন্থা যা দ্বারা শিক্ষণ ও শিখন পদ্ধতির উন্নতি করে। শিক্ষাবিদগণ কিছু অবস্থা ও শর্তের পরিবর্তন করে শিক্ষার ফলাফলকে আরো কার্যকরি করেন এই ধরনের গবেষণার মাধ্যমে। সাধারণভাবে, শিক্ষার ফলাফলের পরিবর্তনের জন্য গবেষণার উপাদানসমূহ কিছু তথ্য ও এর ব্যাখ্যা দেন যা শিক্ষাকে কার্যকরী করে।

কর্মসহায়ক গবেষণা এমন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিক্ষক তাঁর নিজের সমস্যা চিহ্নিত করতে পারেন এবং শিক্ষণ-শিখনে উন্নয়ন ঘটাতে পারেন। একে শিক্ষকদের গবেষণাও বলা হয়। এখানে শিক্ষক নিজেই গবেষক হিসেবে আবির্ভূত হোন। আইসিটি বিষয়ের বিভিন্ন সমস্যার সামাধান করে শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রম এগিয়ে নিতে এই বিষয়ের শিক্ষক কর্মসহায়ক গবেষণা করতে পারেন। কর্মসহায়ক গবেষণা পরিচালনা করলে অনেক সময় কর্তৃপক্ষসহ স্থানীয় ব্যক্তিরাও বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হয় এবং তা সমাধানে

এগিয়ে আসে। কর্তৃপক্ষের আগ্রহ এবং শিক্ষকগণের ত্যাগের ফলে অনেক বড়ো বড়ো সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। বিদ্যালয়ে একটি কম্পিউটার থাকলে শিক্ষার্থীদের গ্রুপে ভাগ করে এবং ক্লাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করে আইসিটি বিষয়টি শিক্ষাদান করা সম্ভব হবে। তাই আইসিটি বিষয়ের বহুমুখী সমস্যা সমাধানে কর্মসহায়ক গবেষণা অত্যন্ত কার্যকরি ভূমিকা পালন করে।

কোনো সমস্যার কার্যকরী সমাধানের জন্য উপযুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণের উদ্দেশ্য যে গবেষণা পরিচালিত হয় তাকে কর্মসহায়ক গবেষণা বলে। স্টুয়ার্ট এর মতে, 'কার্যোপযোগী গবেষণা এমন একটি ধারাবাহিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যা দ্বারা মানুষ কোনো সামাজিক পরিবেশে (যেমন- শ্রেণিকক্ষ, গোষ্ঠী, এলাকা) তাদের নিজ অবস্থা/ পরিস্থিতি (অথবা সমস্যা) অনুসন্ধান করতঃ তা উন্নয়নের জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে।' বিদ্যমান অবস্থার পরিবর্তন আনয়ন এর মূল লক্ষ্য। কর্মসহায়ক গবেষণা পরিস্থিতি নির্ভর ও প্রেক্ষাপটকেন্দ্রিক। সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে সমস্যা চিহ্নিত করা এবং উক্ত প্রেক্ষাপটেই সমস্যার সমাধান করার সাথে জড়িত। এই গবেষণা পর্যবেক্ষণযোগ্য অভিজ্ঞতা বা পরীক্ষণলব্ধ সাক্ষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কর্মসহায়ক গবেষণা চক্র:

কর্মসহায়ক গবেষণা পরিচালনার জন্য বেশ ক'টি মডেল রয়েছে। তবে গবেষক যে মডেলই অনুসরণ করেন না কেন 'কর্মসহায়ক গবেষণা চক্র' সম্পর্কে তাঁর পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। সকল মডেল পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে, কর্মসহায়ক গবেষণার এ সহজ সরল চক্রটি পাওয়া গেছে। সকল কর্মসহায়ক গবেষণাই তাঁর স্বীয় প্যাঁচানো মডেল হিসেবে কর্মসহায়ক গবেষণার সাধারণ চক্র অনুযায়ী অগ্রসর হয়। এ সাধারণ প্যাঁচানো চক্রের মধ্যে রয়েছে পরিকল্পনা, কার্যসম্পদনা (পরিকল্পনা বাস্তবায়ন), পর্যবেক্ষণ (নিয়মতান্ত্রিকভাবে), প্রতিফলন। এরপর যদি উদ্দেশ্য সফল না হয়, তাহলে আবার এ চক্রটি পুনরায় ঘুর্ণায়মান হবে।

চিত্র: কর্মসহায়ক গবেষণা চক্র

আইসিটি বিষয়ে শ্রেণি শিক্ষণে বিদ্যমান সমস্যা

আইসিটি শিক্ষণ বিষয়টি এখনও আমাদের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় নতুন একটি বিষয়। নতুন বিষয় বিধায় শ্রেণি শিক্ষণে নতুন কিছু সমস্যা সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই আইসিটি বিষয়ে কর্মসহায়ক গবেষণা পরিচালনার জন্য অনেকগুলো প্রসঙ্গ সামনে চলে আসে। যেমন:

১. প্রয়োজনীয় শিখন সামগ্রীর অপ্রতুলতা;
২. ইন্টারনেটের স্লথ গতি;
৩. পর্যাপ্ত সংখ্যক কম্পিউটারের অভাব;
৪. শিক্ষকের দক্ষতা ও জ্ঞানের অভাব;
৫. সমাজের স্বচ্ছ ধারণার অভাব;
৬. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা জটিল বিষয় হিসেবে আইসিটিকে মনে করে;
৭. আইসিটি বিষয়ের বই-পুস্তক বাজারে অপ্রতুল;
৮. সীমিত সম্পদের কারণে সরকারিভাবে অবকাঠামো বিনির্মানে অপ্রতুলতা।

১১.৩.২ কর্মসহায়ক গবেষণা কাজে আইসিটি'র জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ

- কর্মসহায়ক গবেষণায় যেহেতু তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তাই এই কাজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে।

- তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা প্রস্তুত করা, পর্যবেক্ষণ লিস্ট তৈরি করা ইত্যাদি কাজে কম্পিউটারের ব্যবহার করা হয়ে থাকে।
- তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে যোগাযোগের সহজ ও দ্রুত মাধ্যম হলো ই-মেইল। কাগজের চিঠিপত্র বা অন্যান্য কাগজ সাধারণ ডাকে পাঠানোর চেয়ে অনেক কম খরচে ও স্বল্প সময়ে ই-মেইল করে পাঠানো যায়।
- তথ্য সংগ্রহের বিশাল উৎস হলো ইন্টারনেট। কর্মসহায়ক গবেষণা কাজের অনেক প্রাথমিক তথ্য ইন্টারনেট থেকে পাওয়া যায়।
- আবার কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করে তাদের সাহায্য, মতামত বা তাদের পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে।
- তথ্য বিশ্লেষণের কাজ এক্সেল, এসপিএসএস ইত্যাদি সফটওয়ার ব্যবহার করে দ্রুত ফলাফল পাওয়া যায়।
- ডাটাবেজ ব্যবহার করে তথ্যের বহুমুখী ব্যাখা দেয়া যায়।
- গবেষণা কাজের ফলাফল উপস্থাপন করতে আইসিটি'র বহুমুখী ব্যবহার রয়েছে। বিভিন্ন চার্ট ও ছবি প্রদর্শন করে এবং পাওয়ার পয়েন্ট-এ কাজ করে গবেষণার ফলাফল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে উপস্থাপনা করা যায়।

১১.৩.৩ প্রতিফলন:

প্রতিফলন প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে মানসিক চিন্তন সংগঠনের একটি উপায়, যা সাম্প্রতিককালে শিক্ষণের জন্য খুবই কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রতিফলনের মাধ্যমে শিক্ষক নিজের কর্মকান্ড পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংশোধন ও পরবর্তী উন্নয়নের জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। ফলে পেশাগত উন্নয়ন সুষম গতিতে চলে।

প্রতিফলন চিন্তন:

প্রতিফলনমূলক চিন্তা শিক্ষণের জন্য খুবই কার্যকরী একটি প্রক্রিয়া। এ ধরনের চিন্তনের সাহায্যে ব্যক্তি নিজেকে ফিরে দেখার সুযোগ পায়। শিক্ষকের পেশাগত কাজের সাফল্য ও ব্যর্থতা অনুষ্ঠানে প্রতিফলন চিন্তন সাহায্য করে।

সুবিধা:

- প্রতিফলনমূলক চিন্তা আইসিটি শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নে সহায়তা করে।
- প্রতিফলনমূলক চিন্তার সাহায্যে শিক্ষক তাঁর পাঠদানের সবল ও দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে পরবর্তী পাঠদান উন্নয়নের পরিকল্পনা করতে পারেন।

প্রতিফলন প্রক্রিয়া:

প্রতিফলনের প্রকারভেদ:

আত্মবিশ্লেষণ: শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া সমাপনান্তে শিক্ষক সেটির সার্বিক চিত্র আন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করেন। কার্যক্রমটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে ভালো দিকগুলোর জন্য তৃপ্তিবোধ করেন। উন্নয়নমূলক দিকগুলো চিহ্নিত করে পরবর্তী কার্যক্রম উন্নয়নের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

পর্যবেক্ষণ: পর্যবেক্ষক শিক্ষার্থী, সহযোগী শিক্ষক এবং সহকর্মীদের গঠনমূলক সমালোচনা থেকে শিক্ষক তাঁর পাঠদানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানতে পারেন এবং উন্নয়নে সচেষ্ট হতে পারেন।

ভিডিও পর্যবেক্ষণ: ভিডিও-তে রেকর্ডকৃত পাঠদান দেখে শিক্ষক তাঁর নিজের সমালোচনা করতে পারেন এবং পরবর্তী পাঠদানে করণীয় নির্ধারণ করতে পারেন।

১১.৩.৪ পোর্টফোলিও ব্যবহার ও আত্ম-প্রতিফলন

পোর্টফোলিও হলো কোনো ব্যক্তির পেশাগত বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্ষমতার বর্ণনা। এতে শিক্ষক তাঁর নিজের শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পোর্টফোলিও ব্যবহার করেন। যেমন কোর্স পোর্টফোলিও, শিক্ষণ পোর্টফোলিও (শিক্ষকদের জন্য), পেশাগত পোর্টফোলিও

ইত্যাদি। শিক্ষণ-পোর্টফোলিও হলো একজন শিক্ষকের শ্রেণি শিক্ষণের বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন বিষয়ে বা প্রয়োজনে পেশাগত দক্ষতার বিবরণ বা প্রমাণপত্র। শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের পর্যায়ক্রমিক বিভিন্ন সফলতার দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় পোর্টফোলিওতে। যেহেতু চাকুরিকালের সাথে সাথে একজন শিক্ষকের অভিজ্ঞতাও বৃদ্ধি পায়, সেহেতু পোর্টফোলিওতে পেশাগত বিভিন্ন কর্মবিবরণ ও অর্জনের ধারাবাহিক বর্ণনা সংরক্ষণ করলে তা আত্ম-প্রতিফলনের সুযোগ করে দেয় এবং সর্বোপরি পেশাগত ক্রমোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

শিক্ষণ-পোর্টফোলিও-এর উদ্দেশ্য হলো:

১. একজন শিক্ষক হিসেবে নিজের লক্ষ্যের প্রতিফলন ঘটে;
২. শ্রেণি শিক্ষণে নিজের সবলতা ও দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করা যায় যা পরবর্তীতে উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া যায়;
৩. একজন শিক্ষক হিসেবে নিজের ধারাবাহিক অগ্রগতির ডকুমেন্ট হিসেবে কাজে লাগে;
৪. এটা দেখে ভবিষ্যতের শ্রেণি পাঠের জন্য কার্যকরি পরিকল্পনা করা যায়;
৫. একজন শিক্ষকের নিজস্ব শিক্ষণ-স্টাইল জানা যায়;
৬. পোর্টফোলিও দেখে অন্য শিক্ষকগণের সাথে আলোচনা করে নতুন কিছু শেখা যায়;
৭. পোর্টফোলিওর সবগুলো তথ্য বিশ্লেষণ করে বুঝা যায় নিজের লক্ষ্যের দিকে কতখানি অগ্রগতি হচ্ছে।

উদ্দেশ্য অনুযায়ী পোর্টফোলিওর গঠন বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। কোনো পোর্টফোলিও বর্ণনামূলক, কোনোটি নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা, আবার কোনোটি বিভিন্ন পয়েন্টে সংক্ষিপ্ত বর্ণনামূলক হয়ে থাকে। শ্রেণি শিক্ষণ পোর্টফোলিওতে সাধারণতঃ যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে, তা হলো-

- শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়;
- শ্রেণি শিক্ষণের বিভিন্ন কার্যক্রম/ পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়;
- কোর্সের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুর পরিচিতি থাকে;
- শিক্ষণের কার্যকারিতার প্রমাণ বর্ণনা করা হয়, যেমন- নিজস্ব ফিডব্যাক, শিক্ষার্থীর/ অন্য শিক্ষকের ফিডব্যাক;
- আত্ম-প্রতিফলন বা নিজের অনুভূতি এবং পরবর্তীতে আরও উন্নয়নের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ।

নিচে একটি শ্রেণি শিক্ষণের পোর্টফোলিওর নমুনা দেয়া হলো। এর সাথে আরও কোনো ঘর যোগ করে বা প্রয়োজনমতো পরিবর্তন করে আইসিটি বিষয়ের একজন শিক্ষক তাঁর পেশাগত উন্নয়নে তা ব্যবহার করতে পারেন।

শিক্ষণ-পোর্টফোলিও-এর নমুনা

নাম:			বিষয়:	
শ্রেণি শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	শিক্ষণ পদ্ধতি ও শ্রেণি কার্যক্রম	বিষয় পরিচিতি	ফিডব্যাক	আত্ম-প্রতিফলন

নিচে একজন আইসিটি শিক্ষকের একটি নমুনা পোর্টফোলিও দেখানো হয়েছে ।

ক্রমিক নং তারিখ	পেশাগত দক্ষতা (যা অর্জন করতে চাই)	প্রয়োজনীয়তা (কেন দরকার)	অর্জনের কৌশল (কীভাবে অর্জন করব)	পরিকল্পিত সময় (কত তারিখে, কোন সময়)	বর্তমান প্রস্তুতি (এখন আমি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করছি)	ফিডব্যাক (অর্জনের পরের অনুভূতি, তারিখসহ)
০১. ০১.০১.২০১৯	ই-মেইল ব্যবহার	দেশ-বিদেশের বিভিন্ন শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যমে জ্ঞানের উন্নয়ন ।	স্কুলের কাছেই একটি কম্পিউটার সার্ভিস সেন্টারে শিখবো	আগামীকাল ০২.০১ .২০১৯ তারিখ সন্ধ্যাবেলা	স্কুল থেকে ফেরার সময় ঠিক করে নেব ।	ই-মেইল করা শিখছি । এখন আমি ফাইল অ্যাটাচ করে মেইল করতে পারি । (০৩.০১.২০১৯)
০২. .../.../২০১৯						
০৩. .../.../২০১৯						
০৪. .../.../২০১৯						
০৫. .../.../২০১৯						

প্রশ্নাবলি

১. সুপঠন ও শিখন অভ্যাস বলতে কী বোঝেন? আইসিটি শিক্ষণে এর গুরুত্ব লিখুন।

২. আইসিটি বিষয়ে পুন: অধ্যয়নে SQ4R কৌশলটি ব্যাখ্যা করুন।

৩. ক্রমম্বিত পেশাগত উন্নয়ন কী? আইসিটিতে এর প্রয়োজনীয়তা লিখুন।

৪. কীভাবে আইসিটি বিষয়ক নিজস্ব জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন করা যায় তা ব্যাখ্যা করুন।

৫. আইসিটি শিক্ষণে কর্মসহায়ক গবেষণার ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

৬. শিক্ষণ-পোর্টফোলিও-এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন।

তথ্যসূত্র

De Certeau, Michel. (1984). Reading as Poaching in*The Practice of Everyday Life*. Trans. Steven F. Rendall. Berkeley: University of California Press,.P# 165-176.

11 Good Study Habits for Students (How to Build a Daily Routine). (n.d). Retrieved November 11, 2017, from DevelopGoodHabits.com: https://www.developgoodhabits.com/good-study-routine/.

SQ4R Reading Method. (2017). Retrieved November 11, 2017, from Brazosport College: http://brazosport.edu/programs/academics/Learning-Frameworks/SQ4R/index.

Sydney School of Education and Social Work. (2017, April 10). *ICT RESOURCES FOR GRADUATE TEACHERS.* Retrieved November 11, 2017, from The University of Sydney: http://sydney.edu.au/education_social_work/learning_teaching/ict/index.shtml.

Meiers, M. (2009). *The use of ICTs in schools in the digital age: what does the research say?* NSWIT Digest, 2009(1). NSW Education Standards Authority (NESA) (retrieved February 23, 2009).

Turner, B. L. (2005, January 6). *ICT RESOURCES FOR GRADUATE TEACHERS.* Retrieved November 11, 2017, from The University of Sydney: https://thejournal.com/articles/2005/06/01/20-technology-skills-every-educator-should-have.aspx.

Vrasidas, C., & Glass, G. ((n.d)). *ICT-Related Teacher Professional Development: Models and Strategies.* Retrieved November 11, 2017, from http://vrasidas.com/wp-content/uploads/2008/03/vrasidasglassaera 2008.pdf.

Supporting Digital Learning: Professional Learning. (2017, July 7). Retrieved November 11, 2017, from State Government of Victoria, Australia: http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/support/Pages/proflearn.aspx.